হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ
আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর

জীবনী ও কেরামত

সঙ্কলন ও প্রকাশনায় ঃ-
মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর

জীবনী ও কেরামত

সঙ্কলন ও প্রকাশনায়ঃ-

মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

লেখক–
মৌলানা মহাং ফয়েজ উল্লাহ্ ভুঁইয়া (গোল্ডমেডালিস্ট) সীতাকুণ্ড

প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৬৭ ইং

প্রথম প্রকাশের পুনঃ প্রকাশ:
২৬ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২০ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়:
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্য: ২২০ টাকা

মুদ্রণে:
আলোকধারা বুক্স
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

পেশ কালাম

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ করুণাধারা এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর শানে জালাল এবং জামালিয়তের বহিঃপ্রকাশের অনন্য কেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। এই মহান দরবারের প্রতিষ্ঠাতা– প্রাণপুরুষ হলেন ইমামুল আউলিয়া, গাউসুল আযম, শাহে দো আলম, হাযত রাওয়া, মুশকিল কোশা, ফানাফিল্লাহ্ বাকাবিল্লাহ্ হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। বিশ্বখ্যাত এই মহান আউলিয়া সর্দার সম্পর্কে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের জানার আগ্রহ অত্যধিক। তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি, প্রেক্ষাপট, জন্মবৃত্তান্ত, শিক্ষা অর্জন, তাসাওউফ সাধনা, কামালিয়াত, কারামত এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করার নিমিত্তে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে "হযরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থটির সংকলন-সংগ্রাহক হলেন অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী, সাজ্জাদানশীন এবং খাদেমুল ফোক্বারা অভিধায় মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে সুপরিচিত। গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশকারী লেখক হচ্ছেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার মাওলানা মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়া (গোল্ড মেডালিস্ট)। ১৯৬৭ ইংরেজী সনে প্রকাশিত জীবনী ও কেরামত সম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ অশেষ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পরে বিধিগত আনুকূল্যে, প্রজন্ম পরম্পরা পাঠকের অনবদ্য চাহিদা এবং উত্তরাধিকারীত্বের কারণে বইটি ছাপানোর বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আমার উপর অনুরোধ আসতে থাকে। তাই গ্রন্থটি সম্মানিত গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ৫ম সংস্ককরণ পর্যন্ত (জুলাই ১৯৮১) প্রকাশিত হলেও, প্রথম সংস্করণের দুঃস্প্রাপ্যতা

এবং ইতিহাসগত মূল্য বিবেচনায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উত্তরাধিকারী এবং অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রথম পুত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) একমাত্র পুত্র সন্তান হিসেবে আমি লক্ষ কোটি ভক্ত আশেকের দাবি এবং চাহিদা পূরণার্থে 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থটি ১৯৬৭ সালের সংকলন অনুযায়ী প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে লিখিত ঘটনা বহুল গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে এটি 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট' কর্তৃক প্রকাশ করা হল।

মৌলিক গ্রন্থটির তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে ছাপার কারণে প্রকাশিত ভুল বানানসমূহ শুদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থে অনুশীলিত মূল বানানরীতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। গ্রন্থে কোন প্রকার নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হয়নি।

বিশ্ববিখ্যাত অলি গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর কর্মকাণ্ডে প্রায়শ খিযিরী শানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। তাঁর অলৌকিক কার্যাবলী অনেক আলেম-ওলামা-ফকীহ্'র ধারণা বহিঃর্ভূত ছিল। তাঁর আচার-আচরণে শানে জামাল এবং জালালের অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল। তিনি সুগভীর অর্থবোধক রূপক কালাম করতেন। তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী মহানবী (দ.) এর অপরূপ আভায় উদ্ভাসিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্যে তাঁর দরজা ছিল অবারিত। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, "যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করিব। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাসরতক্ জারি থাকিবে।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আবির্ভাব সময়ে পৃথিবী জুড়ে চলছিল অনৈতিকতা-অনর্থ অপকর্মের জোয়ার; সর্বত্র অপজাত শাসন, আচার-সংস্কৃতির আধিপত্য। সুবেশধারী মানব আকার-আকৃতি-প্রকৃতির অন্তর-কন্দরে লুকায়িত ছিল পাশবিক দৈত্য-দানব। মানব হন্তাদের কল-কোলাহলে মানবতা ছিল ভূলুণ্ঠিত; মানুষ-মানুষে বর্ণ-শ্রেণি এবং আচারিকতার বৈষম্যের কারণে বিবাদ ছিল সর্বত্র। ধর্ম ভেদের কারণে মানুষ-মানুষে হনন এবং প্রতিহিংসা প্রক্রিয়া ছিল–নির্মম রক্ত লোলুপতার আকর। তাই মানব জাতির মধ্যে সংশোধন এবং

বিবেক তাড়না জাগ্রত করার লক্ষ্যে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) অন্তরাত্মায় পরিশুদ্ধির আহ্বান জানান। আগন্তুক সমীপে তিনি উক্তি করেছেন, 'ফেরেশ্‌তা কালেব বনিয়া যাও'। 'কবুতরের মতো বাছিয়া খাও', 'আমার নিকট একটি পাটী বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের ফুলও (অর্থাৎ একটু ধবধবে সাদা অন্তর) কি নিয়া আসিতে পারনাই'। মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের রূপক বাক্য ছিল প্রকৃত অর্থে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র তাসাওউফ নির্দেশনা। তাঁর আবির্ভাবে বিশ্ব পরিমণ্ডলে দারুণ কল-কল্লোলের সৃষ্টি হয়। সর্বত্র দেখা দেয় নতুন আলোড়ন, নবজাগৃতি। তাঁর আবির্ভাবে জাগরণী উঠে কাব্য নান্দনিকতায়। গণকবির কণ্ঠে গীত হয়–

"কলির পাপী উদ্ধারিতে মোহাম্মদ কাণ্ডারী রে,
তান কাজের মূলাধার গাউছে মাইজভাণ্ডারী রে।"

১৯৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থটি সংকলনে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এ জন্যে তাঁর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য নির্ভর জীবনী গ্রন্থ লেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মৌলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়ার প্রতি। গ্রন্থ মূদ্রণে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পাঠক সমাজের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল।

যথাযথ কর্তৃপক্ষীয় আইনী অভিমতের ভিত্তিতে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বহুল প্রচারার্থে গ্রন্থটি প্রকাশ করলাম। আশা করি এ গ্রন্থ পাঠ করে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে পাঠক উপকৃত হবেন এবং মাইজভাণ্ডার শরিফ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনে সক্ষম হবেন।

আস্‌-সালাম!

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

লেখক–
মৌলানা মহাং ফয়েজ উল্লাহ্ ভুঁইয়া (গোল্ডমেডালিষ্ট) সীতাকুণ্ড

প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৬৭ ইং

মূল্য-পাঁচ টাকা ৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ–
দরবার শরীফ ষ্টোর
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ
পোঃ আঃ ভাণ্ডার শরীফ
চট্টগ্রাম।

দরবার শরীফ ষ্টোর কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রিন্টার–
এস, হুদা খাঁ ছিদ্দিকী
ইছলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস,
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) ছাহেবের জীবন ইতিহাস আলোচনায় ও তাঁহার জীবনের অমুল্য কেরামতাবলী এবং রূহানী তাছার্রোফাত প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্য তথ্য সংগ্রহে যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বইখানা লিখিতে মৌলানা মহাং ফয়জুল্লাহ ভুঁইয়া আমার সংগৃহীত নোট মুলে লিখিয়া দিয়াছেন। মৌং আফছার উদ্দিন আহমদ বি-এল ছাহেব এবং মাষ্টার খায়ের-উল-বশর ছাহেব ভাষা সংশোধন—প্রভৃতি কাজে বইখানায় সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন, তাহারা সকলের প্রতি আমি আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সহৃদয় পাঠকবর্গ বইখানা পাঠে উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি—

বিনীত

প্রকাশক

১লা চৈত্র, ১৩৭৩ বাংলা

ভূমিকা

বিশ্বভূবনের একমাত্র প্রভু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাঁহার সমস্ত সৃষ্টজগতকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন করিতেছেন। সকলের উদ্দেশ্য তিনি। সমস্ত প্রশংসা কীর্ত্তন তাঁহার, তাঁহারই প্রতি সকলের গতি ও প্রত্যাবর্তন।

তাঁহারই নূরে সৃজিত প্রিয়তম মানব তাঁহার প্রণয় সংশ্রব হইতে বহুদূরে পর্দার আড়ালে পতিত হওয়ায় পূনঃ সঙ্গলাভে উভয়ের মধ্যে ভীষণ বিচলিত ভাব। তাই পর্দা উন্মোচনে তাঁহার সুমধুর শান্তিময় মিলন অর্জনের জন্য তাঁহার মনোনীত নবী অলি হাদীর একান্ত প্রয়োজন।

কালের দূরত্বে মহান প্রভুর অদর্শনে মানব যখন তাঁহার পরিচিতি জ্ঞান ও প্রেম প্রীতি ভুলিয়া বসে, তখন এই হাদীরাই মানব জগতকে তাঁহার স্মৃতি প্রীতি ও প্রেম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার মিলন পথে পৌঁছাইয়া দেন।

তাই যুগে যুগে এই মহান নবী অলি-পীর হাদীকূল নানা প্রকার যুগোপযোগী চিত্তাকর্ষক সবল কৌশলি ভাবধারা, কার্য্যকলাপ ও রীতিনীতি দ্বারা মানব জাতীকে আল্লাহ্ তা'লার প্রেম পথে আহ্বান করিয়া মানবের সর্বপ্রকার মুক্তি পথের সন্ধান দান করিয়া আসিতেছেন।

কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব শাহ্ ছুফী হজরত মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ), বিশ্বগুরু তৌহিদ পথের অদ্বিতীয় বাহক, ও মিলনদ্বার উদঘাটক, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (দঃ) এর প্রতীক, সর্ব্বগুণাধিকারী “আহমদি বেলায়েত” ক্ষমতার ঝাণ্ডাবাহী একমাত্র নিরপেক্ষ বিশ্বজনিন পীরেফায়াল মুক্ত যুগনায়ক।

বিশ্বমানব জগতে পরম করুণাময় খোদাতা'য়ালার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন এই মহান গাউছুল আজমের পরিচয় একান্তই দরকার। খোদা সন্ধানী মানবও এই সহজ সরল আধ্যাত্মিক পথের বাহক সফলকাম যুগহাদীর অনুসন্ধানে ও অনুসরণে, তাঁহার মহত্ত্ব মাহাত্ম্য ভাবধারা জানিতে উদগ্রীব।
এই মহান অলি আল্লাহের পরিচয় দিতে বহু খোদা তত্ত্বজ্ঞানী ভাষাবিদ ভক্ত সহচরগণ আরবী, উর্দু, ফারসী ও বাংলা ভাষায় নানা ভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয় গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। উহাদের প্রায় গ্রন্থ মুদ্রিত না থাকায় বর্তমানে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। হজরতের অনুগৃহীত অলিয়ে কামেল জ্ঞানসাগর শাহ্ ছুফী মৌলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আয়নায়ে বারী উহাদের অন্যতম। উহার উর্দু কপি প্রকাশিত হইয়াছে। শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আবদুচ্ছালাম ইছাপুরী ছাহেবের বাংলায় সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত হজরতের জীবনী খানিও ছাপানো না থাকায় বাংলা ভাষায় পরিচয় ও তথ্য সন্ধানী জন সাধারণ ও ভক্ত অনুরক্তদের পক্ষে তাহার প্রাথমিক পরিচিতি জ্ঞান অর্জন প্রায় দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। তাই নানা দেশ হইতে হজরতের বাংলায় জীবন চরিত তল্লাসী পত্রসমূহ মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহমদিয়া মনজিল অফিসে আসিতেছে এবং প্রতিদিন বহু উপস্থিত আগত অভ্যাগত ভক্তবৃন্দ উহা সংগ্রহে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। ভক্ত জায়েরিন গণের উপরোক্ত চাহিদা এবং অনুরোধ, হাদীয়ে কাওনাইন পীরে কামেল সোলতানে আজম হজরতের শুভ ছোহবত প্রাপ্ত সহচর এবং হজরতের একমাত্র উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীন পৌত্র গাউছে জমান হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করে।
আমি বহুদিন পূর্বে এই দুঃসাহসিক মহান কার্য্যে দৈবযোগে আদিষ্ট হইলেও সুযোগ না ঘটায় উহা কার্যকরি করিতে সক্ষম হই নাই। একদা আমার পীরে তরিকত উক্ত হজরত কর্তৃক প্রকাশ্যে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুমতি ও ইঙ্গিত বাহী হিসাবে তাঁহার সংগৃহীত হজরত আকদাছের অসংখ্য কেরামত

ও অলৌকিক ঘটনাবলী হইতে অতি বিশ্বস্ত দীনদার সাহচর্য্য প্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলির বর্ণিত এবং জন সমাজে সুবিদিত কয়েকটি ঘটনার অবিকল সংক্ষিপ্তসার নমুনা আদর্শ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া হজরতের পবিত্র পরিচয় দেওয়ার চেষ্টায় অত্র গ্রন্থখানী জ্ঞান ও ভাষাহীন অবস্থায় অতি বিনয় ভীত সঙ্কোচিত মনে সম্পাদিত করিয়া হজরতের তথ্য অনুসন্ধানী ভক্ত অনুরক্ত ও সুধী মণ্ডলী সমীপে উপস্থিত করিতে সাহস করিলাম।

খোদাতত্ত্বজ্ঞানী পাঠকগণ তত্ত্বজ্ঞানে উপকৃত হইলে, হজরতের অসীম অনুগ্রহে ও আদর্শবাদী ভক্তগণের শুভ আশীর্বাদে নিজকে ধন্য ও সাফল্য মনে করিব।

এই পবিত্র গ্রন্থখানী,–কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী–জনাব শাহ্ ছুফী হজরত মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর উত্তরাধীকারী আমার মুর্শিদে কামেল গাউছে জামান হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন কেবলার পবিত্র করকমলে সর্বসত্ত্বে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার ও মহান দয়ালু হজরতের অনুমোদনীয় কৃপাবারিতে দোজাহানীয় সফলতা ও চিরদাসত্ব কামনা করিতেছি। আমিন।।

খাদেম–

বিনীত-গ্রন্থকার

মৌলানা মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়া

(এম এম গোল্ডমেডালিষ্ট, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জীবনী ও কেরামত

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাম্‌দ

প্রাকৃতিক অবস্থা

বিশ্বস্রষ্টা মহান প্রভুর কি বিচিত্র লীলা! সৃষ্ট মানবের কি বিচিত্র অবস্থান! কতই যে তাহাদের পরিবর্তন! কতই না রহস্যময় কৌশলে তাহাদের উত্থান ও পতন। মহা কৌশলী করুণাময়ের করুণা চক্রেই তাহাদের দোজাহানের সুখ-শান্তি ও দুঃখ গ্লানি নিহীত। তাঁহার কৃপা বিন্দুতেই এই মহান শ্রেষ্ঠ জাতীর সৃজন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ। তিনিই তাহাদের উদ্দেশ্য ও কাম্য। তাহারাই একমাত্র প্রভুর উদ্দেশ্য ও পোষ্য। তাই তাহাদের খাতিরেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজিত ও সংরক্ষিত।

তাঁহার সর্বসৃষ্টি স্বভাবতঃ পরিবর্তনশীল ও ক্ষণ-ভঙ্গুর। এই পরিবর্তনশীল জগতে যুগে যুগে অলি ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বরিক শক্তির অভাবে চতুর্বিধ পার্থিব পদার্থে গঠিত মানব নানাভাবে বিভিন্নমুখি নাছুতি স্বভাব, রিপু ও ইন্দ্রিয় জালে স্বভাবতঃ জড়িত হইয়া পড়ে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য গুরুদায়িত্ব প্রেম প্রীতি ভুলিয়া ভব প্রকৃতির ধাপে ধাপে বিপথে বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

মানব-কাণ্ডারী জগতগুরু মহামানব বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর অন্তর্ধানের প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর কাল পর ছয় শত শতাব্দীতে যখন ধরণীর বুকে ধর্মীয় জগতে খোদাপ্রেম প্রেরণা ধর্মীয় আলোক রশ্মি নির্জিবতা ও অজ্ঞানতার আবরণে আচ্ছাদিত হইতেছিল, তখন যুগ উপযোগী আধ্যাত্মিক সবল হাদীর অভাবে ইছলাম রবি অস্তমিত প্রায় ডুবুডুবু অবস্থায় উপনীত হইতেছিল। আদল সৎজ্ঞান ও ঐশ্বরীক অনুপ্রেরণা বিহনে ধর্মাগ্রহী মুছলিম সমাজ বহুবিধ ধর্ম মতবাদী ধর্মীয় পন্থায় বিভ্রান্ত ও ধাঁধায় পতিত হইয়া নিষ্প্রাণ ধর্মনীতি পালনে এদিক ওদিক চলিয়া পড়িতেছিল। এহেন মহা সঙ্কট মুহূর্তে দয়াময় খোদাতা'লা তাঁহার চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আধ্যাত্মিক করুণ প্রেম প্রেরণাধারী বিশ্বঅলি হাদীকুল শিরমণি হজরত গাউছুল আজম মহিউদ্দিন শাহ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) কে ধর্মনীতি সংস্কারক; পুনঃ ধর্মসঞ্জীবক মহিউদ্দিন খেতাব ও ক্ষমতাদানে ভবে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারই আধ্যাত্মিক প্রভাবালোকে মুছলিম ধর্মীয় জগত পূর্ণোজ্জ্বল ও সজীব হইয়া পূণর্জীবন লাভ করে। তিনি তাঁহারই বেলায়েত প্রভাবে অনুকুল শাসন শক্তির সহায়তায় শরিয়ত মোতাবেক বিশ্ব ইছলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে টানিয়া আনিয়া নবজীবন দান করিয়া সুপথগামী করিয়াছিলেন।

ইহার সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক বৎসর কাল পর, আবার মোছলিম জাহান সনাতন ইছলামিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান খোদায়ী প্রেরণা শক্তি ও সময়োপযোগী মৃত সঞ্জীবক যুগসংস্কারক শক্তিশালী হাদীয়ে কামেল রূপী সূর্যে আধ্যাত্মিক রশ্মির অভাবে পতিত হয় এবং ধীরে ধীরে খোদা প্রেম প্রেরণা হারা হইয়া ধর্মনীতি পালনে এবং আধ্যাত্মিকতায় অনাসক্ত ও উদাসিন হইতে থাকে। মুছলিম জাহান পার্থিব মোহরিপু ও ইন্দ্রিয় প্রভাবে বিভোর হইয়া "তাকওয়া" ও বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিতে থাকে। খোদাভীতি ও প্রেম-প্রীতি ভুলিয়া আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া অতি সুখ; অতি বিলাস ও অতি লোভে নানা প্রকার শঠামী পন্থা অবলম্বনে অন্যায় ও অবৈধ আচরণে লিপ্ত হইতে থাকে।

ঠিক এমন সময় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর, বাংলায় এবং কিছু কালের মধ্যে সমগ্র ভারত এমন কি ভুখণ্ডের প্রায় অঞ্চলে ইংরেজ শাসন ও প্রভাব প্রবর্ণিত হয়। সমস্ত ধর্মীয় প্রভাব ও প্রভাবে পরিচালিত শাসন শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এবং কালক্রমে এক নূতন ধর্মবিহীন রাষ্ট্রনীতির পত্তন হয়। এই সময়ে ধর্মীয় আহকাম, বাধাগড়া শরীয়ত শাসন শক্তি সহায়তা হারাইয়া প্রধান্যতা ও ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ে। দায়িত্ব কেবল মাত্র বিবেক ও সৎজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হইয়া দাঁড়ায়।

এই যুগে নির্জ্জিব ধর্মীয় মানবকুল খোদায়ী দায়িত্ব বিচারবুদ্ধি খোদাভীতি ও পরকালীন পরিণতি ভুলিয়া নাছুতি স্বভাবকাম্য নীতিতে পরিচালিত হইতে থাকে। ভবস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবাদতে মালী–জাকাত, ছদকা, কোর্বানী আমানত আদায় প্রভৃতি তাহাদের স্বভাবগত ইচ্ছার একেবারে প্রতিকূলে গিয়া দাঁড়ায়। পরকালীন স্বার্থ নিহীত এবাদতে-বদনী একমাত্র তাহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া পড়ে।

ক্রমই তাহারা ধর্মীয় প্রেরণা–খোদাভীতি ও ধর্মাচরণ হইতে দিনদিন দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে। এবং যুগের তালে তালে বিধর্মীয় আচরণ ও সভ্যতাকে নিজ কৃষ্টীভুক্ত করিতে থাকে। কাজেই বিপরীত সাজে সজ্জিত জীবনহীন ধর্মাচার কেবল মাত্র ধর্ম নামের বোঝাবাহী স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আবার কেহ কেহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান প্রভাবে পড়িয়া অজ্ঞতার চাপে বিজ্ঞান শক্তির উৎস বুঝিতে না পারিয়া খোদার অস্তিত্ব ও নবী-অলির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বসে। ইহাতে তাহারা খোদার অভিশপ্ত জাতিতে পরিগণিত হইয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরিয়া, জাতীয় বৈশিষ্ট ও নৈতিক চরিত্র হারা হইয়া পশু ও পুতুল সদৃশ ব্যবহৃত হইতে থাকে।

ফলে খোদার অভিপ্সিত শাস্তি অভাব অনটন লাঞ্ছনা গঞ্জনা এবং পদদলনে জর্জরিত হইয়া ধনমাল বিবর্জিত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মভূমির প্রাকৃতিক অবস্থান

পরম করুণাময় প্রভুর অপার করুণা। দয়ালুদাতার অপরিসীম দান। তাঁহার কার্য্যকলাপ মানব ধারণার অতীত। যাহাকে তিনি ভালবাসেন তাঁহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি নিজ হইতেই করিয়া থাকেন। তাহাকে তিনি তাঁহার সর্বোচ্চ শান্তি নিকেতনে স্থান দিয়া থাকেন। তাঁহারই খাতিরে দোজাহানে অতুলনীয় স্বর্গের সংস্থান ও পত্তন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই কারণে সর্বপ্রকার নেয়ামতপূর্ণ অবদান সুরক্ষিত। তাঁহার মাহবুব কাহারো মুখাপেক্ষী হইতে তিনি কিছুতেই রাজী নহেন। তাঁহাকে সকল জাতীর মাননীয় ও সর্বপ্রকার ভক্তিভাজন করিয়া সেবার পাত্র করাই তাঁহার বাসনা। তাঁহার ওছিলায় সকল সৃষ্টজীবে কৃপাকণা বিতরণে তাঁহার মহিমা বিস্তারই একান্ত কামনা।

তাই ভূমণ্ডল মধ্য রেখার পূর্বকূলে এশিয়া প্রাচ্যদেশে চীনা, বার্ম্মা মঘ চাকমা, হিন্দু বৌদ্ধ মুছলেম খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আবাস ভূমির সংমিশ্রনে ও মধ্য স্থলে, চীন পাহাড়ের পাদদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল চট্টগ্রামের মধ্যখানে রামলক্ষণ সীতাদেবীর স্মৃতি জড়িত সীতাকুণ্ডের পূর্বাঞ্চলে, সকল জাতির মিলন কেন্দ্র করিবার অভিপ্রায়ে মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁহারই প্রিয়তম মাহবুবের জন্মভূমিকে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া তোলেন। ইহাই ইবনে বতুতার সবুজ সহর। আরববাসী ব্যবসায়ীদের "ছত্ত্বলা"। পাহাড়ীয় আহম জাতীদের ছাতংগং (শান্তিসেরা) বদরশাহ ও উর্দ্দু, কবি বর্ণিত চাঁটগাম। হিন্দুদের কথিত চট্টলা। ইংরেজদের লোভনীয় সুপরিচিত স্বাস্থ্য নিবাস চিটাগং। মোছলেম বাংলায় প্রচলিত চট্টগ্রাম। এবং মোছলেম নরপতিদের প্রিয় আবাদী ভূমি ইছলামাবাদ। ইহা পৃথিবীর অতুলনীয় ভৌগলিক বৈশিষ্টতাপূর্ণ

সুপরিচিত প্রাকৃতিক সুরম্য লীলা নিকেতন। সাগর উপসাগর নদনদী নির্ঝরিণী অহরহ সুস্নিগ্ধ অমৃত তুল্য পানীয় যোগায়। পাহাড় পর্বত উপত্যকা প্রভৃতি ইহাদের পুষ্প মাল্যে বিভূষিত করিয়া ইহার সেবায় রত ও দণ্ডায়মান আছে। সুজলাসুফলা, শষ্যশ্যামলা দ্বীপ উপদ্বীপ ও সমতল প্রাঙ্গণ আনন্দে ইহার আহার্য্য যোগায়। ইহার শান্তিময় বক্ষে সকলকে স্থান দিয়া নিয়তঃ দয়াময়ের অপার করুণার যশোগান করিতে সুযোগ দেয়।

এই মহা পুরুষের শুভআগমন সংবাদে ইহার যৌবন যেন পুলকানন্দে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। যাহার অভিনন্দন-প্রতিক্ষায় যুগযুগান্তর ধরিয়া নবনিত্য সাজে সজ্জিত হইতেছে, যাহার পবিত্র চরণ চুম্বনে অভিবাদন করিতে সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া–পথপানে তাকাইয়া রহিয়াছে, যাহার বিলম্বাগমনে বিরহক্রন্দনে নয়নবারি ধারায় নদী বহিয়া সাগর বক্ষ পরিপূর্ণ করিতেছে, আজ তাহার আগমনে খোস আমদেদ জানাইবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এই পূণ্য ভূমিতে দয়াময়ের প্রিয়তম বন্ধু ও মাহবুব ভাবী গাউছুল আজম আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাই তাঁহার কৃপাকণা লাভের অভিলাশে তাঁহারই গৌরবময় সিংহাসন অত্যুজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাকে যথাযথ অভিবাদনে সম্মান প্রদর্শন মানসে অসংখ্য সাধক অলি মুনি-ঋষিগণ যেন পূর্ব্ব হইতেই এই পূণ্য ভূমিতে স্ব স্ব আসন গ্রহণে ইহাকে সু-সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। অত্র কারণেই–এই চাটগামকে আউলিয়া দরবেশগণের জন্মভূমি সাধনাগার ও সমাধি নিকেতন বলা হয়। তাঁহারা যেন আশুবিশ্বঅলির আসনের চতুষ্পার্শে আসন পাতিয়া তাঁহারই এন্তেজারে তাঁহার শুভ আগমন কামনা করিতেছিলেন।

তিনি যেই থানায় বিকাশ লাভ করিলেন, ইহার নাম ফটিকছড়ি, যাহার বক্ষের উপর দিয়া স্বচ্ছ সুপেয় স্ফটিকবৎ জলধারায় পরিপূর্ণ অসংখ্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত আছে। স্বভাবতঃ এই জলধারা ধরণীর বুকে বেহেস্তের "জান জাবিল...ছালছাবিল" তুল্য স্নিগ্ধ হজমী ও সুপেয়। ইহা ঝরণারূপে পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপত্তি হইয়া দেশের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া সাগর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দেশের বর্ষা প্রকৃতি প্রেমের উন্মাদনায় যখন নদী

গিরী বন, জল বরিষণে প্লাবিত করিয়া দেয়, তখন এই স্নিগ্ধ নাহার গুলির মাতাল স্রোত ক্ষিপ্ত গতিতে বহিয়া আনে পাহাড়ীয় সম্পদ রূপি উর্বরা পলিমাটি। উহারা ঐ পলিমাটি যাওয়ার পথে সমতল ভূমিকে দিয়া যায়। আর দিয়া যায় তাহাদের দ্বারা বাহিত কচি কচি মৎস্য রাজি। ইহার বদৌলতে এই দেশবাসী বর্ষার পর আল্লার বর্ণিত "আশারা আমছালাহা" দশগুণ পরিশ্রমের প্রতিদান ও সঞ্চিত মৎস্য আহরণে পরমসুখে সানন্দে আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্ত্তন করিতে থাকে। তাই স্নেহমায়া পাহাড়ী নাহার বক্ষে রাখিয়া এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফটিকছড়ি। এই সমস্ত পাহাড়ী নাহারগুলির প্রভাবে এই দেশ অপেক্ষাকৃত সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা ও মনোরম দৃশ্যে সুশোভিত এবং দেশবাসীর অবস্থা অতি শান্তিময় ও স্বচ্ছল।
দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেই পবিত্র গাঁয়ের বুকে তিনি লালিতপালিত হইয়া বসবাস করেন, উহার নাম "মাইজভাণ্ডার।" ইহা ইছাপুর পরগণার অংশ বিশেষ। মঘ মুছলিম সংগ্রামকালে, মঘশক্তির বিরুদ্ধে অভিযানকারী মুছলিম সৈনিকদের খাদ্য ও যুদ্ধ সামগ্রী সরবরাহের জন্য উত্তর চট্টগ্রামে কয়েকটী সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হয়। তৎমধ্যে ইহাই ছিল মধ্য এলাকায় অবস্থিত। তাই ইহা মাইজভাণ্ডার বা মধ্য এলাকাস্থিত রেশন ও সামগ্রী সরবরাহ আগার বা ভাণ্ডার নামে সুপরিচিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার রহস্যমাখা লীলা বুঝা বড়ই দুস্কর। ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়ের সু-সাঙ্কেতিক বিকাশ। কালে যাহাকে তিনি বিশ্বমানব জাতীর পার্থিব রিপু জনিত গোপন শত্রুর সঙ্গে মহা সংগ্রামে অভিযান কারিকে প্রেম প্রেরণারূপী খাদ্য ও ইমানরূপী যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহক করিবেন,-যাহাকে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণ শক্তি কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তাঁহাকে তিনি আজ মহা-মুছলিম অভিযান শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র করিয়া দেখাইলেন। বিশ্বঅলি মাইজভাণ্ডারী যেই ভাণ্ডারে বসিয়া বিশ্বমানবের অভাব অভিযোগ আপদ বিপদ ও সংগ্রামে সাহায্য এবং শক্তি সরবরাহ করিবেন-তাহার নাম হইল মাইজভাণ্ডার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিকাশ গুরুত্ব

দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের প্রভূ! পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা যখন প্রেমের উন্মাদনায় মত্ত হইয়া প্রেমলীলায় প্রভুত্ব বিস্তার অভিলাসে নিজ নূরে, "নূরে মোহাম্মদ" সৃজন করিলেন তখন উহা তাঁহার লুপ্ত জগতে সুরক্ষিত ছিল। গুপ্ত প্রেমের লুপ্ত লীলায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না। বিচ্ছেদ বিনা তাঁহার প্রেমসাধ ফুটিয়া উঠিল না। তাই তিনি "মোহাম্মদী নূরে" সৃজন করিলেন সমস্ত সৃষ্টি। তাঁহারই সমীপে উপস্থিত করিলেন সমস্ত সৃষ্টি, পরীক্ষা করিতে প্রথম বারের মত দীপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "–আ–লাছতো বেরাব্বেকুম"? আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এক সুরেই প্রতি উত্তর হইল –"বালা"–হাঁ তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু। খোদার নূর মোহাম্মদী জাতী এই ভাবে প্রথম পরীক্ষায় অদৃশ্যমান জগতে উত্তীর্ণ হইল। তিনি দৃঢ় সংকল্প করিলেন তাহাদের এই বিশ্বক্ষেত্রে ভবলীলায় পাঠাইবেন। এবং শেষবারের মত প্রেমের পরীক্ষা করিয়া নিজ বন্ধুত্বে বরণ করিয়া লইবেন। এবং বিরহ বিচ্ছেদে প্রেম মিলনে চিরতরে একত্বে মিশাইয়া তাঁহার লীলাচক্র সাঙ্গ করিবেন। দৃশ্যমান জগতে পাঠাইতে হইলে তো–আকার নিশ্চয় দরকার। তাহারা তো নূরী। নৈরাকারই আছে। স্থির করিলেন, মোহাম্মদী গঠনই হইবে তাহাদের নির্দিষ্ট আকার এই আকারেই তাহাদিগকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাইবেন। মহাপ্রভু আল্লাহ্‌রই স্বরূপ মোহাম্মদী আদম ছুরত। সেই ছুরতেই সৃষ্টি করিলেন আদী পিতা আদম। তাঁহারই "ফরমাতে" গঠন হইবে সমস্ত মানবজাতি। পার্থিব অভিনয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের কিছুকাল থাকিতে হইবে। পার্থিব সংশ্রব তাঁহাদের অনেকটা দরকার। তাই সিদ্ধান্ত

হইল, চতুর্বিধ পার্থিব পদার্থের সংমিশ্রণে মানব আকৃতি গঠন উহা কার্য্যকরী করা হইল। মৃত্তিকা, অনল, জল ও পবন, এই চারি প্রকার ভবপদার্থে – সৃষ্টির সেরা আদম প্রতিমা গঠিত হইল। ইহাতে তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন – তাঁহার প্রবল জাতী নূরী ক্ষমতা "রুহ্"। যাহার প্রভাবে আদম প্রতিমা সজীব ও আলোকিত হইয়া গেল। আদমকে আল্লাহ্ তাহার প্রতিনিধিত্বে বরণ করিবেন। তাই তাহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত রূপের গুণজ আলো দান করিলেন। ইহাতে হইল খোদায়ী খেলাফত শক্তি–প্রতিনিধিত্বের পত্তন। ইহাই হইল মানবদেহে আল্লাহ্ তা'লার বেলায়েতী ক্ষমতার ভিত্তি। এখন আল্লাহ্ তাহার ক্ষমতা ও খেলাফত অর্পিত স্বাকার আদমকে নিরাকার সমস্ত সৃষ্টি ও ফেরেশ্তাগণের প্রতি সেজদায় অবনত মস্তকে তাঁহার খেলাফত ও প্রাধান্য মানিয়া লইতে আদেশ দিলেন। সকলেই তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া আদিপিতা আদম খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকারে মস্তক অবনত করিল। কিন্তু ফেরেশ্তা সর্দার আজাজিল অহঙ্কারে তাহার প্রাধান্যতা মানিল না। ইহাতে হইল সে পদচ্যুত অভিশপ্ত শয়তান। এই সময় হইতেই আদম জাতীর বিরোধী দলের সৃষ্টি। ইহাতে হইল আদমের প্রতি তাহার আক্রোশ। এইবার আল্লাহ্ আদমের আড়ালে গোপনে বসিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বারের মত পরীক্ষা করিয়া নিলেন। আদমকে তিনি "বেহেশ্তে" – শান্তি নিকেতনে স্থান দিলেন।

পরস্পর বিপরীত চার প্রকার ভব পদার্থে গঠিত মানবদেহে স্বভাবতঃ সপ্ত নফছ একে অন্যের প্রবল বিরোধী রিপুর উন্মেষ হইয়া বসিল। আম্মারা, লওয়ামা, মোলহেমা, মোতমাইন্না, রাজিয়া, মার্জিয়া ও কামেলা এই সাত প্রকার রিপু তাহার মধ্যে সঞ্চার হইল।

মানব জাতী এই সপ্ত প্রকৃতির প্রভাবে পরিচালিত হইতে বাধ্য। ইহাতেই উৎপত্তি হইল সপ্ত প্রকৃতির মানুষ। কাফের, মোশরেক, ফাছেক মোওয়াহিক, মোমেন, মোমেনেছালেহ, অলি ও নবী। এই সাত প্রকৃতির গঠনেই মানব চরিত্র স্বভাবতঃ গঠিত হইবার কারণ হইয়া উঠিল।

তাহাদের উপযুক্ত সংস্থান তো নিশ্চয় দরকার। তাই তাহাদের জন্য সৃজিত হইল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাত প্রকার জান্নাত ও সাত প্রকার দোজখ আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকে দোজখগামী করা তো তাঁহার মোটেই ইচ্ছা নাই। তাই তিনি নির্দেশিত করিলেন সুপথ ও কুপথ। ইহাতে আইন কানুনের একান্ত প্রয়োজন হইল। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালা আইন প্রণয়ন করিলেন। ইহার নাম দীনে ইছলাম; মহা শক্তির সামনে ক্ষুদ্র শক্তির মাথা নত করা। বিশ্বস্রষ্টা মহাশক্তিমান প্রভুর নিকট তাঁহার সৃষ্ট ক্ষুদ্র শক্তি অবনত মস্তকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া দাসত্ব মানিয়া নেওয়া। এবং তাঁহার ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব অকাতরে মানিয়া নেওয়া। ইহাতে অশান্তি নিবারণ হইয়া শান্তি বিরাজমান হয়। ইহাতেই বিশৃঙ্খলা নিবারিত হইয়া শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। ইহাই হইল খোদার রচিত পদ্ধতি শান্তিময় ইছলাম। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত সাম্প্রদায়িক শরিয়ত বা আইন নহে। ইহা সর্বজনিন একমাত্র খোদা প্রদত্ত নীতি সনাতন ইছলাম। ইহাই বাস্তব সত্য ও সত্য পথের দিশারী। ইহার পরিচালনা প্রচেষ্টায় নবি, অলি, মোজাদ্দেদ ও এমামের আবির্ভাব হয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালার আধ্যাত্মিক জগতের সাধারণতঃ চারিটি স্তর আছে। আলমে লাহুত, আলমে জবরূত, আলমে মালকুত ও আলমে নাছুত বা পার্থিব জগত। মানব চরিত্র মধ্যেও চারি প্রকার স্বভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। রহমানী, মালকানী, হায়ওয়ানী ও শয়তানী। হজরত আদম (আঃ) যখন শয়তানের প্ররোচনায় শয়তানী প্রকৃতির অধীন হইয়া রহমানী স্বভাবের প্রাপ্য স্বর্গের সর্বোচ্চ সিংহাসন হইতে শয়তানী স্বভাবের যোগ্য মোকাম আলমে নাছুতে আসিয়া পড়িলেন, তখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া খোদার দরবারে পুনঃ তাঁহার রহমানী মোকাম জান্নাত অর্জনের জন্য কাতর কান্নায় রত হইলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন– "আম্মা এয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদান।" অর্থাৎ তুমি এবং তোমার জাতীকে পুনরুদ্ধার করিয়া আনিতে আমার নির্দেশিত সুপথ তোমাদের নিকট অর্পিত হইবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালার জাতী নূরে সৃষ্ট মোহাম্মদী মহামানব যদিও উহার খোলস আদমছুরত পার্থিব পদার্থে গঠিত তবুও উহাকে স্বভাবমুক্ত নূর করিয়া স্বজাতে মিশাইয়া নিতে তিনি সর্বদা সজাগ ও চেষ্টিত। তাঁহার প্রিয় মাহবুব মোহাম্মদী গঠনকে বিপথগামী করিতে তিনি কিছুতেই রাজি নহেন। দ্বিতীয় সু-পথ প্রদানের জন্য তিনি আদমের নিকট প্রতিশ্রুত।

তাই তিনি প্রতি যুগে, প্রতি আদম গোত্রে বিভিন্ন নবী অলি যোগে তাঁহার রচিত ইছলামিক ভিত্তিতে ছহিফা কেতাব নামক আইনদপ্তর পাঠাইয়া আদম জাতিকে সজাগ ও সুপথ নির্দেশ করিয়াছেন।

নবুয়ত এক বিশিষ্ট পদমর্যাদা। মহাপ্রভু যুগকাল ও কউম অনুযায়ী কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার নবুয়ত ক্ষমতা দান করেন। ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই দান। তাঁহার নির্বাচন ও দয়া; কেহ ইহা কামনা ও সাধনা করিয়া অর্জন করিতে পারে না। ইহা স্থানান্তরিত, পরিত্যক্ত ও নষ্ট হয় না। কোন নবী পদচ্যুত ও পথভ্রষ্ট হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা'লার নির্বাচন যথাযথ ও নির্ভুল। ইহা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারাই সমাধা হইয়া থাকে। নবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নবুয়ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়। তাহার কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় না। শুধুমাত্র কিছুদিন উহার ফলই বাকী থাকে। উহা ইছলামের বাহ্যিক দিক মাত্র। ফেরেশ্তা – জিব্রাইল মারফত অহির দ্বারা ভালমন্দ জানিয়া চিনিয়া জনসাধারণকে উহা জ্ঞাত করাকেই নবুয়ত বলে। নবুয়ত দুই প্রকার। নবুয়তে খাচ্চা ও নবুয়তে আম্মা। নবুয়তে খাচ্চাঃ– যাহারা নবুয়ত ও রেছালত উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া মোরছেল, তাঁহাদের উপর কানুন সংক্রান্ত কেতাব অর্পিত হয়। তাঁহারা শুধু দৃশ্যমান জগতেই প্রচার কার্য্য করিতে সক্ষম। নবুয়তে আম্মাঃ– যাহারা মোরছেল নন্ বরং ছহিফা প্রাপ্ত সাধারণ নবী। নবীদের মধ্যে খোদাদাদ শক্তি বেলায়েতও থাকে; যাহা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব রহস্যময় বেলায়েতী সম্পর্ক বা গুণ। তাই নবীগণ অলিগণ হইতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আদেশ নিষেধ মূলক কার্য্যই তাঁহাদের প্রধান। বেলায়েত খোদায়ী শক্তি ও তাঁহার রহস্য জ্ঞান বলিয়া নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন সহজতর

হয়। তাই এল্কা ও এল্হামের দ্বারা খোদাতা'লার প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার গুপ্ত ব্যক্ত রাজ্য সমূহের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিধানের ক্ষমতা অর্পিত হওয়াকেই বলে বেলায়েত। বেলায়েত আদেশ নিষেধের বিধান অপেক্ষা, মূলরহস্য উদ্ঘাটনকেই বিশেষ প্রাধান্য দেয়। ইহাই দীনে ইছ্লামের সঠিক–রহস্যপূর্ণ আভ্যন্তরীণ দিক।

বেলায়েত দুই প্রকার। বেলায়েতে ঈমান ও বেলায়েতে এহছান। "বেলায়েতে ঈমান",–যাহা – খোদায়ী খেলাফতি গুণ ও সম্পর্ক। ইহা প্রত্যেক মোমেন নেককারের মধ্যে থাকে। নবীদের মধ্যে এই বেলায়েতে ঈমানই শুধু থাকে এবং ইহা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইয়া যায়। যাহা বেলায়েতে ঈমানকে অতিক্রম করিয়া ফানাফিল্লাহ্ মোকাম ত্যাগ করিয়া বাকীবিল্লাহ্ শক্তি অর্জন করিতে সহায়তা করে তাহাকে বেলায়েতে এহছান বলে। বেলায়েত পদবী আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র করুণার দান। তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা, এই মহান নেয়ামত দান করিয়া থাকেন। ইহা সাধনার ফল স্বরূপও অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু সাধিত বেলায়েতে ভুল ভ্রান্তি ও পদচ্যুতির আশঙ্কা থাকে।

আল্লাহ্ ও তাঁহার অলির মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে উহাকে বেলায়েতে ঈমান বলে। এই বেলায়েত প্রাপ্ত অলি পরলোক গমন কালে, বেলায়েত-ই ঈমান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে–চলিয়া যায়। আর বেলায়েত শক্তি যাহা–অলি ও জন সাধারণের সঙ্গে হেদায়েত রহস্যমূলক সম্পর্ক, উহা তাঁহার মনোনীত যে কোন ব্যক্তিকে তিনি দান করিতে পারেন। যে কোন যোগ্যতম ব্যক্তিকে তিনি প্রতিনিধি অলি নিযুক্ত করিতে সক্ষম। উহা সমাপ্ত হয় না বরং প্রতিনিধিযোগে প্রচলিত থাকে।

নবী শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাই (দঃ) আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র বাঞ্ছিত সর্বোত্তম প্রিয় বন্ধু। তিনিই সৃষ্টির আদী এবং তিনিই সৃষ্টির অন্ত। তিনিই সর্ব্বসৃষ্টির একমাত্র যোগ্যতম প্রতিনিধি। তিনি পরম করুণাময় কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ নবুয়ত ও রেছালত প্রাপ্ত হন। এবং সর্বযুগ উপযোগী ইছলাম নীতি মহাগ্রন্থ "কোরান" মজিদ প্রাপ্ত হন। তিনিই একমাত্র নবীদের মধ্যে

সর্বপ্রথম, যিনি বেলায়েতে ঈমান ও সর্বনিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক বেলায়েতে এহছান পদবী অর্জন করেন। ইহাতেই তিনি বেপরওয়া মুক্ত খোদা-দিদার মেরাজ প্রাপ্ত হন। ইহাই হইল আদম জাতীর নাছুত জগতে অবতরণের পর বাধাহীন প্রথম দিদার ও প্রভু-মিলন। ইহাতেই হইল মিলন পথ উদ্ঘাটন। তিনি হইলেন মোহাম্মদীয় নবুয়ত নীতি ধারী ও আহমদীয় বেলায়েত শক্তিবাহি বিজয়ী প্রথম মাহবুব। তিনি সমস্ত জাতীর পথের একমাত্র পাথেয়।

বহুকাল বিরহের পর আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয়তম মাহবুব মোস্তফাকে হাতে পাইয়া গেলেন। এখন আর নীতি ও পদ্ধতী প্রচার তাঁহার বিশেষ রহিল না। সুপথ ও রহস্যপথ আবিস্কার হইয়া গেল। এই পথে তাঁহারই বদৌলতে শুধু মোহাম্মদী মানবকে তাঁহার একত্ব পানে পৌঁছান বাকী রহিল। তাই তিনি রেছালত ও নবুয়ত চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিলেন। খোলা রাখিলেন শুধু আহমদী শক্তিতে উদ্ঘাটিত তাঁহার একত্ব মিলন পথখানী। ইহাই হইল দীন-ই-ইছলাম, ইহাই হইল "কোরান" পবিত্র গ্রন্থের মূল রহস্য ও প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিশ্বে প্রত্যেক নবী অলির এই একই উদ্দেশ্য ছিল। সকল নীতির একই রহস্য। তাহা আজ আবিস্কার ও নির্দেশিত হইয়া গেল। ইহাতে হইয়া বসিল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বেলায়েত পদ্ধতীর প্রাধান্যতা।

কিছুকাল পর নবীবর মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার স্থায়ী আহমদী বেলায়েত পদ্ধতীর প্রতিনিধিত্ব হজরত আলী (কঃ) কে অর্পণ করিলেন এবং অস্থায়ী মোহাম্মদীয় নবুয়ত পদ্ধতীর খেলাফত হজরত আবুবকর (রাঃ) কে দিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লার জাতে মিশিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তির অগোচরে ও আড়ালে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পর হজরত আলী (কঃ) ই এই বেলায়েতী তরিকায় বায়াত গ্রহণ করিয়া ফয়েজ এরশাদ করিতেন। এই সময় তিনি সাধারণতঃ তিন তরিকাতেই বায়াত গ্রহণ করিতেন।

১। আখিয়ারে ছালেহীনের তরিকা, – যাহা হজরত আবু বকর (রাঃ) হইতে হজরত ওমর, ওছমান ও হজরত আলী পর্যন্ত হুকুমত ও খেলাফত পদ্ধতীতে আসিয়া পৌছিল, যাহাতে স্বীকার উক্তি, ইমান ও আমল অপরিহার্য্য।
২। আবরারে মোজাহেদীনের তরিকা, – যাহা মুখে স্বীকার, ঈমান, প্রেরণা ও আমল অপরিহার্য্য। যাহাতে কঠোর-প্রেমপূর্ণ রেয়াজত সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়।
৩। শোহাদায়ে আশেকীনের তরিকা, – যাহাতে ঈমান ও প্রেম প্রেরণা একান্ত অপরিহার্য্য। নিজ প্রিয়ার প্রতি প্রাণ উৎসর্গে-প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন করা। শেষোক্ত তরিকাই আধ্যাত্মিক প্রেরণা শক্তির স্বরূপ। ইহা তিনি নবী করিম (দঃ) হইতে আহাদী শক্তির খেলাফত হিসাবে অর্জন করিয়াছিলেন।
তিনি আবরারে ছালেহীনের ভার হজরত হাছান বছরী (রঃ) কে, শোহাদায়ে আশেকীনের ভার হজরত ওয়ায়েছ করণী (রঃ) কে এবং আবরারে মোজাহেদীনের ভার হজরত হাছান ও হোছাইন (রাঃ) কে দিয়া যান। এই ভাবে তরিকত তাঁহার পর হইতে ত্রিধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। লক্ষ লক্ষ মানব উক্ত তরিকা মারফত প্রেমসুধা পানে–নিজ নফ্ছাক্রান্ত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া আল্লার প্রেম রাহে অগ্রসর হইতে থাকে। বহুসংখ্যক লোক ছালেক, আশেক ও মোজাহেদ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে খোদায়ী বেলায়েত অর্জন করিয়া সফলকাম হইতে থাকে।
এ'দিকে বেলায়েত প্রভাব ও আশেক ছাড়া নবুয়ত প্রভাবান্বিত শরিয়ত পদ্ধতীতে আগুয়ান মুছলিম জন সমাজ, সঠিক তথ্য ও প্রকৃত খোদাদাদ রহস্য জ্ঞানাভাবে নানা প্রকার ধর্ম মতবাদ, ফেরকাবন্দি মজহাব গঠিত হইতে থাকে। প্রচলিত সত্যসন্ধানী চার মজহাব ছাড়া আরো বিভিন্ন ধর্মমতবাদীগণ দিন দিন চরম হইতে চরমে উপনীত হইতে থাকে ফলে বহু ইমামের উৎপত্তি হয়। তাহাদের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রবাহে জন সমাজ বিভ্রান্ত ও দিগবিদিগ্ হারা হইয়া–নানা ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

কালক্রমে নবীবর মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) এর পর, ছয়শত শতাব্দিতে কালের দীর্ঘতায়, যুগের তালে ও যুগ উপযোগী বেলায়েত প্রভাবশালী যুগ সংস্কারক ঝাণ্ডাবরদার অলির আধ্যাত্মিক রশ্মির অভাব দেখা দেয়।

নাছুতী জগতের স্বভাব হইল মানবকে তাহার নাছুতী নফ্ছ কবলে আবদ্ধ করিয়া রাখা। এই অভাব ও ধর্মীয়-অচেতনতার সুযোগ নিয়া বিভ্রান্ত ও ধাঁধায় পতিত মানবকে রিপু ও ইন্দ্রিয়রূপি সেনাবাহিনী বিদ্রোহী চিরশত্রু শয়তানের নেতৃত্বে স্বজোরে আক্রমণ করিতে লাগিল। আক্রান্ত মানবকুল ক্রমে চরম অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা মোজাদ্দেদ পাঠাইয়া আধ্যাত্মিক আলোদানে ধর্মের নূতনভাবে প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন; এবং গাউছুল আজম হজরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) কে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া ধর্মে আধ্যাত্মিক প্রাণ দানে দীন-ই ইছলামকে স্বজীব ও সুপ্রশস্ত করিয়া লইলেন।

তাঁহার পর পাঁচ শতাব্দিরও উর্দ্ধকাল পর পুনঃ সুদীর্ঘকালের ছায়ায় ও যুগ পরিবর্তনকালে ধর্মে আধ্যাত্মিক প্রেরণা শক্তির অত্যন্তই অভাব হইয়া উঠিল। মুছলিম জাতী প্রায় পর গলগ্রহ ও পরাধীন হইয়া গেল। তাহারা ধর্মের সহায়ক রাষ্ট্রশক্তি হারাইয়া ফেলিল। এবং খোদার অভিশপ্ত জাতী হিসাবে পরাধীনতা ও নফ্ছ শয়তানীর শৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া গেল। নবী করিম (দঃ) এর পর ইহাই মুছলিম জাহানে বৃহত্তম অন্ধকার যুগ। ইহা একটি অপূর্ব যুগ পরিবর্তন।

ইহাতে যেন যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট বাধিয়া উঠিল। শুধু-মুছলিম নয়, বিশ্ব মানবের বুকে যেন এক নিরাশার অপূর্ব বেদনা জাগাইয়া দিল। খোদার বিশ্ব সৃষ্টির বুকে এক নূতন শোক উচ্ছ্বাশ তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। রবি শশী গ্রহ তারায় আকাশে বাতাসে এক ভয়াবহ চাঞ্চল্যকর রব উঠিল। কি এক অতৃপ্তিক দৃশ্য! আল্লাহ্ তা'লার সেরা সৃষ্টি মানব আজ বিপথে নফ্ছের কবলে! সে আজ নফ্ছের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ? তাহারা কাতরে বিশ্বত্রাণকর্ত্তা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা

(দঃ) এর পবিত্র দরবারে প্রার্থনায় রত হইল। হে বিশ্বের শান্তি, হজরত মোহাম্মদ (দঃ)! হে জীবের ত্রাণ কর্তা মহান নবী! আজ কোথায় তুমি! বিশ্ববাসী আজ প্রবল অন্ধকারের কবলে নিপতিত! তোমার ছুরতবাহী মানব আজ তোমারি প্রেরণা অভাবে নাছুত প্রকৃতির শয়তানী চক্রে শৃঙ্খলিত পরাধীন। তোমার নূরে সৃষ্ট মানব আজ দোজখ-পথের যাত্রী। তোমার ইছলাম রবি আজ অস্তমিত প্রায়।

তাহাদের কাতর আরাধনায় দয়াল নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আর নিরব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেমমাখা করুণা সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। করুণাময়ের একত্ব দেশ হইতে মদীনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তিনি যেন তাঁহার সোনালী সিংহাসনের নূরানী পর্দার আড়ালে করুণ অথচ দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন, – হে আমার বিশ্বজোড়া সেবক! হে আমার প্রেমিকগণ! আমি চির অমর। আমার মোহাম্মদী দীনরবি চির উদ্ভাসিত। দেরি নাই। সময় আসিয়াছে। গোমরাহী শত্রুর কবল হইতে আমার অনুগামী বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করিতে আমি চির উন্মুক্ত তরবারী হস্তে পুনঃ আসিতেছি। আমি যুগ উপযোগী, নিরপেক্ষ সার্বজনিন আহম্মদী পূর্নস্বাধিন ক্ষমতা লইয়া নির্জিব মানব হৃদয়ে ও ধর্ম জগতে নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিব। বিজ্ঞান আমার শক্তি। শাসন শক্তি আমার-ই ছায়া এবং ইঙ্গিত বাহী। সকল অধর্মীয় বিরূপ প্রতাপ চিরতরে খর্ব করিয়া আধ্যাত্মিক বিশ্বধর্ম প্রবর্তন করিব।

তাই রাষ্ট্র শক্তির বিনা সহায়তায় ঘোর বিপাকে পতিত বিপথ গামী মানবকে নফ্ছ শয়তানের মহাচক্রজাল ছিন্ন করিয়া সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বাধাহীন বেলায়েতে মোতলকার অধিকারী পূর্ণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধারী নিরপেক্ষ বিশ্ব অলির প্রয়োজন হইল। এমন এক মহান অলির প্রয়োজন দেখা দিল, যিনি সর্ববাধার আড়ালে বসিয়া সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করিয়া বিশ্ববাসীকে জাতী ধর্ম নির্বিশেষে স্ব স্ব তরিকায় স্বধর্মীয় স্থানে রাখিয়া আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগাইয়া সহজতর উপায়ে আল্লার একাত্ত্বালোকে আনিতে পারেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
জন্ম পূর্বাভাস

বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'লার এমন সুন্দর বিধান! কৃপাময় খোদাতা'লার অপার করুণার এমন এক অপূর্ব মহিমা। তাঁহার সৃষ্ট জগতে যাহাতে নৈরাশ্যের সঞ্চার না হয়, তাহারই বিধি ব্যবস্থা তিনি বহু পূর্ব্ব হইতে আড়ালে বসিয়া গোপনে করিয়া রাখিয়াছেন। নিখিল ধরিত্রীর একমাত্র করুণাময় বিশ্বমানবের প্রেমাস্পদ। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর আরো কিছুকাল পূর্বে দয়াময় প্রভু হজরত আবদুল্লাহ্ যোগে বিশ্ববাসীর প্রতি সাঙ্কেতিক ভবিষ্যত আভাসবাণী প্রকাশ করেন। মোহাম্মদী নূর শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। এক ভাগ আরবে উজ্জলিত হইয়া সারা বিশ্বভুবন আলোকিত করিবে। অপর ভাগ মুলকে আযমে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে উদিত হইয়া নিখিল ধরনীর অন্ধকার দূরীভূত করিবে (মৌলুদে দিল-পোজর দ্রষ্টব্য)।

হজরত আবদুল্লাহ (রঃ) হজরত আবদুল মোতালেব (রঃ) কে বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি মক্কাভিমুখে যাইতেন তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার পৃষ্ঠ মোবারক হইতে একখণ্ড পবিত্র নূর বাহির হইয়া মাটিতে দো-খণ্ডিত হইত। উহার একখণ্ড আরবে আলো-বিস্তার করিত অপর খণ্ড ক্ষণেক তাঁহাকে ছায়া দিত, ক্ষণেক আকাশ পানে ছুটিয়া যাইত। পরে দেখিতেন উহা মুলকে আজম, সূদূর এশিয়ার প্রতি দ্রুতবেগে গতিশীল হইয়া যাইত। "আরশের দ্বার তিনি খোলা দেখিতেন। ফেরেশ্তাগণ "আচ্ছালামু আলায়কুম এয়া হাবিবাল্লাহ্" রবে অভিবাদনে দিগদিগন্ত মুখরিত করিতে শুনিতেন।

আরবের সু-প্রসিদ্ধ অন্যতম অন্তঃচক্ষুধারী অলি, হজরত মহিউদ্দিন এবনে আরবী, যিনি হজরত মহিউদ্দিন গাউছুল আজম জিলানীর (রঃ) অদ্বিতীয় শিষ্য ও তাঁহার উপাধি নামে বিভূষিত ছিলেন। জনাব হজরত আহমদ উল্লাহ মাইজ ভাণ্ডারী (কঃ) ইহ জগতে আত্মপ্রকাশের আরো প্রায় ৫৮৬ বৎসর পূর্বে ৬৩৬ হিজরীতে ভবিষ্যতবাণী করিয়া যান যে, নবী করিম (দঃ) এর আরবে অস্তমিত রবি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পুনঃ উদিত হইবে। তাঁহার নাম থাকিবে খোদার জাতী নাম আল্লাহ্ এর সহিত সংমিশ্রিত। নবী করিম (দঃ)এর বেলায়েতী নাম আহমদ। অতএব মনে হয়, "আহমদ উল্লাহ্"। আল্লাহ্ এর জাতী নাম ও নবী করিমের (দঃ) বেলায়েতী নামের সংমিশ্রন। তাঁহার জন্মস্থান ভূখণ্ড মধ্য রেখার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত থাকিবে। উহা চীন পাহাড়ের পাদদেশ ও বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতীর সমাবেশ স্থল হইবে। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি হইবে–নবীবর আহমদ মজতবা মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পূর্ণ সাদৃশ্যতার প্রতীক। তিনিও খাতেমুল অলদ হইবেন। নবীবর (দঃ) এর মত কোন পুত্র সন্তান জগতে রাখিয়া যাইবেন না। তাঁহার ভাষা হইবে সংমিশ্রিত এক ভাবপ্রবণ ভাষা। তাঁহার রহস্যময় কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি চালচলন সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা নিতান্তই দায় হইবে।

দেখা যায় যে, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) পবিত্র নাম স্বাভাবিক ভাবে আহমদ ও আল্লার নামে সংযুক্তি আহমদ উল্লাহ্ রাখা হয়। তিনিই আকৃতি প্রকৃতিতে নবী করিম (দঃ) এর অবয়বতার সম্পূর্ণ সাদৃশ্যতার প্রতীক হন। ধরাধাম ত্যাগকালে তিনি কোন পুত্র সন্তান জীবিত রাখিয়া যান নাই। তাঁহার মাতৃভাষা সর্বভাষার সংমিশ্রনে মিশ্রিত এক অভিনব চাটগামী ভাষা। তাঁহার ভাবভঙ্গি সাধারণ লোকের জ্ঞানেরই উর্দ্ধে ছিল। তাঁহার জন্মভূমি "চাঁটগাম", ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে চীন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধ ও নানা জাতীর আদি আবাস ভূমি। ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায়, খৃস্টপূর্ব্ব যুগে চীনা, তিব্বতী ও আহম জাতীয় লোকেরা–এ'দেশের অধিবাসী ছিলেন। কালক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানেরা এই দেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে।

সৃষ্ট জীবের অতৃপ্ত বেদনা, গভীর নৈরাশ্যের ছায়া ও তাহাদের সুষুপ্ত হৃদয়ের অন্ধকার চিরতরে তিরোহিত করিবার মানসে শেষকালে বারোশত তেতাল্লিশ হিজরীর এক গভীর রাত্রে পরম কারুনীক আল্লাহ্ তা'লা হজরত মৌলবী ছৈয়দ মতিউল্লাহ্ ছাহেবের প্রতি এই শুভ আভাস দিলেন যে, অনতিবিলম্বে জগতবাসীর আশার আলো উদিত হইবে। একদা রাত্রে তিনি এশার নামাজের পর খোদার পবিত্র নাম স্মরণান্তে নিদ্রাভিভূত হইলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি আলমে মালকুতে ফেরেশ্তা জগতে ভ্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ আল্লাহ্ তা'লার বাস্তব রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তিনটি প্রদীপ আলোক তাঁহার সামনে উপস্থিত হইল। উহাদের একটি হইতে অপরটি অত্যোজ্জ্বল। তন্মধ্যে একটি প্রদীপ সূর্য্যসম জ্যোতীস্ময়। উহার রশ্মিতে যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিশ্বজীবে যেন এক নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। তাহাদের মনে প্রাণে যেন এক অভিনব আনন্দ স্পন্দন জাগিয়া উঠিল। এতদ্দর্শনে স্বচকিত অবস্থায় তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব আহ্লাদ উদয় হইল। এই স্বপ্ন রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁহার মন আকুল হইয়া পড়িল। কাহার কাছেই বা ইহার অর্থ জানিবেন। কে এই গুপ্ত রহস্যের তথ্য দিতে পারিবে। মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মৌলভী আবদুল হাদী ছাহেবের নিকট এই বৃত্তান্ত বলিয়া ইহার তাবির রহস্য জানিয়া নিবেন। তিনি অভিজ্ঞ মোত্তকী আলেম। তাঁহার স্বপ্ন রহস্যের মর্ম ব্যাখ্যায় নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা থাকিবে। তাঁহার মন বড়ই উদগ্রীব হইয়া উঠিল। ভোর হইলে তিনি তাঁহার নিকট গেলেন। নির্জনে স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। মৌলভী হাদী ছাহেব তাঁহাকে বলিলেন; যেন এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের কথা আর কাহারো কাছে না বলেন। তিনি কোরানে বর্ণিত হজরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন। এবং "আল্লাহু নূরুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আর্দে-মেছলু নূরেহি কা মেশকাতিন ফিহা মেছবাহুন আল মেছবাহু ফি যোজাজতিন্" ইত্যাদি আয়াত পাঠান্তে বলিলেন, যে–তাঁহার পবিত্র ঔরষে তিনজন সু-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবেন। সকলেই হাদী অলি হইবেন। তন্মধ্যে একজন সুবিখ্যাত বিশ্বঅলি হইবেন। যাহার

আধ্যাত্মিক আলোকে সারা বিশ্বভূবন আলোকিত ও মোহিত হইবে। তিনি সর্বদা খোদার পবিত্র দরবারে ইহার সফলতা কামনা করিতেন। কিছু দিন অতিবাহিত হইল। এক রাত্রে তাঁহার সহধর্মিনী ছৈয়দা বিবি খায়রুন্নেছা ছাহেবা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার স্বামী হজরত মতিউল্লাহ্ ছাহেবকে বলিলেন যে–তিনি এক আনন্দপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহার স্বামী স্ত্রী দু'জনে এক সাগরতীরে দণ্ডায়মান। অনেক লোক সাগরে নৌকাযোগে এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতেছে। কেহ কেহ সাগর জলে ডুবদিয়া কি যেন আহরণ করিতেছে। তাঁহারাও একখানা নৌকায় আরোহণ করিলেন। লোকেরা মুক্তা আহরণ করিতেছে জানিয়া তাঁহারাও জলে ডুব দিতে লাগিলেন। অতি সুন্দর চকচকে একটি ঝিনুক পাইয়া তিনি অতি সত্বর নৌকায় উঠিলেন। ঝিনুক খুলিয়া দেখিলেন, অত্যোজ্জ্বল একটি মুক্তা। উহার চাকচিক্যময় আলোকে সমস্ত নৌকা আলোকিত হইয়া গেল। তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন দেখিয়া সকলে তাঁহাদের প্রতি তাকাইল। এবং "মারহাবা" রবে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাঁহারা আরো মুক্তার আশায় ডুব দিয়া পর পর আরো দুইটি মুক্তা আহরণ করিলেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। অনেকে অনেক মুক্তা পাইল। কিন্তু তাঁহাদের প্রথম মুক্তার সমতুল্য জ্যোতিস্ময় মুক্তা কেহ পাইলনা। তাঁহারা আহ্লাদিত চিত্তে খোদার শোকরিয়া আদায় করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া হজরত মতিউল্লাহ্ ছাহেব উৎফুল্ল চিত্তে বলিলেন; "মোবারক"। সত্যই আপনি সৌভাগ্যবতী। দয়াময় আল্লাহ্ আপনার ও আমার স্বপ্ন সফল করুন। আপনার গর্ভে আল্লাহ্ এমন এক অত্যোজ্জল মুক্তারূপি সন্তান দান করিবেন, যাহার সু-কীর্তি জগত মুখরিত করিবে। যাহার আলোতে সারা ভূবন আলোকিত হইয়া যাইবে! খোদারই কৃপা, মোহাম্মদী দীন-রবি মোহাম্মদী আকাশে উদিত থাকিয়া খোদার সৃষ্ট সমস্ত জগত রওশন করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বংশ-পরিচয়

কোরাইশ বংশীয় মদিনাবাসী মহামানব বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পবিত্র বংশজাতি নয়নমনি হজরত এমাম হাছান ও হোছাইন (রাঃ) ছিলেন। এই পবিত্র দুই ধারায় নূর-নবী এশিয়ার প্রান্তরে আরবের বক্ষে ধীর গতিতে প্রসার লাভ করিয়া আসিতে ছিলেন। প্রকৃতির কি বিচিত্র কৌশল! কালক্রমে আরব পারস্য সাগরের উপকূলে বাগদাদের অন্তর্গত জিলান সহরে এই দুই পবিত্র ধারার শুভ মিলন হয়। ইহাতে, আবির্ভাব হয় অলিকুল শিরোমনি কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ছোবহানী গাউছুল আজম হজরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী আলহাছানী ওয়াল হোছাইনী রাজিয়াল্লাহু আনহু। তাঁহার পিতৃকুল হাছানী ও মাতৃকুল হোছাইনী ছিল।

এই মিশ্রিত শক্তিশালী ধারা আরব দেশ অতিক্রম করিয়া মুলকে আজমের প্রাঙ্গণে এশিয়ার প্রাচ্য দেশে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। স্বভাবতঃ তাঁহারা নবী প্রদত্ত হেদায়তী লীলায় সুদক্ষ। ধর্মীয় নেতৃত্বই তাঁহাদের বংশীয় ছৈয়দী মিরাছ।

হেদায়েত ও এমামতী উপলক্ষে তাঁহাদের কেহ কেহ দিল্লী সম্রাটের আমন্ত্রণক্রমে দিল্লী শাহী মসজিদের এমাম, হেদায়েত কার্য্য ও কাজী পদে নিযুক্ত থাকেন। কালক্রমে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরে মুসলিম নবাব কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া এমামতি ও কাজীর কার্য্য পরিচালনা করেন।

ছৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী নামক তাঁহাদেরই এক কৃতি সন্তান গৌড় নগরের বিচারালয়ে কাজী পদে নিয়োজিত হন। একসময় গৌড় নগর ভীষন

মহামারির ফলে প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। এই সময় খৃষ্টীয়–১৫৭৫ সনে কাজী ছৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী হেদায়তের সর্বোত্তম মঞ্চ খোদার অদ্বিতীয় শান্তি নিকেতন চট্টগ্রামে শুভপদার্পন করেন। তিনি পটিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে বসতি স্থাপন করেন। এবং হেদায়েত ও এমামতী কার্য্যে রত থাকেন। তথায় তাঁহার নামানুসারে হামিদগাও নামক একটি গ্রাম আছে। তাঁহারই এক পুত্র সন্তান ছৈয়দ আবদুল কাদের (রঃ) ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামে এমামতি উপলক্ষে আগমন করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র ছৈয়দ আতাউল্লাহ্ এক তৎপুত্র ছৈয়দ তৈয়বউল্লাহ্ উক্ত আজিম নগরেই বসতি ও এমামতি কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার তিন পুত্র সন্তান জন্মে। মধ্যম সন্তানের নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ্। তিনি মাইজ ভাণ্ডার গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি নিতান্ত দীনদার মোত্তকী আলেম ছিলেন। তাঁহাকে সকলে অতি সম্মান ও ভক্তি করিত। তাঁহারই পবিত্র ঔরষে–বিশ্ব অলি হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মৌলানা শাহ্ ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যবতী ছৈয়দা খায়েরউন্নেছা বিবিই হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) গর্ভধারিণী জননী। তিনি গাউছুল আজমের জননী হইয়া বিশ্ব-বরন্যা হইতে পারিয়াছেন। মা ফাতেমা খায়েরউন্নেছা (রঃ) এর উপাধি নাম খায়েরউন্নেছায় অলঙ্কৃত হইয়াছেন। তাঁহারই এই পবিত্র নামে হাসর ময়দানে গাউছুল আজম ভাণ্ডারীকে আল্লাহ্ পাক ডাকিয়া লইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জন্ম বৃত্তান্ত

একদা এক শুভ মুহূর্তে হজরত ছৈয়দ মতিউল্লাহ্ ছাহেবের মস্তক হইতে হজরত গাউছুল আজম তাঁহার জননী বিবি খায়ের উন্নেছা ছাহেবার পবিত্র উদরে স্থান গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার জননীর হৃদয়ে এক নূতন পুলক আভার উদ্ভব হয়। তিনি দিন দিন যেন নব যৌবন লাভ করিতে থাকেন।

সাগরাদি আহলাদে আত্মহারা হইয়া মেঘের মারফত রীতিমত অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে। জমি করুণার সুধা বারী গ্রহণে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া সহস্রগুণ স্বতেজ সবল হইয়া উঠে। বৃক্ষরাজি তরুলতা প্রেমানন্দে নাচিয়া নাচিয়া–প্রচুর ফলফুল দান করিতে থাকে। কালঋতু সকলেই যেন হাসিতে হাসিতে রীতিমত তাহাদের কর্তব্যে রত হইয়া পড়ে।

আকাশ বাতাস জড় চেতনে এক জিজ্ঞাসার রোল পড়িল, কখন আমাদের আশা রবি উদিত হইবে! কখন–আমাদের প্রাণ নিধি ধরায় আগমন করিবেন! কেন তাঁহার এত দেরী।

তাঁহার গর্ভকাল শেষ হইয়া গেল। এমন সময় প্রকৃতি যেন তাহাদের ডাকিয়া বলিল ঃ–

সুসংবাদ! সুসংবাদ! সজাগ হও হে বিশ্ববাসী! তোমাদের বাঞ্ছিত আশা রবি–উদিত হইতেছে। তোমাদের মুক্তি দিশারী ভবে পদার্পণ করিতেছেন। খোস আমদেদ জানাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন কর। এইদিকে আল্লাহ্ তা'লা–স্বয়ং বিবি খায়রুন্নেছাকে স্বপ্নযোগে খোসখবরি দিলেন।

জাগিয়া উঠো বিবি। আর ঘুমাইও না! আমার প্রিয় মাহবুব আসিতেছেন। তাহাকে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া নাও। স্নেহচুম্বন কর। তুমি যে তাঁহার স্নেহময়ী জননী।

সন ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ইংরেজী, ১১৮৮ মঘী ১লা মাঘ রোজ বুধবার দিবা দিপ্রহরান্তে জোহরের সময় আল্লাহ্‌তা'আলার হুকুমে শিশু গাউছ ভবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। খায়েরউন্নেছা বিবি আনন্দে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এক অতুলনীয় অপূর্ব দিব্যকান্তি শিশু ভবে নামিয়া আসিয়াছেন। যেন পূর্নিমার পূর্ণশশধর হাসিয়া হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে প্রভুর কৃতজ্ঞতা স্বীকারে স্নিগ্ধ স্নেহমাখা চুম্বনে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন।

জগত যেন এক নূতন আলোকে ছাইয়া গেল। চারিদিকে হাস্যময় কোলাহল। পুলক ধ্বনিতে এক অভূতপূর্ব আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল। দিগদিগন্ত যেন "মারহাবা," "মারহাবা" রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। কি আনন্দ! যাঁহার অপেক্ষায় বিশ্ববাসী ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। তিনি আজ ধরায় পদার্পন করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের পর অপরাহ্নের সূর্য্যরশ্মি নম্রসহকারে তাঁহার পদচুম্বন করিল। পাখীরা দলে দলে-তাঁহার আগমনী গীতি গাহিতে লাগিল। সমীরণ – দিগদিগন্তে তাঁহার শুভ বিকাশ খবর দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া দিল। ফুলবাগ আনন্দে রং বেরং এর সাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। নদনদী–আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া কুলকুল রবে–সাগর পানে ছুটিয়া চলিল। ভুবন ব্যাপি আজ আনন্দ লহরী। সমবেত দীপ্ত কণ্ঠে সবাই যেন গাহিতে লাগিল ঃ–

ছদ মরহাবা ছাল্লেআলা গাউছে খোদা পয়দা হোইয়ে
জানে জাঁহা ও কেবলায়ে আহলে ছফা পয়দা হোইয়ে ॥

তাহারা যেন তাঁহার চতুষ্পার্শে দাড়াইয়া বলিতে লাগিল ঃ–

মারহাবা এয়া-মারহাবা এয়া-মারহাবা
গাউছুল আজম মাইজ ভাণ্ডারী মারহাবা

সকলের মনে উল্লাস। সকলের মনে নূতন হাসি। আজ যেন বিশ্বের সর্ব্বত্র চরম মুক্তি পরম প্রবলতা। কোথাও দুঃখ নাই। দৈন্য নাই। রিক্ততার বেদনা নাই। সর্বত্র যেন অপূর্ণতার অবসান ঘটিয়াছে। অশান্তির বাগানে যেন প্রশান্তির ফুল ফুটিয়াছে। বিশ্বভুবনে আল্লার অপার করুণা; অনন্ত আশীর্বাদ যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকল দিকে বিষ্ময়পূর্ণ ধ্বনী-কে এই নূতন অতিথি? যাহার শুভাগমনে সমগ্র বিশ্ব আনন্দমুখর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি কোলে শিশু গাউছ

হজরত বিকাশ লাভ করিলেন। তিনদিন গত হইয়া গেল। সপ্তম দিবসে শিশুর নাম রাখা হইবে তাঁহার আব্বাজান আয়োজন করিতেছেন। রাত্রিকালে তিনি এক স্বপ্ন দেখিলেন, হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) তাঁহাকে বলিতেছেন– "হে মতিউল্লাহ্! তোমার ঘরে আমার প্রিয় মাহবুব আহমদ উল্লাহ্ আসিয়াছেন"। ইহা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কাহাকে হজরত প্রিয় মাহবুব আহমদ উল্লাহ্ বলিতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না। নবীবর তাঁহাকে পূনঃ বলিলেন,–"তোমার ঘরে আমার মাহবুব বিকাশ লাভ করিয়াছেন। আমি তাঁহার নাম আমার "আহমদ" নাম আল্লাহ্ যুক্ত করিয়া আহমদ উল্লাহ্ রাখিলাম"। এইবার তিনি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার শিশু সন্তানের কথাই বলিতেছেন। ক্রমে সপ্তম দিবস আসিয়া পড়িল। তাঁহার নাম রাখার আয়োজন করা হইল। ছুন্নতি প্রথায় তাঁহার আকিকা করা হইল। আত্মিয় স্বজন জমায়েত হইয়াছেন। সকলেই নাম প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতাকে নাম প্রস্তাব করিতে বলা হইল। তিনি বলিলেন, "তাঁহার নাম আহমদ উল্লাহ্ রাখিতে আমি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছি। আহমদ উল্লাহ্ রাখাই বাঞ্ছনীয়"। সবাই স্বপ্নে প্রদত্ত পবিত্র গুরুত্বপূর্ণ নাম শুনিয়া খুশি হইলেন। খোদার দরবারে দুইহাত তুলিয়া সবাই মোনাজাত করিলেন। এখন তিনি আহমদ উল্লাহ্ নামে সমাজে পরিচিত হইবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার কি অপার মহিমা! যাঁহাকে তিনি সর্বোত্তম মাহবুব রূপে গ্রহণ করিবেন; তাঁহাকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদি ও অন্তকালীন মাহবুবের গুপ্তব্যক্ত নামে ও সমস্তগুণে সজ্জিত করিবেন। তাই তাঁহার বিকাশের বহু পূর্বেই তাঁহার নাম আহমদ উল্লাহ্ রাখিয়া তাঁহার

জাতী নাম "আল্লাহ্" ও প্রিয়তম মাহবুবের বেলায়তী নাম "আহমদের" সর্বগুণে রূপায়িত করিয়া গোপন জগতে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং পরে ধরাবক্ষে তাঁহার নামের বিকাশ করিলেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার গুণও বিকশিত করিবেন।

তাঁহার ইচ্ছা প্রকৃতির এমনি বিধান, তাঁহার খোসনুদি বিকাশের এমনি অবস্থান। এই ধারা কি সহজে কেহ বুঝিতে পারে! এই পবিত্র নামের রহস্য কি যে কত প্রশস্ত, কত গভীর। ইহার গুরুত্ব যে কত অসীম। ক্ষুদ্রজ্ঞানী মানবের সাধ্যই বা কি তাঁহার ইচ্ছা রহস্য বুঝার।

তাঁহার নামের বৈশিষ্ট্যতা

অলি-সর্দার গুপ্তজ্ঞানবীর মৌলানা মহিউদ্দিন এবনে আরবী জনাব হজরত গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। এই নামের অধিকারী ও তাঁহার বর্ণিত লক্ষণধারী মহামানব পরম দয়াময় বিশ্বস্রষ্টার জাতে ফানা হইয়া তাহারই জাতে বাকী ও স্থায়ী হইয়া মিশিয়া থাকিবেন।

"আহমদু" ইহা একটি আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের রূপ "হামদুন" ধাতু হইতেই উৎপন্ন। একবচন উত্তম পুরুষ এবং বর্তমান ভবিষ্যত উভয় কাল বুঝায়। অর্থঃ–আমি প্রশংসা করিতেছি বা করিব। আহমদ উল্লাহ্ অর্থঃ–আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করিতেছি ও করিব। ইহা একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশক বাক্য। "আহমদ উল্লাহ্" ও আহমদু লিল্লাহ্ উভয় বাক্যের একই অর্থ।

ইহা আরবী গ্রামার বা ব্যাকরণ মতে ছেফতে মোবালাগাতেও ব্যবহৃত হয়। ছেফতে মোবালাগা কর্তৃ ও কর্ম্ম বাচক উভয় রূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব "আহমদুল্লাহ্" 'মোহাম্মদুল্লা' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আহমদউল্লাহ অর্থ আমি আল্লাহ্র প্রশংসাকারী এবং আল্লার প্রশংসিত বন্ধু উভয়ই হয়। 'আহমদু' শব্দটি গায়েরে মনছারেফ রূপে ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতঃ উহা নীম্নগামী কোন হরকত দ্বারা রূপান্তরিত হয় না। বরং উহা স্বাধীন শব্দ। কোন আমেলের প্রভাবে পরিচালিত নহে। উহার উর্ধ্বে ব্যবহৃত হরকতই শুধু গ্রহণ করে। তাই আহমদ নামীয় ব্যক্তির স্বভাব সর্বদাই উর্ধ্বগামী। স্বভাবও সাধারণতঃ উর্ধ্বগামী

হয় এবং স্মরণকারীকে আল্লার প্রতি উর্ধ্বগামী করাই উহার অন্তর্নিহিত অভ্যাস। “আল্লার” আহাদ নামের সম্পর্কই উহাতে অত্যধিক।

“আল্লাহ্” এই নামটী আল্লাহ্ তা’লার সর্বগুণে সর্ব্ব ছেফতে বিরাজমান থাকিবার প্রথম স্থান। ইহা হইতেই সমস্ত নামাবলীর উৎপত্তি। এই শক্তিতে সমস্ত সৃজন-কার্য্য সম্পাদিত। ইহাতেই সমস্ত নামগুণ ও সৃষ্ট সমাবেশিত ও সম্মিলিত হইবে। ইহার স্বভাব সমস্ত “মখলুক”কে উর্দ্ধে টানিয়া আনা। “আল্লাহ্” এবং “আহমদ” সংযোগে যে আহমদউল্লাহ্ শব্দ গঠন হয় উহা নামাজের অন্তর্গত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্রিয়া সমূহের নির্দেশ বাহক। যেমন নামাযে দাড়ান অবস্থা “আলেফ”। রুকু অবস্থা “হে”। সেজদা অবস্থা “মিম”। বসা অবস্থা “দাল”। প্রথম রাকাতে আহমদু হয়। পূনঃ দাড়ান অবস্থা “আলেফ”। রুকু অবস্থা “লাম” সেজদা অবস্থা-হায় দো-চসমী আকারে আল্লাহ্ গঠিত হয়। বসা অবস্থা “মোহাম্মদ’ পূর্ণ আকার হয়। অতএব আহমদ উল্লাহ্ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মোহাম্মদ সাদৃশ আল্লাহ্ তা’লার আহকামাবলী ও উহার কার্যকরি ব্যবস্থার নির্দেশ করিয়া যাইতেছে। তাঁহার নামের অর্থ যেইরূপ আমি আল্লাহ্ তা’লার প্রশংসা করিতেছি সেইরূপ কাজ কর্ম্ম উপাসনা এবং ভাবভঙ্গির ভিতর দিয়াও তিনি উহা প্রমাণ করিয়া যাইতেছেন। প্রতি অক্ষরেই তিনি স্বনাম ও গুণে কার্য্যকরী তাঁহার আকার অনুযায়ী নামাজ গঠিত। এবং তিনি নামায রূপে গঠিত। নামাযই তিনি। সুতরাং আহমদ উল্লাহ্ নাম আল্লাহ্ পাকের জাহের বাতেন সমস্ত গুন সমবায়ের বিকাশস্থল। আহমদ উল্লাহ্ নামের বৈশিষ্টতা অনেক। যাঁহার নাম আহমদ উল্লাহ্ তিনি নিতান্তই গৌরবময় ও আল্লাহ্ তা’লার প্রশংসিত। স্বাভাবিকভাবে উক্ত নামের তাছির ও গুন তাঁহার উপর অর্পিত হইয়া থাকে।

তাঁহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তিনি স্ব-ইচ্ছায় তাঁহার মাতার দুধ পানে ক্ষান্ত দেন। তিনি যেন শিশু প্রকৃতির আড়ালে বসিয়া আল্লাহ্ পাকের কোরানে বর্ণিত আদেশ পালন করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার মাতা বিস্ময় বোধ করিলেন। খোদার দরবারে অত্যানন্দে শোকরিয়া আদায় করিলেন। কারণ দুধ ছাড়াইতে কোন বেগ তো পাইতে হইলওনা বরং তিনিই যেন মাতাকে কোরানের আদেশ পালন করাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাল্যাচরণ ও বিদ্যা অর্জন

ক্রমেই তাঁহার চারি বৎসর চারিমাস বয়স অতিবাহিত হইল। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে যত্ন সহকারে গ্রাম্য মক্তবে পাঠাইলে তাঁহাকে আরবী ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল। প্রকৃতির কি মধুর লীলা! তাঁহাকে এখন মক্তবে যাইতে হয়, অথচ তাঁহার কোন সঙ্গির প্রয়োজন হয় না। পরম করুণাময়ই তাঁহার যথেষ্ট সঙ্গি। তিনি প্রত্যহ যথা সময়ে পাঠশালায় যান। যথারীতি তাঁহার শিক্ষকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে থাকেন। পড়া শুনায় কখনও অবহেলা করেন না। পাঠশালায় সাথীদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সম্প্রীতি। কাহারো সাথে কোন বিবাদ নাই। হিংসা বিদ্বেষ নাই। অনাবশ্যকীয় কোন আলাপ নাই। গুরুভক্তি ও পাঠে মনোনিবেশই তাঁহার স্বভাব হইল। শিশুকাল হইতে তিনি নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। তিনি অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাশালী ছিলেন। পাঠের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একদিকে আল্লাহ্ ও নবী বর্ণিত রহস্যরাজী কোরান ও মছায়েলার কেতাবাদি পঠনীয়। অপরদিকে পরম করুণাময়ের বিশাল বিচিত্রময় প্রাকৃতিক পটভূমি তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থ। তাঁহার মনে কত যে জিজ্ঞাসা জাগে। কতই না প্রশ্ন তাঁহার মনের গহনে অন্দোলন করে। কে এই বিশাল ধরণীর পঠভূমি সৃজন করিল। কেনই বা ইহার সৃজন। সৃষ্টির আড়ালে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে। নগর-কাননে, জল-স্থলে, আকাশে-বাতাসে এত কোলাহলই বা কিসের! চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা কিভাবে পরিচালিত হয়। কে তাঁহাদের পরিচালক। পশুপক্ষী প্রভৃতি কার জয় গান গায়। কাহাকেই বা তাহারা – স্মরণ করে। আল্লাহ্ আবার কেমন।

আমাদের সৃজন রহস্য কি! কাহার ইঙ্গিতে এই সমস্ত পরিচালিত হইতেছে। কে তিনি! তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য কি! এই সমস্ত প্রশ্নের তাৎপর্য সমাধানে প্রায় সময় তিনি মগ্ন থাকিতেন।

একদিকে গুরুজন, অন্যদিকে মহাপ্রভু আল্লাহ্ সৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান নানা ইঙ্গিতে তাঁহার জ্ঞানচক্ষুর সামনে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে জ্ঞানের উচ্চাসনে অধিষ্টিত করিতে লাগিলেন।

সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি নামায শিক্ষা করেন। এখন হইতে তিনি মহাপ্রভুর উপাসনায় রত। রীতিমত তাঁহার বাবার সাথে জামায়াতে নামায আদায় করিতেন। নামাযের সময় হইলে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন। নামায আদায় না করা পর্যন্ত তিনি শান্ত হইতেন না। লিখাপড়ায় সবসময় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় কেহ পারিয়া উঠিতনা। তাঁহার লিখাপড়া ও আচার ব্যবহারে গুরুজন ও দেশ বাসীর তিনি স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন। তাঁহার ভক্তি, নম্রতা ও একাগ্রচিত্ততার গুণে সকলের মন জয় করিয়া ফেলিলেন। দেশবাসীর মনে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল। কালে এই বালক নিশ্চয় দেশের ও বংশের গৌরব হইবে। তাঁহার বাল্য আচরণ যেন সমগ্র জীবনের সূচীপত্র গঠন করিয়া দিল। এমনি ভাবে তিনি বাল্যকালিন শিক্ষা সুনামের সহিত শেষ করিয়া নিলেন।

এখন দেশীয় কোন স্কুল মাদ্রাসায় তাঁহার লিখাপড়ার সুব্যবস্থা আর নাই। চট্টগ্রামে তখন উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা ছিলনা। তাঁহার বাবার আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়। অথচ তাঁহাকে যাইতে হইবে উচ্চ শিক্ষার মানসে সুদূর কলিকাতা। কলিকাতা ছাড়া ধর্মীয় আরবী উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা বাংলায় অন্য কোথাও ছিলনা। দেশবাসী তাঁহার উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁহার বাবাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কলিকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় প্রেরণ করা হইল। তখনকার দিনে বর্তমানের মত রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই। জল পথে নৌকা ও স্থল পথে হাটিয়া বালক গাউছুল আজম ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সুদূর কলিকাতা অভিমুখে চলিলেন।

অতঃপর ১২৬০ হিজরীতে তিনি কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি স্বভাবতঃ ছুফী ও মোত্তকী প্রকৃতির, সততা ও সত্য নিষ্ঠায় তিনি আল-আমিনের প্রতীক ছিলেন। পঞ্জগানা নামায তিনি মসজিদে জামাত সহকারে আদায় করিতেন। কোন প্রকার নফল নামায তিনি ত্যাগ করিতেন না। প্রায় সময় তিনি নফল রোজা রাখিতেন। তাঁহার জীবনে কোন দিনও তিনি শেষ রাত্রে বিশ্রাম করিতেন না। তাহাজ্জদ ও ছালাতে তছবিহ নামাযে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কোরান ও অজিফা পাঠ তাঁহার অপরিহার্য ছিল। প্রায় সময় ছুন্নত নফল এবাদত নিয়া তিনি মসজিদে এতেকাফের মতই থাকিতেন। ঐশ্বরীক প্রতিভা ও তেজস্বী ছিল বলিয়া তিনি অল্প সময় অধ্যয়নে সমস্ত পাঠ্য বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া নিতেন। রাত্রের দুই ভাগ তিনি আল্লার এবাদত ও ধ্যানে কাটাইতেন। বিভোর ঘুমের অভ্যাস তাঁহার মোটেই ছিলনা। বিশ্রাম অবস্থায় তন্দ্রাতেই এক তৃতীয়াংশ রাত যাপন করিতেন। তন্দ্রায় ও জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা তিনি বাঅজু পরীস্কার পবিত্র থাকিতেন। মধুস্বর ও মৃদুহাসি তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি কখনও অতি আলাপ ও অট্টহাসি পছন্দ করিতেন না। সময়ে সময়ে তিনি মুক্ত মাঠে, নির্জন নিভৃত স্থানে এবং নদীপারে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সময় সময় এদিক ওদিক চিন্তারত অবস্থায় পায়চারী করিতে থাকিতেন। আবার কোন সময় নিরবে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। সময় মত নিজ গন্তব্য স্থানে দ্রুত আসিয়া পড়িতেন। পথে ঘাটে ছালাম ছাড়া কালাম কারো সাথে করিতে চাহিতেন না। গতিপথে এদিক সেদিক দর্শন ও গৌন করা তিনি পছন্দ করিতেন না। বরং অধঃ দৃষ্টিতে মাদ্রাসায় যাওয়া আসা করিতেন। জুমা রাত্রে শবে-কদর ও শবে বরাতের রাত্রতুল্য এবাদত করিতেন। জুমার দিনে ঈদের দিনের মত সম্মান ও সমারোহের সহিত জুমার নামায পড়িতে যাইতেন। ইছলামী সমস্ত পবিত্র ও বড়দিনগুলি তিনি অতি সম্মানে যাবতীয় ছুন্নত মোস্তাহাব পদ্ধতী পালনে উদযাপন করিতেন। এমন কি মেছওয়াক, ঢিলা কুলুপ ও সুগন্ধি ব্যবহার তুল্য সাধারণ মস্তাহাবও তিনি ত্যাগ করিতেন না। খোদাপ্রেম, গুরুভক্তি ও পবিত্র আচরণে ছাত্র

শিক্ষক ও জনসাধারণ মোহিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার সঙ্গে যে একবার সাক্ষাৎ করিত, তাঁহার মৃদুমধুর আলাপে মুগ্ধ হইয়া যাইত। এবং চিরকাল তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইত। তিনি নিতান্তই ধীর স্থীর বিচার বুদ্ধি ও নম্র স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাকে ছোট বড় সকলে অতি সম্মান ও ইজ্জতের চক্ষে দেখিতেন। অনেকেই তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে নিয়া আদর যত্নে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাকে শারীরিক ও আর্থিক পাঠোন্নতীয় সেবা দানে সহায়তা করিতে অনেকেই আগ্রহশীল ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো মুখাপেক্ষি হওয়া পছন্দ করিতেন না। জায়গীর থাকা পর্যন্ত তিনি পছন্দ করিতেন না। বাল্যকাল হইতে তিনি ওয়ায়েজ নছিহত, দরুদ ও মিলাদ শরীফ শ্রবণ নেহায়েত ভালবাসিতেন। মিলাদ মাহফিলের সংবাদে তিনি যথায় তথায় চলিয়া যাইতেন। প্রায় সময় তিনি অলি আল্লাদের মাজার শরীফ জেয়ারতে বাহির হইতেন। কোন কোন সময় সারারাত মাজার পার্শ্বে কাটাইয়া দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি অধ্যয়ন কার্য মসজিদেই সমাধা করিতেন। এইভাবে প্রায় আট বৎসর কাল তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। প্রতি বৎসর তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। মাসিকবৃত্তি, পুরস্কার ও সুনাম অর্জন করিতেন। ১২৬৮ হিজরী সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। হাদিছ, তফছির, ফেকাহ, মন্তেক, হেকমত, বালাগত, অছুল, আকায়েদ, ফিলছফা ও ফরায়েজ যাবতীয় শাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। আরবী, উর্দু, বাংলা ও ফারসি ভাষায় তিনি অশেষ পারদর্শী ছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন

হিজরী–১২৬৯ সনে যশোর জেলায় বিচার বিভাগে তৎকালিন কাজীপদে নিয়োজিত হইয়া স্ববংশীয় পূর্ব পুরুষগণের প্রথম মিরাছ প্রাপ্ত হন। একবৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। কর্তৃপক্ষ ও জন সাধারণের নিকট সুনাম অর্জনে শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন। দোষীর প্রতি শাস্তি দিলে তাঁহার মন বিষাদে মুসড়িয়া পড়িত। রহমতুল্লীল আলামীনই তাঁহার স্বরূপ। সৃষ্ট বিশ্ব জীবের প্রতি দয়াই তাঁহার কার্য্য। দয়া না করিয়া তো তিনি পারেন না। উক্ত কার্য্যে তাঁহার মন বসিলনা।

তাই তিনি অন্য উপায় স্থির করিলেন। তিনি মুনসেফী অধ্যয়ন করা স্থির করিলেন। স্বত্ত্ব সাব্যস্তে মানব স্বত্ত্ব "হক্কোল এবাদ" রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব ভার নিবেন। যেইখানে নিষ্ঠুর কোন আচরণ নাই; আছে শুধু সত্ব ও সত্যের তথ্য আবিস্কার–আছে শুধু হক ও না হকের স্বার্থপূর্ণ মহা সমস্যার সমাধান। তাঁহার আর্থিক উপার্জনও দরকার। তাহা না হইলে কিভাবে তিনি অধ্যয়ন সমাপন করিবেন। শুধু উপার্জন করিলেও চলিবেনা আল্লাহ্‌র খোসনুদী অর্জনও নিতান্ত দরকার। ঠিক করিলেন, তিনি আল্লাহ্ তা'লার দীনে ইছলাম শিক্ষা দিবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মানবের উপকার করিবেন। সেই সময় কলিকাতায় মুনসী বো আলী (রঃ) এর মাদ্রাসায় প্রধান মোদার্রেছের পদ খালী ছিল। তিনি শিক্ষা কার্য্যে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষ অতি সাদরে তাঁহাকে আহ্বান জানাইলেন।

অতঃপর ১২৭০ হিজরীতে যশোর জেলার কাজীপদে তিনি স্ব-ইচ্ছায় ইস্তফা দিলেন। এবং কলিকাতা আগমনে উক্ত মোদার্রেছি কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে তাঁহার কর্তব্যকার্য্য আরো বাড়িয়া গেল। একেতো খোদা প্রদত্ত আমানত রূপী পবিত্র কোরান ও হাদিছ শিক্ষাদান, এবং নিজ এবাদত এবং তদুপরি মুনসেফী আইন গ্রন্থ অধ্যয়ন।

এই ভাবে তাঁহার একবৎসর কাল কাটিয়া গেল। মুনসেফী পরীক্ষার সময় আসিল। কাগজ কলম হাতে তিনি মানব কল্যাণে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী। তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইল। ফলাফলের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। গুজব রটিল, এইবার দুষ্কৃতিকারীরা পরীক্ষার প্রশ্ন বাহির করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে। ধীরে ধীরে গভর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। হজরত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই দিকে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেও দুষ্কৃতিকারীদের আচরণের ফলে এইবার সকলের পরীক্ষা নাকেছ ও অগ্রাহ্য করা হইল। কাহাকেও সনদ দেওয়া হইবে না। ইহা কার্য্যকরী করা হইল। কাহাকেও পরীক্ষার সনদ দেওয়া হইলনা। যাহাকে আহকামুল হাকেমিন নিজ প্রতিনিধিত্ব অর্পনে সর্বোত্তম হাকিমের আসন দান করিয়াছেন, তাঁহাকে কি তিনি সাধারণ হাকিমী আসনে বসিতে দিবেন। সেই সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইলনা। সামান্য একটা পার্থিব বিচারালয়ের কার্য্যে তাঁহাকে আটক রাখা আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় ছিল না। খোদার বন্দেগী সমাপনই তাঁহার একমাত্র কর্তব্যপূর্ণ চাকুরী ছিল। কলিকাতা নগরীর অলিতে গলিতে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতাবাসী তাঁহাকে অত্যধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার জন্য ওয়ায়েজ মাহফিলের আয়োজন করিতেন। অতি সম্মান ও আদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইত। পাল্কী যোগেই তাঁহাকে প্রায় সময় মজলিসে নেওয়া হইত।

দশম পরিচ্ছেদ

বেলায়েত অর্জন

একদা হজরত পাল্কীযোগে ওয়ায়েজ মাহফিলে যাইতেছিলেন। পথে এক দূরদর্শি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ছাহেবে কশফ অলির অন্তর্চক্ষুতে তিনি ধরা পড়িলেন। ইনিই হইলেন সু-প্রসিদ্ধ বাগদাদবাসী হজরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম মহিউদ্দিন ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর বংশধর ও উক্ত তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত সুলতানুল হিন্দ ছরদারে আউলিয়া গাউছে কাওনাইন শেখ ছৈয়দ আবু শাহ্মা মোহাম্মদ ছালেহ্ আল কাদেরী লাহোরী। তাঁহারা তিন ভাই। তাঁহার বড় ভাই এর পবিত্র নাম হইল হাজীউল হারমাইন হজরত শাহ্ ছৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ। তিনি খোদার ভাবে চির কুমার ছিলেন। হজরত শাহ্ ছৈয়দ দেলাওয়ার আলী অতি জজব পূর্ণ কুতুবে জামান ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা খোদা প্রেম প্রেরণায় মত্ত অবস্থায় হুজরায় গোশানশীন থাকিতেন। সপ্তাহে শুক্রবারে একদিন মাত্র তিনি হুজরার বাহিরে আসিতেন। তিনি কাহাকেও হাত ধরিয়া মুরিদ তলকীন করিতেন না। কথিত আছে তিনি যখন বাহিরে পদার্পণ করিতেন, তাঁহার চেহারা দর্শনে মানুষ কি পশুপক্ষী পর্যন্ত জজবাতী অবস্থায় অজদ ও প্রেরণায় প্রেম নৃত্য করিতে থাকিত। তাঁহার ছোট ভাইয়ের পবিত্র নাম ছিল, হজরত শাহ্ ছুফী মোহাম্মদ মুনির। তিনিও সুপ্রসিদ্ধ পীরে কামেল ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব পুরুষগণ দিল্লী ও লাহোরে থাকিয়া হেদায়েত কার্য্য করিতেন। ক্রমান্বয়ে লাহোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত তাঁহাদের হেদায়েত কার্য্য চলিতে থাকে। হেদায়েত উপলক্ষে তাঁহারা কলিকাতা নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের শিষ্য ও ভক্ত অনেক। হজরত শাহ্ ছুফী

ছৈয়দ আবু শাহ্মা তাঁহার অর্জ্জিত "লাল" অর্পণ করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোজে আছেন। একদা জোহর নামাযান্তে তিনি তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মত তাঁহার ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার বালাখানায় বসিয়া ধর্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, তখন কে যেন আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে জ্যোতির্ময় "লালধারী" আবু শাহ্মা! তোমার বাঞ্চিত মুরাদ, অতুলনীয় উপযোগী পাত্র, তোমার সম্মুখ দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে অতি সত্ত্বর সাদরে গ্রহণ কর।" দেখিতে দেখিতে হজরতের পাল্কী সোয়ারী তাঁহার বালাখানার সম্মুখস্থ বৈঠকখানার পার্শ্ববর্তী রাস্তার দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে লাগিল। প্রেমিক শিকারী শিকারের আশায় নয়ন তীর নিক্ষেপ করিতেই শিকার যেন তীর বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যেন পাল্কীর ফাঁদে হজরতের চন্দ্রাকৃতি অত্যোজ্জ্বল চেহারা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে তিনি কৃতি সন্তান সোয়ারী! নিশ্চয় তিনি হাদীকুল বীর কেশরী। তোমরা কি কেহ তাহাকে চিন?" সকলে স্বচকিত ও নিরব। কেবল মাত্র তাঁহার শিষ্য প্রবর শাহ্ এনায়েত উল্লাহ্ ছাহেব উত্তর করিলেন, "হাঁ হুজুর চিনি"। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করিলেন। ইহাতে তিনি আরো অধিক আকৃষ্ট হইয়া গেলেন। শাহ্ এনায়েত উল্লাহ্ ছাহেবকে তড়িত গতিতে তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ বাসনা জানাইতে আদেশ দিলেন। শিষ্যপ্রবর হজরতের পাল্কীপাশে যাইয়া সংবাদ জানাইলেন। হজরত দ্বিধায় পড়িলেন। বহু লোক ওয়ায়েজ মাহফিলে তাঁহার জন্য এন্তেজারে রহিয়াছে। আয়োজিত মাহফিল। আবার এইদিকে একজন মহান অলি আল্লাহের সাক্ষাৎ এর আহ্বান। উপেক্ষা করা চলে না। নিশ্চয় ইহাতে কোন প্রকার খোদায়ী রহস্য নিহিত আছে। হজরত ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া চুপ রহিলেন। তৎপর বলিলেন, "আচ্ছা আল্লারই অনুগ্রহ। তাহাই হউক। চলুন"। সোয়ারী ফিরাইয়া দেওয়া হইল। পাল্কী হইতে তিনি অবতরণ করিলেন। উপস্থিত শিষ্যরা তাঁহাকে অতি আদর অভ্যর্থনায় তাঁহাদের পীর ছাহেবের বৈঠক খানায় নিয়া গেলেন। হজরত খেদমতে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন জানাইতেই হজরত শাহ্ ছৈয়দ আবু

শাহ্‌মা ছাহেব তাঁহার গদীশরীফ হইতে দণ্ডায়মান হইয়া সাদরে তাঁহার সহিত ছুন্নতী কর মর্দন ও বক্ষ মিলামিলি করিয়া তাঁহার পালঙ্কের উপর নিজ গদীতে পরম বন্ধুর মত পার্শ্বে বসিতে দিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রেম বিনিময় ও রহস্যপূর্ণ প্রেমালাপ আরম্ভ হইল। শিষ্যবৃন্দ এই অভিনব অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে অবাকচিত্তে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই প্রেম অভিনয় ক্রিড়ায় লাহোরী ছাহেবের প্রেম মঞ্চে বসিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী গোপনে লভিয়া লইলেন তাঁহারই অর্জিত গাউছিয়া "লাল"। নয়ন ঠারে আহরণ করিলেন তাঁহারই আহরিত সৌভাগ্য পরশমনি। তাঁহারই দস্তে বায়াত হইয়া প্রতিদানে প্রাপ্ত হইলেন গাউছিয়তের খোদাদাদ খনি।

অতঃপর শাহ্‌ ছুফী হজরত আবু শাহ্‌মা তাঁহার অন্যতম খলিফা উক্ত এনায়েত উল্লাহ্‌ ছাহেবকে আন্দর বাবুর্চি খানায় পাঠাইয়া যাবতীয় তৈয়ারী খাসখানা হজরতের সামনে উপস্থিত করিতে নির্দেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে উহা প্রতিপালিত হইল। এনায়েত উল্লাহ্‌ ছাহেব পাত্রপূর্ণ সমস্ত খাস খানা হস্তে খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হজরত আবু শাহ্‌মা ছাহেব উহা কবুল করিতে হজরত ছাহেবকে নির্দেশ দিলেন। হজরত নিজ বাসভবন হইতে যথারীতি পানাহার করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তবুও তাঁহার পীর ছাহেব প্রদত্ত ফয়েজ বরকতপূর্ণ তাবার্রোকী খানা গ্রহণে তিনি বিরত হইলেন না। বিছমিল্লাহ্‌ বলিয়া খানা গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে পাত্রপূর্ণ খানা নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি হইল না। যদিও পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ খানা ছিল। তিনি আরো খানা চাহিলেন। হজরত আবুশাহ্‌মা ছাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হে প্রিয়তম! আমার বাবুর্চি খানায় আপনার জন্য যাহা সুরক্ষিত ছিল তাহা আনিত হইয়াছে। আরো অধিক প্রয়োজনে আপনি স্ব-হস্তে পাকাইয়া খাইবেন"।

সত্যই যেন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার কলবরূপী বাবুর্চি খানায় সারা জীবনের অর্জিত খোদায়ী নেয়ামত, যাহা মৌজুদ ছিল সবই তাঁহাকে অর্পন করা হইয়াছে। আরো প্রয়োজন হইলে, তাঁহাকে উহা নিজ প্রেম প্রেরণায় এবাদত ও রেয়াজতের বদৌলতে অর্জন করিতে হইবে। এমনি করিয়া

হজরত আকদাছ অপ্রত্যাশিত ভাবে পীরের প্রথম সাক্ষাতে তাঁহার সঞ্চিত যাবতীয় নেয়ামত ও খোদাদাদ শক্তি লুটিয়া নিলেন। এবং প্রথম দর্শনে তাঁহার সমগুণে রূপায়িত হইয়া প্রধান খলিফা রূপে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর গাউছে পাক সেইদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর হজরত শাহ্ ছুফী আবুশাহ্মা ছাহেব বলিতে লাগিলেন, এইবার খোদা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যাঁহার প্রতিক্ষায় ছিলাম, তাঁহাকেই আল্লাহ্ তা'লা মিলাইয়া দিলেন। সারাটা জীবনে সবে মাত্র একটি লোকের হাতেই হাত মিলাইলাম। আল্লাহ্ তাঁহাকে মহিমান্বিত করুন।

হজরত বিদায় গ্রহণান্তে বাসায় ফিরিলেন বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমনি এক যোগসূত্র পাতিয়া রহিল যাহার কোন সীমাপরিসীমা নাই। আছে শুধু সুদূর প্রসারী দাহন। তাঁহারা একে অন্যের মিলন প্রয়াসী, দর্শন প্রত্যাশী। একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া পারিতেন না। কালচক্রে কোন দিন সাক্ষাৎ করিতে অপারগ হইলে হজরত আবুশাহ্মা বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং হজরত আকদাছের বাসায় আসিয়া পড়িতেন। এমনিভাবে দুই দেহে এক প্রাণ হইয়া হজরত আকদাছ ফানা ফিশ্শেখ মোকাম অতি সত্ত্বর পূর্ণাকারে অতিক্রম করিয়া লইলেন। এমতাবস্থায় কিছুদিন যাওয়া আসা চলিতে লাগিল।

এই হেন অবস্থায় তিনি পূর্ব বর্ণিত শাহ্ ছাহেবের বড় ভাই কুতুবুল আকতাব জনাব হজরত শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ ছাহেবের খেদমতে গিয়া ফয়েজ গ্রহণে আদিষ্ট হইলেন। পীর ছাহেবের এই আদেশে তিনি অতি আহলাদিত চিত্তে তাঁহার খেদমতে রাওনা হইলেন। এমনি সময় চিরকুমার আলহাজ্ব হজরত শাহ্ দেলাওয়ার আলী ছাহেব আপন হুজরা শরীফ হইতে বাহিরে পদার্পন করিলেন। হজরত আকদাছ তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতেই, তাঁহার শুভদৃষ্টি হজরতের প্রতি আকর্ষিত হইল। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর ফয়েজে এত্তেহাদীর প্রভাব বিস্তার করিলেন। এবং তাঁহার অর্জিত সমস্ত খোদাদাদ শক্তি এবং

বাতেনী নেয়ামত কুতবিয়ত পরশমনি হজরত আকদাছকে সাদরে দান করিয়া দিলেন, এই ভাবে হজরত দুইজন মহান পবিত্র মনিধর আউলিয়ার দুর্লভমনি আহরণ করিয়া নিলেন। না জানি কোন মোহিনী বলে কোন ঐশ্বরীক যাদুর আকর্ষণে প্রথম সাক্ষাতেই হজরত তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া নিতে পারিয়াছিলেন।

কামেলিয়ত অর্জন

এখন হইতে হজরতের জজবাতী অবস্থা অত্যধিক গালেব হইয়া পড়িল। ত্রিমুখি প্রবাহী চতুর্বিধ ধারা বাহি বাগদাদী সাগরের সংমিশ্রনে মহা প্রশান্ত সাগর সৃজিত হইল। "অলাল আখেরাতো খায়রুল লাকা মিনাল উলা"। প্রথম হইতে সর্বশেষ পরিণাম ফল অতি উত্তম। এই পবিত্র খোদাবানীর সার বস্তু হইয়া উহাদের জজবাতী হিল্লোল মালায় সমস্ত সাগর মহাসাগর হিল্লোলিত হইতে লাগিল। তবুও তিনি শান্ত নন ক্ষান্ত নন। তিনি আরো অসীমের প্রত্যাশী। সসীমে মিশিয়া কি ভাবে তিনি শান্ত হইবেন? অপরিসীম বিশ্বজোড়া বিশাল সাগর হইতেই তাঁহার বাসনা। নিখিল ধরনীর সমস্ত মহাসাগর মিলন কেন্দ্র ও শক্তি উৎস গঠিত হইতেই তাঁহার একমাত্র কামনা তাই তিনি দিবাভাগে দীনি শিক্ষা দানে ও সারাটী রাত্র জাগিয়া নিঝুম ধ্যানে অক্লান্ত এবাদত ও অকাতর রেয়াজত সাধনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি যেন তাঁহার পীর ছাহেবের 'সহস্তে পাকাইয়া খাইবেন' পবিত্র নির্দেশ বানীকে সযত্নে কার্যকরী করিতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রাচুর্য্যে প্রায় সময় তিনি আত্মভোলা হইয়া পড়িতেন। মোরাকাবা মোসাহেদায় তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। ক্রমেই হজরতের জজবাতী হাল এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিল যে প্রেরণাধিক্যে বিভোর হইয়া পানাহার ত্যাগ পাইতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই জীবন মরনের আশা ও ভয় ভীতি নাই। অনিদ্রা অনাহারে প্রায় দিন কাটিতে লাগিল। সময়ে যৎসামান্য নাস্তা বা পানী পানে রোজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সমস্ত শরীর কৃশ ও চক্ষু চেহারায়

মলিনতার চিহ্ন দেখা দিল। বায়াত গ্রহণের প্রায় সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল পর ১২৭৩ হিজরীতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া একেবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি নিতান্ত দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাতো তাঁহার সাধারণ রোগ নহে। ইহা তাঁহার অজানাকে জানিবার জন্য অন্তর্বিপ্লব। গোপন খোদারহস্য হৃদয়ঙ্গমে অশান্তি ও উদ্বেগ। তাঁহার চির বাঞ্চিত স্থায়ী বন্ধুর প্রেমের দাহন। যাহার বিরাম ও উপসম নাই। ডাক্তার ও ঔষধ নাই, আছে মাত্র প্রিয়া মিলনের দুর্জয় আশা। অন্তরে হিল্লোলিত নূরানী তরঙ্গমালা।

এই সময় তাঁহার দুইজন বন্ধু প্রানপণে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছিলেন। একজন সুলতানপুরি মৌলভী জান আলী ছাহেব অপর জন হইলেন আসকরাবাদী জনাব মৌলভী আবদুল বদি ছাহেব। তাঁহাকে দেখিতে সর্ব্বদা লোকসমাগম হইতে লাগিল। কাহারো সঙ্গে কোন কথা নাই শব্দ নাই। তাঁহারই ভাবে তিনি নিস্তব্ধ এবং অভিভুত অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

স্বদেশী বন্ধুদ্বয় দৈনন্দিন তাঁহার দৈহিক অবনতি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। কি করিয়া এমতাবস্থায় তাঁহাকে বাড়ী আনা যায়।

এই দিকে হজরতের পরিবারে এক মহা বিপর্যয় ঘটিল। তাঁহার আব্বাজান মৌলভী ছৈয়দ মতিউল্লাহ্ ছাহেব ১২৭৫ হিজরীর আষাঢ় মাসের ২৯ তারিখে রোজ সোমবার দিবা দ্বিপ্রহরান্তে জোহর নামাযের পর এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া জান্নাত বাসী হন। শোকে তাপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল সকলেই অশান্তিতে আছেন। এমনি দুঃসময়ে আসিল হজরতের দুঃসংবাদের পত্র। সকলে মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। খোদার মহিমা! দুঃখের উপর দুঃখ। হজরতের জননী সন্তানের জন্য আকুল হইয়া পড়িলেন। সকলের পরামর্শ ক্রমে হজরতের মধ্যমভ্রাতা জনাব শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আবদুল হামিদ ছাহেবকে কলিকাতায় পাঠান হইল। তিনি হজরতকে তাঁহার পীরের নির্দেশক্রমে উক্ত বন্ধুদ্বয়ের সহায়তায় অতিযত্নে বাড়ীতে আনিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ
বিবাহ বন্ধন ও সাংসারিক জীবন

খোদাতা'লার অসীম কৃপা। বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁহার শরীর যেন দিন দিন সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু পূর্ব্ববৎ ধ্যান-রত এবাদত রেয়াজতে নিমগ্ন রহিয়া গেলেন। ক্রমে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থা বেশ উন্নতি লাভ করিল। সংসারের প্রতি তিনি যেন একেবারেই উদাসীন। কর্ম্ম কোলাহল, সামাজিক জীবনের পঙ্কিলতা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্র জ্যোতির্ময় গতি স্রোত যাহাতে রূদ্ধ হইয়া না পড়ে, পারিপার্শিকতার মলিনতা, পারিবারিক মায়ামোহ যাহাতে তাঁহার মানসক্ষেত্রে প্রেম পথে আবরণ সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি সর্বদা সচেতন ও স্বজাগ রহিলেন। প্রকৃতির অন্তরালে কি যেন তিনি দেখিতে পাইতেন; কি যেন বিস্ময়কর রহস্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি অবিরাম নয়নে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন।

তাঁহার স্নেহময়ী জননী পুত্রের এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিভাবে সংসারের প্রতি পুত্রের মন আকৃষ্ট করিতে পারেন। স্থির করিলেন বিবাহের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলে নিশ্চয় তিনি সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। বিবাহ ঠিক করা হইল। ১২৭৬ হিজরীর বৈশাখ মাসে ৩২ বৎসর বয়সের সময় একদা আজিম নগর নিবাসী মুন্সী ছৈয়দ আফাজ উদ্দিন আহমদ ছাহেবের কন্যা মোছাম্মৎ ছৈয়দা আলফুন্নেছা বিবির সহিত হজরতের বিবাহ বন্ধন স্থাপন করা হয়। প্রকৃতির লীলা; আল্লাহ্ তা'লার মর্জ্জি, ছয়মাসের মধ্যে তাঁহার এই বিবি জান্নাত বাসী হইলেন। ঠিক সেই বৎসরই হজরতের জননী তাঁহাকে পূনঃ উক্ত আজিম

নগর নিবাসী ছৈয়দা লুৎফুন্নেছা বিবির সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

তিনি উক্ত আজিম নগর নিবাসী জনাব ছৈয়দ আফাজউল্লাহ্ ছাহেবের স্নেহের কন্যা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও রূপলাবন্যময়ী রমনী ছিলেন। প্রেম প্রীতি ভালবাসায় তিনি নানাভাবে কায়মনোবাক্যে হযরতের চিত্তবিনোদনে খেদমত করিয়া সংসারের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিশ্ববিমোহন পরম সুন্দরের অরূপ রূপের এবং প্রেমের আকর্ষণে যাহার মনোপ্রান হরিয়া নিয়াছে, তাঁহাকে কি দুনিয়ার মোহ বা মানবী সুন্দরীর প্রেম জাল অনুক্ষন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। হজরত পূর্বের মত নির্বিকারে আরো অধিকতর রেয়াজত সাধনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই ভাবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ প্রায় দুই বৎসর কাল গত হইয়া গেল। ১২৭৮ হিজরীতে তাঁহার এক কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইল ছৈয়দা বদিউন্নেছা বিবি। ইনি চারি বৎসর বয়সে জান্নাতবাসী হন। ইহার পর তাঁহার আর একটি পুত্র সন্তান হইয়াও অল্পদিনে ইহ সংসার ত্যাগ করেন। এখন হজরত নিঃসন্তান। সকলেই চিন্তিত। ১২৮২ হিজরী বাংলা ১৩ই চৈত্র তারিখ সন্ধ্যা কালে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম রাখা হয় ছৈয়দ ফয়েজুল হক। ইহার আরো আট বৎসর পর ১২৮৯ হিজরীতে তাঁহার এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার নাম রাখা হয় ছৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা। হজরতের একমাত্র পুত্র সন্তান জনাব মৌলভী ফয়েজুল হক ছাহেব দুনিয়াতে দুই জন পুত্র সন্তান রাখিয়া অল্প বয়সে হজরতের পূর্বেই জান্নাতবাসী হন।

হজরত আকদাছ ১২৭৬ হিজরী হইতে ১২৭৮ হিজরী সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র দুইবৎসর কাল মাঝে মাঝে হেদায়েত কার্য্য ও ওয়ায়েজ নছিহত করিতেন। তাহাও যথারীতি নয়। সময়ে সময়ে তিনি দাওয়াত গ্রহণ করিতে মোটেই রাজী হইতেন না। কিছুদিন পর তিনি ওয়ায়েজ নছিহতও ছাড়িয়া দেন। এমনিভাবে সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল কাটিয়া গেল। তাঁহার সময়

আসিল। বিশ্বপ্রভু পরম করুণাময় যেন তাঁহার প্রেম-প্রেরণার টানে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেমপুষ্প সজ্জিত হৃদাসনে আসিয়া চিরতরের জন্য বসিয়া গেলেন। এই ভাবে এমনি করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় যাবতীয় সুখশান্তি ও স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়া, অবিরাম অবিশ্রান্ত কঠোর নিঝুম সাধনার পর হজরত আকদাছ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি, সর্বোত্তম বেলায়েত পদবী;–বেলায়তে ওজমার অধিপতি সাব্যস্ত হইলেন। পরম দয়াময় বিশ্বপতির অদ্বিতীয় মাহবুব মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) স্থানে উপবিষ্ট সর্বগুণাধিপতি ও শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

হজরত আর গোপনে থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে অসীম দয়াল। তৃষ্ণার্ত ভুবন বাসীর জন্যই তাঁহার সৃজন। তিনি কি আর প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারেন? খোদা যে নিজ হস্তেই তাঁহার প্রচার ভার গ্রহণ করিলেন। হজরত ছিলেন বে পরওয়া। অর্থ উপার্জনে তিনি কোন চেষ্টাই করিতেন না। পরম দয়াময়ের প্রতি তিনি সুদৃঢ় নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার অটল বিশ্বাস, তিনিতো একমাত্র তাঁহারই। নিশ্চয় তিনি প্রতিপালন করিবেন। তাঁহার তাওয়াক্কালের এই সুদৃঢ় রজ্জুই তাঁহার উপার্জনের একমাত্র প্রচেষ্টা।

তাঁহার ভাইগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, তাহাদের উপার্জিত অর্থ না পাইলে হয়তো তিনি উপার্জনে সচেষ্ট হইবেন। তাই তাঁহারা হজরতকে ভিন্ন সংসার ও পৃথকান্নের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিলেন। তাঁহারা হইলেন হজরতের ছোট ভাই। তাঁহারা যাহা করিলেন, ইহাতে হজরতই সন্তুষ্ট রহিলেন। হজরত বুঝিতে পারিলেন ইহা আল্লাহ্ তা'লারই মর্জি। আল্লাহ্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

হজরতের পৈতৃক জমিতে কে চাষাবাদ করিবেন? স্থির করিলেন; তাঁহার ভাইয়েরা জমিতে চাষাবাদ করিবেন। তাহাদের পারিশ্রমিক বর্গা ভাগ অর্ধাংশ কাটিয়া বাকী অর্ধাংশ হজরতকে দিবেন। তখন সন ১২৮২ হিজরী। এখন হইতে হজরতকে মোট চাষাবাদী উপার্জনের এক ষষ্ঠাংশ দেওয়া হইবে। এই সিদ্ধান্তে এজমালী চাষ কার্য্য চলিতে লাগিল। হজরতের আম্মাজানও তাঁহার সঙ্গে আছেন। হজরতের এখন ভিন্ন পরিবার। তবুও

তাঁহার কোন চিন্তা নাই, উপার্জনের কোন প্রচেষ্টা নাই। আছে মাত্র পরম দয়াময়ের উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরষা। তিনি বলিতেন, মানুষ আল্লাহের শ্রেষ্ঠতম বান্দা। ভক্তি ভরে তাঁহারই দ্বারে আত্মসমর্পণ করা একান্ত উচিৎ। অতএব পাপ হইতে বিরত থাক। তাঁহার কর্তব্য পালনে স্বচেষ্ট হও। তাঁহার সন্তুষ্টি ও শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর। তাঁহার সমস্ত কার্য্যে ছবর ও ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। তিনি নিশ্চয় সর্ব্বসমস্যা সমাধা করিবেন। দৃঢ় সংকল্পী হজরত কাহারো কথায় মন দেন না। কাহারো অনুরোধে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি শুধু আল্লাহের আদেশ ও ইঙ্গিত প্রতিপালন করিতেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেলায়েতের প্রথম বিকাশ ও ফতুয়াত আরম্ভ

ধীরে ধীরে সাংসারিক অভাব আরো বাড়িয়া চলিল। তাঁহার আম্মাজান তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন। হজরত যে পর্ণ-কুঠিরে বাস করিতেন, উহা ছনের ছাউনি যুক্ত ছিল। অনেকদিন হয় উহার ছাউনী বদলান হইয়াছে। এখন ছাউনি বদলান নেহায়ত প্রয়োজন। হজরতের মাতা ছাহেবানীর প্রচেষ্টায় কোন মতে বাঁশ ছনের সংস্থান হইল। ঘরছাউনি দিতে লোক নিযুক্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে চারিজন লোক উপস্থিত। তাহারা দিন মজুরী "কামলা" কাজ করে। হজরতের আম্মাজান তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা আহারের সময় হইতেছে। মেহমান কর্ম্মিদের তো খাবার দিতে হইবে। যোগার তো কিছুই নাই!" হজরত যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতা ছাহেবানী পূনঃ পূনঃ খাদ্য যোগার সম্বন্ধে হজরত আকদাছের প্রতি তাগিদ দিতে লাগিলেন। হজরত মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আম্মা"। আবার পুর্ব্ববৎ ধ্যানে রত হইলেন। তাঁহার উত্তরে মনে হইল যেন এখনও অনেক সময় আছে। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা কানাকানী করিতে লাগিল। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মজদুরদিগকে উপবাসে ফেরত দিলে লোকের কাছে বড়ই নিন্দনীয় হইতে হইবে। এমনি করিয়া ঘরে বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিলে কি আল্লাহ্ ঘরে আনিয়া কি ভাত কাপড় দিবেন! কাজ কর্ম করিতে কি আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন?

এইদিকে ঘরের "কামলা" মজদুররা গোসল করিয়া খানা খাইতে আসিল। হজরত তাঁহার আম্মাজানকে বলিলেন, "আম্মাজান! মেহমানদের জন্য খানা খাওয়ার বিছানা দিতে হইবে। তাহারা খানা খাইবেন।" হজরতের

আম্মাজান চিন্তিতভাবে, নিম্নস্বরে তাঁহাকে বলিলেন যে বিছানা দিয়া কি হইবে, ঘরে যে অদ্য রন্ধনের কোন প্রকার যোগারও হয় নাই। হজরত পুনঃ বলিলেন, আম্মাজান! মেহমানদের জন্য খাওয়ার বিছানা দেওয়া হউক। আমিও আসিতেছি, এক সঙ্গে খানা খাইব। অগত্যা হজরতের আম্মাজান বিছানার ব্যবস্থা করিলেন। মেহমান ঘরে আসিল। এখনও হজরত মেহমানদের নিকট আসিতেছেন না।

খোদার কি অপূর্ব লীলা! কি অলৌকিক বিস্ময়কর ব্যবস্থা। তাঁহার প্রিয়তম মাহবুবের ঘরে মেহমান আসিবেন, তাহাদের মেহমানদারী করিতে হইবে। তাহার বিলিব্যবস্থা তিনি পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুর মেহমান তাঁহারই মেহমান। তাঁহার হাবিবের ইজ্জত তাঁহারই ইজ্জত। তাই তাঁহার উপর নির্ভরশীল সর্বোত্তম দোস্তের অতিথীর আতিথেয়তা তিনি যেন স্বহস্তেই করিতেছেন।

মেহমান ঘরে উপবিষ্ট। আহার্য্যের প্রতিক্ষায় আছে। হজরত এখনও ঘরে আসেন নাই। তাঁহার আম্মাজান ও বিবিছাহেবা লজ্জায় ও চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। বাড়ীস্থ লোকেরা হজরতের উপর একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, বিছানা না দিয়া মেহমান উপবাস ফেরত দিলে কোনমতে চলিত। এখন একেবারে ইজ্জত যায়। চারিজন লোকের ব্যবস্থা আমরাই বা হঠাৎ কি করিয়া করিব! সকলে যেন সরমে মরিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়ে দেখা গেল, একজন লোক দুইজন মুটিয়া পিছনে বাড়ীর দিকে আসিতেছে। মুটিয়াদের কান্ধে দুইভার আহারীয় সামগ্রী। তাহারা আসিয়া সামনে পুকুর ঘাটে বসিল এবং জানিতে চাহিল যে ফকীর মৌলভী ছাহেবের ঘর কোনটি? তখন হজরত হুজরার বাহিরে আসিলেন। তাহারা হজরতকে দেখিয়া অতি আনন্দে ভক্তিভরে ছালাম ও কদমবুচি করিল এবং আনিত আহার্য্য হাদিয়া তাঁহার সামনে পেশ করিয়া আরজ করিল; হুজুর স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া-ই এ সামান্য হাদিয়াটুকু আপনার জন্য আনিয়াছি। হজরত সাদরে উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে অজু করিয়া ঘরে আসিতে নির্দেশ

দিলেন। টুকরিতে বকরির কোরমা ও সরু চাউলের পোলাও। খানাগুলি যেন এইমাত্র পাকাইয়া আনা হইয়াছে। তাহারা অজু করিয়া ঘরে আসিল। এখন হজরতের ঘরে সাতজন মেহমান। হজরত সাতজন মেহমান সঙ্গে নিয়া সানন্দে আহার করিলেন। সামান্য কিছু অংশ ঘরে রাখিয়া বাকীটুকু বাড়ীর অন্যান্যদের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার অনুগ্রহ ও প্রনয় বিকাশের প্রথম প্রবাহে তাঁহার প্রিয়তম মাহবুবের ঘরে স্বর্গীয় "মান্না ছালওয়া সদৃশ" উপঢৌকন দিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে অতিথী সেবা করিলেন।

কিছুদিন পর হজরতের স্নেহময়ী জননী এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া জান্নাতবাসী হইলেন। মাতৃ বিয়োগের পর তাঁহার খোদাভক্তি আরো ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হইয়া পড়িল। তাঁহার মাতৃপ্রেম ও আকর্ষন উভয়ই কাটিয়া যেন নিজ প্রভুতে মিশিয়া রহিল। এখন হজরতের মুরব্বি-স্থানীয় আর কেহই রহিলেন না। জন্মগুরু, ধর্ম্মগুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু সকলেই প্রস্থান করিয়া মহাশক্তি আল্লাহ্ তা'লার জাতে সম্মিলিত হইলেন। সকলেই যেন সম্মিলিত ভাবে মহাপ্রভু "রাব্বোল আলামিনের" প্রতি তাঁহাকে স্বজোরে আকর্ষণ করিতেছেন।

এইদিকে হজরতের বয়সও চল্লিশ অতিবাহিত হইতে চলিল। তাঁহার একমাত্র মহাপ্রভু তাঁহাকে আর গোপনে রাখিতে রাজী নহেন।

একদা হজরত আকদাছ তাঁহার দায়েরা শরীফ হইতে আন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন; এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের উঠানে ধান্য মাড়ান হইতেছে। তিনি তাড়াতাড়ী ঘরে গিয়া বিবি সাহেবানী হইতে ধান্য নেওয়ার জন্য টুকরী চাহিলেন। বিবি ছাহেবানী তাঁহাকে টুকরী লইয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। কারণ ধান্য না দিলে বড়ই লজ্জার কথা হইবে। ধান্য দিবার তাহাদের ইচ্ছা থাকিলে ডাকিয়া বলিত। হজরত তবুও পৈতৃক এজমালী জমিনের সরুধান্য আনিতে টুকরীর জন্য সাহেবানীর নিকট পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা তিনি তাঁহাকে একখানা টুকরী দিলেন। হজরত ছাহেবানী তাহাদের স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। হজরত

ও হয়ত দিবেন না জানিয়াও স্বয়ং গিয়াছিলেন। তাহাদের টুকরীও আসিল। তাঁহার স্ব স্ব টুকরী ভরিয়া নিজ নিজ ঘরে ধান্য নিতে আরম্ভ করিলেন।
হজরত নিজ টুকরীটিও তাহাদের সামনে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু হজরতের টুকরী এখনও খালী। সরল বিশ্বাসী হজরত এখনও ধান্য আশায় বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ধান্য শেষ হইয়া গেল। তাহারা হজরতের টুকরীতে ধান্য দিলেন না। হজরতকেও হাঁ-না কোন কথা বলিলেন না। হজরত বিস্ময়ে নির্বাক চিত্তে শুধু তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহারা স্ব স্ব কুঠিরে চলিয়া গেলেন। উদার হৃদয় হজরত ইতঃপূর্বে কোনদিন চিন্তাও করতে পারেন নাই যে, সংসার কত কুটিল। সংসারী মানব যে এত স্বার্থপর। প্রেমবিহীন ভ্রাতৃত্বে যে এমনি কলুষপূর্ণ স্বার্থপরতা ও অন্যায় জড়িত রহিয়াছে স্বার্থ যে মানুষকে ন্যায় নীতি ও ভ্রাতৃস্নেহ পর্যন্ত ভুলাইয়া দিতে পারে। মানুষকে যে এমন অমানুষে পরিনত করিতে পারে! তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেন তাহারা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য তাঁহাকে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি অপ্রতিভ অবস্থায় শূন্য টুকরী হাতে লজ্জিতভাবে নিজ কুঠিরে ফিরিলেন। প্রতিবেশী মোয়াজ্জেন "শাহ্দুল্লাহ্" অট্টহাসি দিয়া নিতান্ত ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল, কিহে! আপনারা যে মৌলভী ছাহেবের টুকরীতে ধান্য দিলেন না। তাহাকে শূন্য টুকরী হাতে ঘরে যাইতে হইল নাকী! আচ্ছা ঘরে যাইয়া তিনি কি বলিলেন? হজরতের বিবি ছাহেবানী অতি অভিমান বসতঃ ও লজ্জিতভাবে বলিলেন, কেন তিনি বারণ না শুনিয়া অপদস্ত হইবার জন্য টুকরী লইয়া গেলেন। তাহারা যে এখন উপহাস করিতেছে। হযরত মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আমিতো আমার ন্যায্য প্রাপ্য আনিতে গিয়াছিলাম। তাহারা যে কেন দিল না, আমিতো জানিনা, আল্লাহ্ চায়তো অনেক ধান্য আসিবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ ধ্যানে বসিয়া গেলেন।
এই ঘটনার দুই দিন পর মাইজভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী আনর আলী সিকদার, গামরীতলা নিবাসী মুন্সী মিঞাজান এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট লোক প্রায় পঞ্চাশ আড়ী অতি উৎকৃষ্ট সরু ধান্য ও নানা প্রকার উপঢৌকন হাদিয়া

লইয়া হজরতের দরবারে আসেন। এইদিন হইতে বহু হাদিয়া সামগ্রী নিত্য হযরতের খেদমতে আসিতে লাগিল। প্রতিদিন হাজতি, মকছুদি ফরিয়াদি লোকজন হজরত সমীপে ভীড় জমাইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল কলাদুগ্ধ চাউল, মোরগ, মৎস্য, কোরমা পোলাও ইত্যাদি আসিয়া তাঁহার ঘর পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

দানবীর হজরত আকদাছ এই সমস্ত হাদিয়া দ্রব্যাদির যৎসামান্য রাখিয়া বাকী সমস্তই বাড়ী ও প্রতিবেশীর প্রতি বিলাইয়া দিতে লাগিলেন। এমনকি কোন কোন সময় সমস্ত গরীব দুঃখীদের জন্য দান করিয়া দিতেন। এবং সময়ে সময়ে বন্ধু ও আত্মীয় দুঃস্থদের জন্য লোক মারফত পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার দরবারে বহু গরীব দুঃখী ও উপঢৌকন লোভীদের ভীড় জমিয়া যাইত। হজরতের নিকট যে যাহা চাইত অকাতরে দান করিয়া দিতেন। হজরত সোলায়মান (আঃ) যেমন অনাথ দীনদরিদ্রের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য মহাসম্রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাম্রাজ্যের প্রার্থী হইয়াছিলেন, তেমনি হজরত আকদাছ ও দীনদরিদ্র অনাথের জন্য দোজাহানীয় দুঃখ বারণে দোজাহানের সাম্রাজ্য প্রত্যাশী হইয়াছিলেন। তাহাদের সৌভাগ্যেই পরম দয়াময় হজরতকে অক্ষয় অসীম সাম্রাজ্যের অধিপতি করিয়া অদ্বিতীয় ক্ষমতায় বিশ্বজীবের দুঃখহারি মহাত্রাণকর্ত্তা হিসাবে শেষকালে এই বিশ্বে পাঠাইয়াছেন। বিশ্বকৌশলি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার প্রেমের দ্বিতীয় লহরীতে এমনি করিয়া তাঁহার প্রিয়তম মাহবুব ভাণ্ডারের মালিক আউলিয়াদের শাহানশাহ্, ছুফী মোত্তকী সাধক ও মোজাহেদ বাহিনীর অগ্রনায়ক হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) কে আর গোপনে থাকিতে না দিয়া ভবে প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতিয়মান করাইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হজরতের আলেম সমাজে পরিচিতি ও অলৌকিক কেরামতাবলী

দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা এবং খোদাদাদ অপূর্ব গুণজ্ঞানের মহিমা সূর্য্যরশ্মির মত জগতে ছড়াইয়া পড়িল। মানব দানব, জ্বীনপরী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান আবালবৃদ্ধ বনিতা তাঁহার পবিত্র দরবারে হাজির হইতে লাগিল। জীবজন্তু পর্যন্ত যেন তাঁহার অনুগামী ও দাসত্ব বরণ করিয়া লইল। সবাই যেন নিজ নিজ আশা আকাঙ্খা পূরণ মানসে তাঁহার দরবার পানে ছুটিয়া চলিল। সবারই মুখে একই প্রচার, একই যশোকির্ত্তন, দিগ্বিদ্বিক ঘোষিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার "কশ্‌ফ কেরামত" বাক্য সিদ্ধি অলৌকিক ক্ষমতার যশোগান দেশদেশান্তরে তড়িৎবত ছড়াইয়া পড়িল। ফলে জনসমাগম এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহার বাড়ীঘরে স্থান সঙ্কুলানে কষ্টকর হইয়া পড়িল। হাদিয়া সওগাত, টাকা পয়সা এত অধিক পরিমাণে আসিতে লাগিল যে তাহা সামলান কষ্টকর হইয়া পড়িল। হজরতের বাড়ীঘরে হাট বাজারের মত জনসমাবেশ হইতে লাগিল। এমনকি হজরত আকদাছ যথায় গমন করিতেন তথায় বিপুল জনতায় পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতেন। হজরত কোনদিকে চলিলে পিছনে জনস্রোত বহিতে থাকিত। অগণিত গরীব মিছকিন ও অর্থলোভীরা তাঁহার খেদমতে আনিত হাদিয়া ও টাকা পয়সার আশায় তাঁহার বাড়ীর আশে পাশে, রাস্তাঘাটে সর্বদা প্রতিক্ষায় থাকিত। হজরত যাহাকে সামনে পাইতেন; যে যাহা চাহিত মুক্ত হস্তে অকাতরে বিলাইয়া দিতেন।

এখন হজরতের পরিবারে আর অভাব অনটন নাই। আছে মাত্র অতিথীসৎকার ও “ছায়েল” প্রার্থীদের প্রতি আশাতীত দান। এমনকি অভাব ও দারিদ্রতা যেন হজরতের প্রতিবেশী দীনদুঃখীদের নিকট হইতেও চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। এই নবনিত্য বিপুল জন সমাগমে হজরত তাঁহার আচার আলাপনে, ভাবভঙ্গিতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে, তাঁহার বেলায়েতে আস্থা স্থাপনে ঐশ্বরিক অনুগ্রহকনা ও ফয়েজ বরকত অর্জন করিয়া স্ব-স্ব আশা পূরনে আত্মা আলোকিত করিতে লাগিল। যেই বা তাঁহার খেদমতে একবার উপস্থিত হইত, কামনা তো পূরন হইতোই তদুপরি পাত্র অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক সুনজরের শিকার না হইয়া পারিত না। প্রত্যেকের অন্তরের সহিত তাহার পবিত্র নূরাণী-অন্তর যেন মিশাইয়া দিতেন। প্রত্যেকের আত্মার উপর তাঁহার পবিত্র আত্মার করুণাস্রোত যেন প্রবাহিত করিয়া দিতেন। তাই এই অভিনব – জনসমাবেশে প্রত্যেকের অন্তরে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ঘুমে বা চেতনে কোন না কোন অলৌকিক ক্রিয়া হইয়া থাকিত। কাজেই জাতী ধর্ম নির্বিশেষে সবাই তাঁহার ভক্ত অনুরক্ত ও আসক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ অনুগামী ও অনুসারী হইতে লাগিল। এইভাবে তিনি জগতবাসীর বাহ্যিক উপকার ও আভ্যন্তরিণ খোদাপ্রেম সুধা বরিষনে তাহাদের অন্তরে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিলেন।

এইদিকে তাঁহার আধ্যাত্মিক হেদায়েত অভিযান দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। অপর দিকে নির্জ্জিব ধর্মপ্রাণহীন বেশ ও পেশাধারী তথাকথিত আলেমগণ এবং কিছুসংখ্যক আধ্যাত্মিক প্রাণহারা ক্ষুদ্রজ্ঞানী মৌলভীর দল তাঁহার প্রেমরহস্য ও ভাবধারা বুঝিতে না পারিয়া কেহবা জাতী হিংসায় নানা প্রকার অপপ্রচারে তাঁহার হেদায়েত অভিযানে বাধার অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিল। নবী করিম (দঃ) কে যেমন অবিশ্বাসীগণ “কাহেন” বা যাদুকর পাগল ইত্যাদি অপবাদে অভিহিত করিয়াছিল, তেমনিভাবে হজরত আকদাছকেও বেলায়েতে অবিশ্বাসী স্বল্পগুণী লোকেরা কেহ অপবাদ দিল

"আমেলে ছিফলি", আর কেহ অপবাদ ছিল "তদখিরে খালকের" আমলকারী বা সাধক বলিয়া। যদিও তাহারা নানাভাবে নানা অপচেষ্টায় জনগতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তবুও তাহা হজরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতারূপ মুক্ত তরবারীর সামনে নেহায়েত তৃণবৎ প্রতিবন্ধক ছিল।

হজরত গাউছে আজম পীরাণে-পীর-দস্তগীর মহিউদ্দিন ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) সমীপে যেমন ধর্ম্মমতবাদী আলেমগণ দলে দলে তর্কযুদ্ধে আসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও খোদাদাদ শক্তির কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ও দাসত্ব বরণে চির অনুসারী হইয়াছিল, তদ্রুপ হজরত আকদাছের সকাশেও অবিশ্বাসী আলেমগণ দলে দলে আসিয়া বিভিন্ন সুত্রে নানা কৌশলে হজরতের ঐশ্বরিক বেলায়েতী প্রেরণা শক্তির সামনে মাথা নত ও শিষ্যত্ব গ্রহণে চির আসক্ত দাস শ্রেণীতে গণ্য হইতে লাগিল। বহু দূরদেশ হইতে তৃষ্ণার্ত্ত সাধককুল এবং আমীর ওমরাহগণ অসীমবিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তাঁহার বেলায়েতী সুধা পান করার মানসে দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

হজরতের প্রভাবে বিপরীত দ্রব্যে রোগ মুক্তি

এই সময় মাইজভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী জনাব কাজি মৌলভী গোলাম কাদের ছাহেবের দুইপুত্র ছিলেন। একজন আলহাজ্ব কাজি মৌলভী আবদুল আজিজ ও অন্যজন ডাক্তার কাজী মৌলভী খলিলুর রহমান ছাহেব। ছেলেবেলায় তাহারা জ্বর ও নানাবিধ অসুখে ভীষণভাবে ভুগিতেছিলেন। বহু সুদক্ষ ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্য না হওয়ায়, তাহাদের পিতা-মাতা একেবারে হতাস হইয়া পড়েন। তাহারা ভাবিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ছেলেদের ন্যায় এরাও বোধ হয় ইহ সংসারে বেশী দিন থাকিবে না। তাহারা হজরত ছাহেব কেবলার অনেক কেরামতি অলৌকিক দৃষ্টান্তের কথা শুনিয়া থাকিতেন। কিন্তু বড় বিশ্বাস করিতেন না। সেকালে হজরত ছাহেব "ফকির মৌলভী ছাহেব" নামে সুপরিচিত হইতেছেন মাত্র। কাজি ছাহেবের বিবি একদিন নিরুপায়

হইয়া কাজি ছাহেবের নিকট অনুরোধ করিলেন, "অনেক চেষ্টা তদ্বির তো করিলাম কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তো কোন সুফল দিলেন না। ছেলেগুলি কি এমনিভাবে মারা যাইবে! লোকে বলে আল্লাহ্ তা'লার ফকিরেরা খোদার কলম পর্য্যন্ত রদ করিতে পারেন। এমন কি মৃত্যুকালে নাকি আজরাইলকে পর্যন্ত ফেরত দিয়া হায়াত বৃদ্ধি করিতে পারেন। মৃত পর্যন্ত জিন্দা করিতে পারেন। আমার বিশ্বাস—আপনি ছেলেদ্বয়কে ফকীর মৌলভী ছাহেবের নিকট নিয়া দোয়া করাইলে আল্লাহ্ নিশ্চয় দয়া করিয়া রোগ মুক্তি ও হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।" কাজি ছাহেব উত্তর করিলেন, "বড়পীর জিলানী (রঃ) ছাহেবের মত ফকীর বর্তমান যুগে আর নাই। প্রায় সকলেই নানা পদ্ধতীতে আমল করিয়া এক একটি জীবিকা নির্বাহক উপায় স্থির করিয়াছেন মাত্র। এত ঔষধ পত্রে যদি আল্লাহ্ ভাল না করেন ফকীর মৌলভী কি করিবেন। আল্লার যাহা মর্জ্জি তাহা হইবে। আমাদের ভাগ্যে যদি ছেলে না থাকে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।" ইহাতে বিবি ছাহেবা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, কাহাকেও মাইজভাণ্ডারে যাইতে পাইলে ছেলেদ্বয়কে গোপনে তথায় তাঁহার দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। যাহা হউক একদিন সুযোগ ঘটিল। একজন প্রতিবেশী হজরতের দরবারে আসিতেছে জানিয়া ছেলেদ্বয়কে গোপনে হজরতের খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার ছেলেদ্বয়কে বহুদিন যাবত আম খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আম টকে তাহাদের রোগবৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ ছিল। এই ভয়ে ছেলেরা আম খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। ছেলেদ্বয় হজরতের সামনে উপস্থিত হইয়া ছালাম করিতেই হজরত তাহাদিগকে তাঁহার সামনে ডাকিয়া বসাইলেন। এবং অতি স্নেহের সহিত আম 'তবার্রোক' খাইতে দিলেন। ছেলেরা আম খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল! বলিল যে আম খাইলে তাহাদের অসুখ বাড়িয়া যাইবে। আম খাওয়া তাহাদের নিষেধ। হজরত বলিলেন, "না না এইগুলি যে তোমাদের ঔষধ। এই আম খাইলে তোমাদের রোগ চলিয়া যাইবে।" ইহা শুনিয়া ছেলেদ্বয় আনন্দের সহিত আম খাইয়া নিল। তৎপর বিদায়ান্তে বাড়ীতে আসিয়া মাতাজানকে সমস্তই বলিল। তাহাদের মাতা মনে মনে ভয়

পাইলেন। না জানি কি হয়। এই সমস্ত তাহাদের বাবাকে বলিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু দেখা গেল, ছেলেদ্বয় দিন দিন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কয়েক দিনের মধ্যে ছেলেদ্বয় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাস্থ্যেরও পরিবর্তন হইয়া উঠিল। তাহাদের পিতা কাজি ছাহেব মনে করিতেছেন ডাক্তারের ঔষধে ছেলেরা আরোগ্য লাভ করিতেছে। কিন্তু কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে ডাক্তারের ঔষধ অনেক দিন হইতে বন্ধ। বাড়ী আসিয়া ছেলের মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ছেলের চিকিৎসা করিতেছে! ছেলের মাতা উত্তরে বলিলেন, "ডাক্তার ফকীর মৌলভী ছাহেব এবং ঔষধ হইল আম।" তিনি বিস্মিত হইয়া কথার তাৎপর্য্য জানিতে চাহিলে, বিবি ছাহেবা অকপটে সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। কাজি ছাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়া খোদার দরবারে শোকরিয়া আদায় করিলেন। এবং হজরতের বেলায়েত ও কেরামতে আস্থা স্থাপন করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি হজরতের দরবারে যাওয়া আসা আরম্ভ করেন। তিনি নানা স্থানে হজরতের এই কেরামত বর্ণনা করিতেন। তিনি বলিতেন অলি আল্লার সুনজরে বিষও মধু হয় এবং কুপথ্যও ঔষধ হয়।

হজরতের অন্তর্দৃষ্টি ও কশ্‌ফ ক্ষমতার পরিচয়

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নানুপুর নিবাসী মোহাদ্দেছ মৌলানা আবদুল আলী ছাহেব হজরতের সমসাময়িক অতি প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি হজরতের বেলায়েত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। বরং আমলিয়ত ও সাধারণ সাধনা বলিয়া ধারনা পোষণ করিতেন।

একদা তিনি হালুয়া তৈয়ার করিবার মানসে মেওয়া ফল সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহার সুপরিচিত বাল্যবন্ধু হজরত ফকীর মৌলভী ছাহেবের খেদমতে ছেলেকে পাঠাইবেন মনস্থ করিলেন। কারণ তিনি জানিতেন; তাঁহার নিকট অনেক মেওয়া ফল আগত ব্যক্তিরা আনিয়া থাকে সেখানে হয়ত কিছু ফল পাওয়া সম্ভব হইবে। একদিন তাহার বড় ছেলে মৌলভী মোহাম্মদ ছাহেবকে একটি টাকা ও একখানা রুমাল হাতে হজরতের

বাড়ীতে পাঠাইলেন। এবং বলিয়া দিলেন, "তুমি এই টাকাটি তাঁহার ছেলে ছৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেবের হাতে দিয়া বলিও, আমার কতেক মেওয়া ফলের একান্ত দরকার। কোথাও সংগ্রহ করিতে পারিতেছিনা। তাই আমি কিছু মেওয়া চাহিতেছি। যে কয়েকটি পাও নিয়া আসিও। সবগুলি হয়তো পাওয়া সম্ভব হইবেনা। কারণ আমার অনেক ফলের দরকার আছে।" তিনি কত পরিমাণ ও কি কি ফলের দরকার কিছু উল্লেখ করেন নাই। পিতার আদেশ মত উক্ত মৌলবী ছাহেব হজরতের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হজরতের ছেলে জনাব ছৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেবকে সমস্ত কথা বলিয়া টাকা ও রুমাল দিতে চাহিলেন। তিনি ফল যত দরকার দিতে রাজী হইলেন কিন্তু টাকা গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না। কিন্তু মৌলবী ছাহেব টাকা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তখন হজরত আন্দর বাড়ীর আন্দর হুজুরায় উপবিষ্ট ছিলেন। হজরত তাঁহার ছেলে জনাব ছৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোহাদ্দেছ ছাহেবের ছেলেকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন।" তাহাকে আন্দর বাড়ীতে পাঠান হইল। তিনি যাইয়া ছালাম করিতেই হজরত রুমালখানা চাহিয়া নিলেন। কিন্তু টাকা নিলেন না। হজরত মেওয়ার টুকরীসমূহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া অনেক প্রকার ফল রুমালে বাঁধিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "যান বাবা! এইগুলি আপনার বাবাকে দিয়া বলিবেন যে, তাঁহার নোছখা অনুযায়ী এখানে সমস্ত ফলই দেওয়া হইয়াছে। কোন অসুবিধা হইবেনা। পথে খুলিবেন না।" মৌলভী মোহাম্মদ ছাহেব রূমালের গাটুরীটি লইয়া ছালাম প্রদানে বিদায় হইলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তাহাকে তো নোছখার কথা কিছুই বলা হয় নাই। কি করিয়া তিনি নোছখা অনুযায়ী কি কি ফল এবং পরিমাণ ঠিক করিয়া দিলেন। যাহা হউক বাড়ীতে নিয়া খুলিলেই তাঁহার কেরামত ও সত্যতা বুঝা যাইবে। তিনি বাড়ী পৌঁছিয়া ফলের গাটুরী ও টাকাটি তাহার পিতার হাতে দিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তাহার বাবা মোহাদ্দেছ ছাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমিতো আমার নোছখার কথা তোমাকেও বলি নাই। তিনি কি করিয়া আমার নোছখার পরিমাণ ও কি কি ফল দরকার তাহা

বলিবেন।” ইহা বলিতে বলিতে তিনি ফলের পুটলীটি খুলিলেন। খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তাহার নোছখায় লিখিত সমস্ত ফল তাহার মধ্যে আছে এবং নিক্তি লইয়া ওজন করিয়া দেখিলেন, তাহার নোছখার লিখিত মতে সমস্ত ফলের ওজন যথাযথভাবে দেওয়া হইয়াছে। মোহাদ্দেছ ছাহেব অবাক বিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন, “আমার ভুল আজই ভাঙ্গিল। তিনি সহজ লোক নন। তিনি নিশ্চয় একজন ছাহেবে “কশ্‌ফ” অন্তর্চক্ষুধারী প্রকৃত অলিআল্লাহ্। তাহা না হইলে কি করিয়া তিনি আমার নোছখায় বর্ণিত এতগুলি ফল যথা পরিমাণে ও সংখ্যায় দিতে সক্ষম হইলেন। কি করিয়া তিনি উহার খবর রাখিলেন।” সেইদিন হইতে হজরতের বেলায়েতে তাহার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিয়া গেল। এবং হজরতের খেদমতে আসিয়া ফয়েজ গ্রহণে তাঁহার ভক্তদের মধ্যে গণ্য হইয়া গেলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, হজরতের এই অপূর্ব কশ্‌ফ কেরামতের কথা ভুলেন নাই। তিনি ও তাঁহার ছেলে মৌং মোহাম্মদ ছাহেব যথায় যাইতেন, হজরতের এই অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিতেন।

(ক) হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহছনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও মোদার্রেছ নিযুক্ত

একদা জনাব শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ মছিহুল্লাহ্ মির্জাপুরী ছাহেব “ছোবহ্ ছাদেকের” পূর্বে তাহাজ্জদ নামায পড়িবার নিয়তে চট্টগ্রাম শহরস্থিত কাতালগঞ্জের মৌলবী বশীর উল্লাহ্ ছাহেবের মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কেবলমাত্র একজন লোক মসজিদে মোরাকবা অবস্থায় আপাদমস্তক কাপড় আচ্ছাদনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে তাঁহার পীর ভাই মুছা মিঞা মনে করিয়া উপহাসছলে বলিলেন, “দিনের বেলায় সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকিয়া শুধু রাত্রিকালে এইভাবে ফকিরী দেখানো কি শোভা পায়! মুখ ঢাকিয়া ফকিরী করিলে কি ফকিরী বেশী হাছেল হয়?” এইভাবে তিনবার বলার পরও কোন উত্তর না পাইয়া আবদার সহকারে স্বজোরে মুখ হইতে কাপড়খানি টানিয়া সরাইতেই দেখিলেন, তিনি তাঁহার

কল্পিত মুছা মিঞা নন। তিনি মাইজভাণ্ডারী জনাব হজরত আকদছই। মোরাকবায় তিনি বিভোর এবং নয়ন যুগল তাঁহার লোহিত বর্ণ। হজরতের সাথে বেয়াদবী হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ভয় ও লজ্জায় জড়সর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। হজরত আকদাছ তাঁহার ভুল ও কাতরতা বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন, "ছৈয়দ ছাহেব নাকি! ভাই ছাহেব! আমি নাছরাগণকে কালেকটারী পাহাড় হইতে নামাইয়া দিলাম তথায় এক কুরছি আপনাকে; এক কুরছি মৌলভী খোদা নাওয়াজ ছাহেবকে, এক কুরছি মৌলভী জুলফিকার আলী ছাহেবকে এবং আর এক কুরছি ছুফি আবদুল অদুদ ছাহেবকে প্রদান করিলাম।" মৌলানা ছৈয়দ মছিহুল্লাহ ছাহেব হজরতের এই পবিত্র ভবিষ্যতবাণী এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার আভ্যন্তরিণ প্রভাবের তাৎপর্য্য মর্মরহস্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। প্রায় আট বৎসরকাল পর কোর্টকাছারী উক্ত পাহাড় হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বর্তমান কাছারী পাহাড়ে চলিয়া যায়। এবং তথায় মোহছনিয়া মাদ্রাসার পত্তন হয়। হজরতের ভবিষ্যতবাণীতে বর্ণিত মতে উক্ত মৌলভী ছাহেবগণ এই মাদ্রাসায় প্রথম মোদার্রছ নিযুক্ত হন। তখন তিনি হজরতের ভবিষ্যতবাণীর প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া তাঁহার কালাম ও প্রভাব রহস্য বুঝিতে পারিলেন। এইভাবে হজরতের ইঙ্গিতে ও প্রভাবে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথমে ইছলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইল।

(খ) হজরতের কশফ ক্ষমতায় হাটহাজারী মাদ্রাসার স্থান নির্ধারণ

হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুকাল পূর্বে একদা ছায়ের করিতে করিতে হজরত আকদাছ হাটহাজারী উপস্থিত হন। বর্তমান প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নিকটবর্তীস্থানে পৌঁছিয়াই বলিতে লাগিলেন, "এহাঁ কোরান আওর হাদিছ কি বো নেকাল রাহী হ্যায়"। অতপর তিনি উক্তস্থানের চতুষ্পার্শ্বে হাটিয়া উহার সীমা নির্ধারণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার এই পবিত্র ভবিষ্যত বার্তার রহস্য ও তাঁহার আচরণের সারমর্ম কেহ উপলব্ধি করিতে

পারেন নাই। বহুকাল পর উক্তস্থানে ঐ নির্ধারিত সীমাতেই হাটহাজারী মাদ্রাসার পত্তন হয়। তখনই উপস্থিত লোকগণ তাঁহার পবিত্র ভবিষ্যত বানীর গুরুত্ত্ব ও স্থান নির্দেশের মাহাত্য বুঝিতে পারেন। হজরত যে অসাধারণ কশ্‌ফ কেরামত শক্তি রাখিতেন, উহা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অভিহিত হইলেন। তাই "নাদওয়াতুল মোকাল্লেফিন" নামক কেতাবের চতুর্থ খণ্ডে মৌলানা নজির আহমদ ছাহেব হজরতের কশ্‌ফ কেরামত সম্পর্কে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে তাঁহার প্রভাবে বাংলাদেশে বহু মাদ্রাসা, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

(গ) হজরতের প্রভাবে আহমদীয়া (জামেয়া মিল্লিয়া) মাদ্রাসা ও মসজিদের স্থান নির্দেশ ও পত্তন

বর্তমানে তাঁহার পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত নাজিরহাট এলাকাস্থিত আহমদীয়া জামেয়া মিল্লিয়া মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন মসজিদ তাঁহারই পূর্ব ভবিষ্যতবাণী ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফল। উক্তস্থানে একটি বড় বটবৃক্ষ ছিল। হজরত ছাহেব কেবলা "ছায়ের" কালে প্রায় সময় তথায় গাছ তলায় বসিতেন। একদা তিনি বটগাছের গায়ে পবিত্র কোরানের পাতা লটকাইয়া দিয়াছিলেন। এবং কালামে উক্ত মাদ্রাসা ও মসজিদের স্থানের প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিতেন "এখানে আমার ছয়টি কেতাব আছে" তোমরা পড়িও। ফলে বহুদিন পর উক্ত নির্দেশিত স্থানে হজরতের নামে এই মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে দেশবাসী হযরতের আচরণ ও কালাম রহস্য অনুভব করিতে সক্ষম হন।

হজরতের প্রভাবে সাগর ডুবি হইতে সামগ্রীসহ ভক্ত উদ্ধার

মৌলভী রহিম উল্লাহ্ নামক হজরতের এক প্রতিবেশী আকিয়াব সহরে ওয়ায়েজ নছিহত ও হেদায়েত কার্য্য করিতেন। তিনি নিতান্ত দীনদার ছুফী মূত্তকী ছিলেন। একদিন তিনি তথায় কোন এক বাড়ীতে ওয়ায়েজ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন আলেম বেশধারী লোক ভিখারী বেশে

বাড়ীওয়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা জানাইলে বাড়ীওয়ালা তাহাদিগকে একখানা সিকি পয়সা দান করেন। ইহাতে তাহারা আরো বেশীর প্রত্যাশায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, বাড়ীর মালিক অকথ্য ভাষায় তাহাদিগকে যথেষ্ট মন্দ বলেন। তবুও তাহারা চলিয়া না যাওয়ায় উক্ত মৌলভী ছাহেব বাড়ীর মালিককে তাহাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার না করিতে বারণ ও উপদেশ দেন। বাড়ীর মালিক তাহাদিগকে আরো একসের চাউল আনিয়া দেন। অতপর তাহারা চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়া মৌলভী ছাহেব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, অভাবে লোকের দ্বারস্থ হইলে, তাহার কোন ইজ্জত ও মানবতা থাকেনা। অভাব মানবকে অতি হীন প্রকৃতির করিয়া দেয়। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন অভাব মোচনার্থে অর্থ উপার্জনে মানুষের দ্বারস্থ হইয়া আর হেদায়েত কার্য্যও করিবেন না। হেদায়েতকারী মৌলভী হইলেও মানুষ নিশ্চয় হেয় মনে করে। অন্তরের সহিত ইজ্জত করেনা। তিনি স্থির করিলেন চাকুরী করিবেন। এখন তিনি চাকুরীর সন্ধানে আছেন। একদিন শুনিতে পাইলেন তথায় হাসপাতালে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিতেছে। তিনি তথায় গেলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উপযুক্ত লোক দেখিয়া নার্সিং কার্য্যে ভর্তি করিয়া লইলেন। তিনি বাসায় আসিয়া স্বদেশী বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চাকুরীর খবর প্রকাশ করিলেন। তাহারা সকলে তাহার চাকুরীর সংবাদে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। তাহারা বলিলেন যে, তাহার মত একজন লোকের পক্ষে হাসপাতালে নার্সিং এর কাজ করিলে ইজ্জতের ক্ষতি হইবে।

এই চাকুরী না করিয়া বরং ব্যবসা করিলে অনেক ভাল হইবে। তিনি অর্থাভাবের কথা প্রকাশ করিলে, তাহাদের মধ্যে একজন ধনী লোক যত টাকার দরকার দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এবং উপদেশ দিলেন যে, মরিচের ব্যবসা করিলে ভাল হইবে, কারণ মরিচের চাহিদা এবং বাজার এক প্রকার ভাল দেখা যাইতেছে। তিনি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিলেন। তিনি চাকুরীতে যোগ না দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। সর্বপ্রথম একহাজার টাকার মরিচ চালান দিলেন। ইহাতে তাহার পাঁচশত টাকার উর্ধে লাভ

হইল। এই সংবাদে অর্থ সাহায্যকারী বন্ধু ও অন্যান্যরা খুব খুশী হইলেন। বাজারের অবস্থা বুঝিয়া এইবার তিনি অরো কিছু টাকা লইলেন। এইবার দুই হাজার টাকার মরিচ ক্রয় করিয়া নৌকাযোগে আকিয়াব সহরের প্রতি রওয়ানা হইলেন। গ্রাম্য বাজার হইতে মরিচ ক্রয় করিতেন। আকিয়াব সহর হইতে উহা অনেক দূর। নৌকাপথে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর রাত হইয়া গেল। বেশী রাত্রে নৌকাপথে অসুবিধা হইবে মনে করিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিলেন। এবং মাঝিগণ সহ ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রে মৌলভী ছাহেব স্বপ্নে দেখেন যে, কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "মৌলভী ছাহেব সাবধান হউন! বিপদ অতি নিকটে।" তিনি কম্পিত হৃদয়ে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন আকাশের প্রতি তাকাইলেন; দেখিলেন ঘনকৃষ্ণ মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাইতেছে। তিনি মাঝি মাল্লাদের তাড়াতাড়ি ডাকিয়া তুলিলেন। তাহারা নৌকা ও মাল রক্ষায় চেষ্টিত হইল। আর তিনি বিপদ বারণ খোদাতা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় রত হইলেন। ভীষণভাবে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সবাই নৌকার আশা ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চক্ষের পলকে তাহার নৌকা সাগর গর্ভে বিলিন হইয়া গেল। মাঝি মাল্লারা কে কোন দিকে গেল তাহার ঠিকানা রহিলনা। তিনি তুফানের প্রবল বেগে বৃষ্টিপূর্ণ তরঙ্গের সাথে প্রাণরক্ষা অভিযানে মত্ত হইয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছিয়া গেলেন। তিনি তখনও অচেতন হন নাই। এই হেন সঙ্কটময় অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে সৌভাগ্য তারা উদিত হইল। তিনি তাহার পীর ভাই স্বদেশী ফকীর মৌলভী ছাহেবের কথা স্মরণ করিলেন। তিনি সাহায্য প্রার্থনায় নিয়ত করিলেন; যদি আল্লাহ্ এবার প্রাণে রক্ষা করেন। নিশ্চয় ফকির মৌলভী ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইবেন। অসীম ক্ষমতাশালী দয়ালু হজরত, স্মরণের সাথে সাথে তাঁহার স্মরণকারী পীর ভাইকে এই মহা সঙ্কট হইতে রক্ষা না করিয়া পারিলেন না। তিনি সাগর বক্ষে তাঁহার শুভ প্রভাব বিস্তার করিলেন। এইদিকে মৌলভী ছাহেব দেখিতে পাইলেন একখানা নূরাণী জ্যোতী অতি ক্ষিপ্ত বেগে তাঁহার দিকে আসিতেছে। চক্ষের

পলকে দেখিতে পাইলেন। জ্যোতিস্ময় হজরত তাঁহার ডানবাহু এবং তাঁহার পীর হজরত শেখ মোহাম্মদ ছালেহ্ লাহোরী কাদেরী ছাহেব তাঁহার বাম বাহু ধরিয়া তাহাকে সাগর জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া সমুদ্র তীরে এক বৃক্ষতলে রাখিয়া শরীরের উপর তাহাদের পবিত্র হস্ত ফিরাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে হজরত তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়া উভয়ে এক সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি কাতর ও উলঙ্গ অবস্থায় তথায় পড়িয়া রহিলেন। ভোর হইলে সেখানকার একজন লোক তাহাকে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে দেখিয়া কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এক বাড়ীতে নিয়া সেবা যত্ন দ্বারা সুস্থ করেন। যতসামান্য পানাহারের পর তিনি ঘটনা বিবৃতি করিলেন। তাহার মন অস্থির। এতগুলি পরের টাকা! ধীরে ধীরে তিনি নদী পারে আসিলেন। মাঝিগণের কোন সন্ধান পাইলেন না। কিছুদূর গমনের পর নৌকাখানীকে ভগ্নাবস্থায় পতিত দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন মরিচগুলি একস্থানে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে জমায়েত হইয়া ভিজা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নৌকা ডুবির সংবাদ পাইয়া সন্ধান করিতে করিতে তাহার বন্ধুরাও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলের সাহায্যে মরিচগুলি শুকাইয়া পূনঃ নৌকা বোঝাই করিলেন। এবং আকিয়াব সহরে নিয়া বিক্রয় করিয়া দেখিলেন, মাত্র পঞ্চাশ টাকা তাহার আসল টাকা হইতে ঘাটতি হইয়াছে। ইহাতে তিনি গাউছে খোদা হজরত ছাহেব কেবলার অপূর্ব কেরামত ও দয়া স্মরণ করিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লার শোকরিয়া আদায় করিলেন। এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের কাছে সমুদ্র বক্ষের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি ধনীকে সমস্ত মূলধন ফেরত দিয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। বাড়ী আসার পরদিন হজরত ছাহেব কেবলার খেদমতে হাজির হইয়া কদমবুচি করিতেই হজরত নিম্ন বর্ণিত এই ফারসী কসিদাটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন–

বদরিয়া দর মোনাফা বেশুমার আস্ত।
আগর খাহী ছালামত বরকেনার আস্ত।।

"সাগর গর্ভে বাণিজ্যে বা মুক্তা আহরণে অপরিমিত লাভ আছে। কিন্তু বিপদ আপদের আশঙ্কাও যথেষ্ট রহিয়াছে। যদি নিরাপদে থাকিতে চায়, তবে স্থলভাগই শান্তিময় নিরাপদ স্থান।" ইহাতে মৌলভী রহিম উল্লাহ্ ছাহেব আরো দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত তাহার ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। এবং তাঁহারই কেরামতী তাছার্রোফে সাগর গর্ভের সঙ্কট হইতে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন।
একদা তাহার পীর ছাহেব বিদায় কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে "তুমি আমার কাছে আর না আসিলে চলিবে। তুমি মাইজভাণ্ডারী শাহ্ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ ছাহেবের খেদমতে যাইয়া তাঁহার সাহচর্য্য ও ছোহবত গ্রহণ করিও"। এতদিন পর তিনি তাহার পীর ছাহেবের পবিত্র বাণীর রহস্য বুঝিতে পারিলেন।

আনার প্রদানে হজরতের আশ্চর্য্য কেরামত

নানুপুর নিবাসী জনাব মৌলভী আজিমুদ্দিন ছাহেব ফরহাদাবাদ মাদ্রাসায় পড়াইতেন। বন্ধ উপলক্ষে বাড়ীতে আসিলে কিফায়েত নগর এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহার দাওয়াত হয়। সেখান হইতে হজরত ছাহেবের বাড়ীর পার্শ্বস্ত রাস্তা দিয়া মাদ্রাসায় যাইতেছিলেন তখন হজরত ছাহেব পুকুরের ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হজরতকে দেখিয়া ছাতা আড়াল দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, যাহাতে হজরত তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারেন। কারণ তিনি হজরতের পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় হইতেন। তিনি হজরতের বেলায়তকে পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না বরং আমেলিয়ত সাধনা বলিয়া ধারনা পোষণ করিতেন। হজরত আকদাছকে পাশ কাটিয়া যাইতেই হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মৌলভী ছাহেব! একটু এই দিকে আসুন তো!" অগত্যা লজ্জায় পড়িয়া তিনি হজরতের সামনে আসিলেন। তিনি হজরত সমীপে আসিয়া ছালাম করিতেই যেন তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া কলব জারী হইয়া গেল। তাহার হৃদয় যেন ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেল। তিনি অতিশয় নম্র ও বিনয় সহকারে তাঁহার

সামনে বসিয়া গেলেন। জনাব হজরত ছাহেব বলিলেন, "আপনি মৌলভী আবদুল করিম ছাহেবের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইবেন?" তিনি উত্তর করিলেন, হ্যাঁ হুজুর। তাঁহার হাতে একটী বড় আনার দিয়া বলিলেন, "এই আনারটি তাহাকে দিবেন এবং বলিবেন, আনারটির অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে। ইহাকে যেন লেপ ঢাকা দিয়া রাখিয়া দেন।" অতঃপর হজরত তাহাদের কল্পিত ও বর্ণিত কতেক পূর্ব আলাপ অবিকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হজরত আরো বলিলেন, "ভাই ছাহেব! আমলি সাধকের সাক্ষাতে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা ভাল নহে। আপনি চলিয়া যান। মাদ্রাসার সময় হইতেছে।" মৌলভী আবদুল করিম ছাহেব হজরতের পরিচিত একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। সময় সময় তাহারা উভয়ের মধ্যে হজরতের বেলায়েত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইত। মৌলভী আজিমুদ্দীন ছাহেব বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমরা ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছি। হজরত সহজ অলি নহেন। আমাদের ধারণা ও আলাপ আলোচনা সম্বন্ধে হজরত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। আমরা কি কি আলোচনা করিয়াছি তাহাও বলিয়া দিলেন। তিনি হজরতের সামনে বসাকালিন অবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিলেন। আনারের জ্বর হইয়াছে কেমন। ইহাতে নিশ্চয় কোন রহস্য লুক্কায়িত আছে। তিনি মৌলভী আবদুল করিম ছাহেবের নিকট পৌঁছিয়া আনারটি তাঁহার হাতে দিয়া হজরত যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া অট্টহাসিতে বলিলেন; "ইহা আবার কেমন অসম্ভব কথা যাহার কোন মূল্য নাই। আনারকে লেপ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে, লোকে তো হাসিবেই বরং আমাকেও পাগল বলিবে। আমি এই সমস্ত মাতলামী করিতে পারিনা ভাই।" মৌলভী আজিম ছাহেব বলিলেন, "আপনি উপহাস করিবেন না। ইহাতে নিশ্চয় কোন রহস্য নিহীত আছে। যাহা আমরা বুঝিতেছিনা। তিনি সাধারণ ফকীর নহেন। আমাদের ধারণা ও আলাপ আলোচনা পর্যন্ত তিনি জ্ঞাত আছেন। তিনি উত্তর করিলেন, আপনিও বোধ হয় তাঁহার শিকার হইয়াছেন এবং আমাকেও ফকীরি ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় আছেন।" আজিম ছাহেব

বলিলেন, ভাই, তাই বটে! হজরত ওমরের মতই বোধ হইতেছে।” অতঃপর তিনি মাদ্রাসায় চলিয়া গেলেন। তাহার দেহমনে যেন এক অপূর্ব অবস্থার সঞ্চার হইয়াছে। তাহার হৃদয়ের শান্তি যেন হজরত হরণ করিয়া নিয়াছেন। সেইদিন গত হইল। পরদিন তিনি মাদ্রাসায় গিয়াছেন। খবর আসিল– মৌলভী আবদুল করিম ছাহেবের ভীষণ জ্বর অতিশার। বাঁচিবার আশা নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি হজরতের পবিত্র বাণী স্মরণ করিলেন। এবং তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন ডাক্তার বসা আছে। এবং মৌলভী ছাহেব বিছানায় গড়াগড়ি দিতেছেন। আজিম ছাহেবকে দেখিয়া বলিলেন যে, ইহা তাহার শেষ রোগ। এই যাত্রা আর রক্ষা নাই। মৌলভী ছাহেব বলিলেন, হজরত ছাহেব যে একটি আনার আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কোথায়। তিনি আনারটি আজিম ছাহেবকে দিলেন। আজিম ছাহেব আনারটির সম্পূর্ণ অংশ করিম ছাহেবকে খাওয়াইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহার অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইল এবং শরীরের জ্বালা যন্ত্রনা প্রায় লাঘব হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করিলেন। দুই জনের মধ্যে পূনরায় আলাপ আরম্ভ হইল। মৌলভী ছাহেব এখন হজরতের “আনার রহস্য” বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, হজরত ছাহেব অন্তর্চক্ষুধারী অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন অলি আল্লাহ্। তিনি আপনার রোগ সম্বন্ধে জানিতে পারিয়া আমাকে আভাস দিয়াছিলেন এবং ঔষধ স্বরূপ তাঁহার কেরামতী প্রভাবান্বিত আনারটি পাঠাইয়াছিলেন! তাঁহাদের ভাবজনিত রহস্যপূর্ণ কালাম বুঝা বড়ই কঠিন। এখন মৌলভী আজিমুদ্দিন ছাহেব আনারের লেপঢাকা রহস্য ও হজরতের কেরামত প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিলেন। এবং হজরতের বেলায়েতের উপর তাহাদের পূর্ণ আস্থা হইল। কিছুদিন পর তাঁহারা উভয়েই এক সাথে হজরতের খেদমতে আসিয়া তাঁহার শিষ্য এবং ভক্তে গণ্য হইয়া গেলেন এবং পূর্বক্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। তাহারা সবসময় হজরতের গুণাবলী ও কেরামত ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকসমাজে প্রচার করিতেন। এইভাবে হজরত দুইজন বিশিষ্ট মনকের আলেমকে এক তীরে শিকার করিয়া নিজ আশেকে গণ্য করিয়া লইলেন এবং খোদাতা'লার প্রেমপ্রেরণা ও ফয়েজ প্রদানে তাঁহার নৈকট্যে আগাইয়া দিলেন।

মসজিদে হজরতকে নুরানী–জ্যোতির্ময় দেখা

হজরত ছাহেব কেবলার এক ভ্রাতুস্পুত্র ছৈয়দ নূরুল হক মিঞাকে নানুপুর নিবাসী মৌলভী ছৈয়দ আবদুল লতিফ ছাহেবের জ্যেষ্ঠকন্যা বিবাহ করাইয়াছিলেন। একদিন তিনি হজরত ছাহেব কেবলার বাড়ী হইতে রাত্রিকালে তাঁহার ছেলে আবদুল বারী সহ নিজ বাড়ীর প্রতি রওয়ানা হইলেন। দরবার শরীফ সম্মুখস্থ মসজিদ অতিক্রম করিতেই তাহার ছেলে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা মসজিদে আগুন লাগিয়াছে" তিনি মসজিদের প্রতি তাকাইলেন। দেখিলেন, আগুন তো নয় বরং এক অপূর্ব অলৌকিক জ্যোতিলহরী–আকাশ হইতে মসজিদ ভেদ করিয়া হজরত আকদাছের দেহ মোবারকে পতিত হইয়াছে। এবং হজরত মসজিদে তন্ময় বিভোর মোরাকাবায় রহিয়াছেন। ছেলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উহা কি?" তিনি চুপে চুপে বলিলেন, "এখন চুপ থাক পরে বলিব" তিনি দরজায় আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া নিলেন। অন্য কেহ নহে। হজরতই উপবিষ্ট–আছেন। স্বর্গীয় জ্যোতীতে হজরতের চেহারা মোবারক এক অপূর্ব বিস্ময়কর শোভাধারণ করিয়াছে। হজরত উহাতে যেন মিশিয়া রহিয়াছেন। তিনি অতি সন্তর্পনে তথা হইতে সরিয়া গেলেন। তাহারা বাড়ীর পথ ধরিলেন। ছেলে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা উহা কি!" ছেলে বুঝিবেনা চিন্তা করিয়া তিনি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন। "বাবা উহা হজরতের কেরামতি জ্যোতি।" তিনি মহা ভাবনায় পড়িলেন। এবং স্থির করিলেন যে, উহা তাঁহার বেলায়েতের প্রকৃষ্ট প্রমান। সকালে তিনি হজরতের দরবারে আসিয়া কদমবুচি করিলেন এবং তাঁহার হাতে দস্তবায়াত গ্রহণান্তে শিষ্যত্ব বরণ ও খোদাতা'লার অনুগ্রহ করা ফয়েজ অর্জন করিলেন। তিনি প্রায়ই হজরতের এই অপূর্ব্ব কেরামতী জ্যোতি ও পরিচয় সম্বন্ধে জনসমাজে আলাপ করিতেন।

হজরতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা সর্বাঙ্গ আলোড়নে ফয়েজ জারী

আম বাড়ীয়া নিবাসী মৌলানা আবদুল জলিল ছাহেব অতি প্রসিদ্ধ ধর্মভিরু ও মোত্তকী আলেম ছিলেন। তিনি হজরতের ভক্ত অনুরক্তদের সম্বন্ধে অনেক বিরূপ ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন আলাপ আলোচনা শুনিয়া এবং তিনি নিজেও হজরতের ভক্তদের নানা সমালোচনা করিতেন। একদিন তিনি হজরতের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বিনাজুরি খালের ধার দিয়া দাওয়াতে যাইতেছিলেন। তিনি জোহর নামায পড়িয়া রাওয়ানা হইয়াছেন। দেখিতে পাইলেন হজরত ছাহেব কেবলা অনেক লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বিনাজুরি খালের পাড়ে বসিয়া আছেন। হজরত তাহাকে দেখিতে না পায় মত ছাতি ধরিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন হজরত হঠাৎ দীপ্তকণ্ঠে– তাহাকে ডাক দিলেন। "মৌলানা ছাহেব কোথায় চলিয়াছেন? একটু এইদিকে আসুন তো!" ইহা শুনিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, কি এক মহাশক্তি তাহাকে যেন হজরতের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। তিনি হজরত সমীপে উপস্থিত হইয়া ছালাম করিয়া খোলা মাঠে বসিয়া পড়িলেন। হজরত তাঁহার সঙ্গে অতি মৃদুস্বরে নামায আদায় ও কাবায়ে হাকিকী সম্বন্ধে রহস্যপূর্ণ আলাপ করিতে করিতে তাহার উপর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাহার সমস্ত শরীর ও কল্‌ব আলোড়িত হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব প্রেরণাধিক্য দেখা দিল। ইহাতে তিনি তন্ময় ও বিহ্বল অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। তাহার সমস্ত লতিফাতে যেন বিদ্যোৎবত ক্রীয়া আরম্ভ হইল। বেলা প্রায় শেষ হইয়া যাইতেছে। আছরের নামাযের সময় গত প্রায়। সূর্য অস্তমিত হইতে চলিয়াছে। হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মৌলানা ছাহেব উঠুন। আছরের নামাযের সময় চলিয়া যাইতেছে।" ইহাতে তাঁহার চৈতন্য আসিল। তিনি সেইখানেই নামায সামাধা করিয়া নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হজরতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আর দাওয়াতে গেলেন না। ইহাতে তাঁহার ধারনা বদ্ধমূল হইল যে, হজরত একজন অতি ক্ষমতাসম্পন্ন অলি আল্লাহ্‌।

এর পর তিনি ভক্তদের সম্বন্ধে কখনও সমালোচনা করিলেও হজরতের বেলায়েত ও কেরামত সম্বন্ধে প্রশংসা ও প্রচার করিতেন। এইভাবে বহু বীর মোজাহিদ ও আলেম হজরতের দরবারে আসিয়া তাঁহার গাউছিয়তে ও বেলায়েতে বিশ্বাসী ও ভক্ত হইয়া তাঁহার প্রচার ভার ও খেলাফাতের আসন গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নযোগে হজরতের বেলায়েতের পরিচয়

সাবরেজিষ্ট্রার জনাব মৌলভী ছৈয়দ ফর্‌রোখ আহমদ ছাহেব ইছাপুরি হজরতের একজন অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রথমে স্কুল ইনস্পেক্টর হিসাবে কাজ করিতেন। তিনি অনেক পীর আউলিয়াদের দরবারে যাইতেন। উপযুক্ত কামেল পীর পাইলে তাঁহার দাসত্ব বরণে আল্লাহ্ তা'লার উপাসনা ও এবাদত করিবেন, ইহাই তাঁহার মনে একমাত্র অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কোথাও কামেল পীরের সন্ধান ও পরিচয় পাইলেন না। একদা তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পান তাঁহার পরলোকগত পিতা মুন্সেফ ছৈয়দ আমিনউদ্দীন ছাহেব, যিনি হজরতের কামালিয়ত বিকাশের প্রথম অবস্থায় পরলোক গমন করিয়া জান্নাতবাসী হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস! এত চিন্তিত আছ কেন?" তিনি বলিলেন, "বাবা উপযুক্ত ও মনমত পীরের অভাবে।" উত্তর পাইলেন, "বাবা প্রদীপের নীচে সাধারণতঃ অন্ধকার থাকে। লড়কে গোদ্‌মে আওর ঢেণ্ডেরা সহরমে।" কোলে সন্তান রাখিয়া সহরে ঢোল সোহরত করা। এই স্বপ্নের পর অতি চিন্তায় ঠিক করিলেন, বর্তমানে যাহা প্রশংসা শুনা যাইতেছে বোধহয় হজরতই এই প্রদীপ হইবেন। কারণ তিনি বাড়ীর নিকটে। অতএব একদিন তিনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হজরত তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পড়িতেছিলেন–

কশিশে কে এস্ক দারম ন গোজারমত বঁদিছা
ব জানাজা গর না আয়ি ব মজার খাহী আমদ।।

হজরতের এই ফারছী বয়াত পাঠ শ্রবণে তাঁহার মন ভক্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হজরত তাঁহাকে বলিলেন, "কেঁউ

রোতে হো? তোম্‌তো হামারে বাগকা গোলে গোলাপ হো” অতপর তাঁহার প্রতি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপে তাওয়াজ্জো প্রদানে ফয়েজ বর্ষণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার এক অপূর্ব এবং বিস্ময়কর অবস্থার সঞ্চার হইল। তিনি শান্তভাবাপন্ন হইয়া হজরতের শিষ্যত্ব ও ভক্তশ্রেণীতে দাখিল হইয়া গেলেন। তিনি হজরতের সহিত দেখা না করিলে তাঁহার দর্শন না পাইলে আর শান্তি পাইতেন না। তিনি মনস্থ করিলেন চাকুরীতে থাকিয়া তাঁহার খেদমতে যাওয়া আসা অতি দুষ্কর। সুতরাং চাকুরী ছাড়িয়া দিলে সবসময় হজরতের খেদমতে থাকিতে পারিবেন। তাই একদিন তাঁহার খেদমতে আরজি পেশ করিলেন, “হুজুর! এত দূরদেশে থাকিয়া হুজুরের খেদমতে আসা যায় না। আমি হুজুরের খেদমতে থাকিতে চাই। তাই চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। এখন হুজুরের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।” উত্তরে হজরত বলিলেন, “নেহি! নেহি তোম নকড়ি মত ছোড়। হামনে তোমকো এক কুরছি এনায়েত কিয়া হায় তোম ফেরেস্তা বন্‌কে আপনে মোকাম পর বৈট রাহোগে।” তিনি হজরতের পবিত্র কালাম বুঝিতে পারিলেন না। তোমাকে চেয়ার দান করিয়াছি। তুমি নিজ মোকামে বসিয়া থাকিবে। ইহার প্রকৃত তথ্য তাহার হৃদয়ঙ্গম হইলনা। কিছুদিন পর তিনি সাবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া বাড়ী হইতে তিন মাইল দূরে মোহাম্মদ তকীর হাট অফিস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন কাজ করার পর অফিস তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া তাঁহার বাড়ীর সামনে আসিল। সেখানে নিজ বাড়ীতে থাকিয়া তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অতি সম্মানের সহিত সাবরেজিষ্ট্রারী কার্য্য সমাধা করেন। তিনি এখন সবসময় হজরতের খেদমতে আসিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে থাকেন। এখন তিনি হজরতের রহস্যপূর্ণ কালামের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন।

স্বপ্নযোগে হজরতের বাতেনী এলেম শিক্ষাদান

পটিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চননগর নিবাসী জনাব মৌলভী–নুরচ্ছফা ছাহেব মির্জাখিল অধিবাসী পীর জনাব মৌলভী আবদুল হাই ছাহেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি তাহার পীর ছাহেবের নিকট তরিকতী আধ্যাত্মিক

এলেম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে শুধু কেতাবী কথাই বলিতেন এবং কেতাবই দেখাইয়া দিতেন। তিনি হাকিকত অনুসন্ধানী ছিলেন। তাহার এই সমস্ত আলাপে এবং কেতাব দর্শনে তাহার তৃপ্তি হইতনা। স্বপ্ন বশারতযোগে বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় কোন প্রকার খোদাদাদ এলমে লদুনীর সন্ধান না পাইয়া তিনি বড় চিন্তিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, একদিন তাহার পীর ছাহেবের খেদমতে পবিত্র কোরানের আয়াত শরীফ "মান কানা ফিদ্দুনিয়া আ'মা ফাহুয়া ফিল আখেরাতে আ'মা" এর সারবস্তু ও মূলরহস্য জানিতে চাহিলে তাহার পীর তাহাকে পূর্ববৎ কেতাবের প্রতিই নির্দেশ দিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বহুদিন হয় তিনি মুরিদ হইয়াছেন। অথচ কোন প্রকার প্রেরণা তাহার হৃদয়ে আসিতেছে না। শুধু এবাদত বন্দেগীতে রত রহিয়াছেন। পীরের ফয়েজ, এলকা ও এলহাম ইত্যাদি খোদা প্রেরণা নেয়ামত হইতে একেবারেই বঞ্চিত রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলেন, উপযুক্ত পীর মনে করিয়া তাহার হাতে বায়াত গ্রহণ করিলেন। এখন উপায় কি! অতঃপর তিনি আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থী হইয়া কান্না মিনতি করিতে লাগিলেন। একরাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) তাহাকে একখানা বড় কেতাব পড়াইতেছেন। এবং প্রত্যেক স্তরে স্তরে বাতেনী রহস্যাবলীর ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছেন। স্বপ্নে তাহার জজব প্রেরণা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি পরিচয় চাহিলেন, হুজুর আপনি কে? কোথায় আপনাকে পাইব! তিনি উত্তরে মাইজভাণ্ডারী বলিয়া পরিচয় দিতেই তাহার স্বপ্ননিদ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার তো পীর আছে। আবার মাইজভাণ্ডার কেমন করিয়া যাইবেন। ইহার পর ছয়মাস গত হইল। আর এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তিনি এমন দরবারে আসিয়াছেন, উহা তিনি চিনিতেছেন না। সকলে বলাবলি করিতেছে, ইহা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পরিলেন, তাহাকে মাইজভাণ্ডার যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা বোধহয় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাহার প্রার্থনার প্রতিউত্তর। ইতি পূর্বে

হজরতের খাদেম মৌলভী আহমদ ছফার সহিত তাহার পীরের ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কয়েক বার তাহার তর্ক হইয়াছিল। তিনি নিজ ভুলকে ঢাকা দিয়া জানিবার উদ্দেশ্যে তর্ক করিতেন। কিছুদিন পর তিনি হজরতের উক্ত খাদেম মৌলভী আহমদ ছাফার সহিত দরবার শরীফ আসেন। তিনি হজরতের হালচাল ও গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরতকে দেখিয়া প্রথমে তাহার ভক্তি জন্মিলনা। কারণ তাহার পীর ছাহেব অতি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এবং সুন্দর ছিলেন। হজরত কিন্তু তাহার মত নহেন। তিনি ভাবনায় পড়িলেন। একদিন পর তিনি হজরতের খেদমতে গেলেন। তাহাকে দেখিয়াই হজরত "তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবেওঁ ওয়া তাব" আয়াতটি পড়িতে লাগিলেন। আবু লাহাব হজরত রছুল করিম (দঃ) এর উপর ঈমান আনে নাই বলিয়াই কাফের। এই কথা হজরত কেন পড়িতেছেন। এবং কাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া পড়িতেছেন। তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সেই সময় হজরতের অন্যতম প্রিয় খলিফা জনাব কাজি আছদ আলী ছাহেব হজরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৌং নূরচ্ছফাকে বলিলেন, আপনাকেই বোধহয় হজরত এই কালাম বলিতেছেন। আপনি বোধহয় হজরতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস আনেন নাই। আপনার কোন কাজ হইবে না আপনি চলিয়া যান। তখন তাহার চৈতন্য উদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, হজরত অন্তর্চক্ষুধারী ক্ষমতা সম্পন্ন। না হয় তো কি রূপে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। তাহার ভয় হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া অজু করিলেন এবং তওবা পড়িয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষমা চাহিয়া পুনরায় হজরতের খেদমতে গেলেন এবং কদমবুছি করিলেন। হজরত বলিয়া উঠিলেন, আপনি কি চাহেন? তিনি উত্তর করিলেন, হুজুর আমি এলেম চাহি। হজরত তাহাকে নির্দেশ দিলেন,– "কোরান পাঠ করিয়া পরে আমপারা পড়িবেন।" এই কালাম রহস্য–তাহার বুঝে আসিলনা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কোরান পাঠে কি করিয়া এলেম – অর্জন হইবে এবং পরে আমপারা পাঠের রহস্যই বা কি! তিনি কাজি ছাহেবকে ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। কাজি ছাহেব

বলিলেন, আমপারা তেলাওয়াত করার অর্থ দরুদযুক্ত অজিফা পাঠ করা। ইহা ছুফীদের একটি এছতেলাহী প্রচলিত ভাষা। তিনি হজরতের খেদমতে কিছুক্ষণ বসার পর তাহার কল্‌ব ও শরীর যেন প্রেরণায় কম্পিত হইতে লাগিল। হজরত তাহাকে বিদায় দিয়া বাড়ী যাইতে আদেশ দিলেন। তিনি হজরতের নির্দেশ মত বাড়ী যাইয়া রীতিমত কোরান ও অজিফা পাঠে লিপ্ত হইলেন। দিন দিন তাহার জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান খুলিতে লাগিল। এখন তিনি সময় মত এলকা, এলহাম বা স্বপ্নযোগে নানা তথ্যের সন্ধান পাইতে লাগিলেন। কোরান পাঠে ও এবাদত বন্দেগীতে তাহার হৃদয়ে খোদাতা'লার প্রেম প্রেরণা বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে ও বিভোর চিত্তে খোদার বন্দেগী করিতে পারিতেছেন। তাহার মনে যেন সান্ত্বনার উদয় হইল। কিছুদিন পরে তিনি আবার হজরতের খেদমতে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্বে দাখিল হইলেন এবং মির্জাখিল যাওয়া বন্ধ করিলেন। তিনি হজরতের ফয়েজ রহমত অর্জনে শেষ পর্যন্ত একজন অন্যতম কামেল খলিফারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি বহু তত্ত্বপূর্ণ গান গজল লিখিয়া গিয়াছেন।

বেলায়েতী ক্ষমতায় রোগ মুক্তিতে হজরতের পরিচয়

চট্টগ্রাম কোর্টের সু প্রসিদ্ধ উকিল জনাব মৌলভী বদরুল হক খান। বি-এল ছাহেবের পিতা–জনাব কাজি মৌলভী মনওয়ার আলী খাঁ ছাহেব অতি প্রতিপত্তিশালী সুখ্যাত লোক ছিলেন। কাজি ছাহেব প্রথমাবস্থায় দরবার শরীফের ঘোর বিরোধী ছিলেন। লিখাপড়ায় ও কথাবার্তায় যাহাকে যেখানে পাইতেন, দরবার শরীফের বিরুদ্ধে বলিতেন। দরবার শরীফ আসিলে শরীয়ত অনুযায়ী গোনাহগার হইবে বলিয়া প্রকাশ করিতেন। মুশরেক এবং বেদায়াতী হইবে, তাহাদের ঈমান থাকিবে না ইত্যাদি কথা বলিয়া জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়া বেড়াইতেন।

এইভাবে তিনি আল্লাহ্ তা'লার মাহবুবের বিরুদ্ধাচরণে রত হইলেন। আল্লাহ্ তা'লা যাহাকে ইচ্ছা করেন, হজরত ওমরের মত যে কোন কৌশলে বা

পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহাকে আল্লার প্রতি ফিরাইয়া আনেন এবং তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহার উপর এমন এক বিমার চাপাইয়া দিলেন, যাহাতে তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার অলিদের আশ্রয়ে আসিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হন। খোদা তা'লার কৌশলে ক্রমে তাহার পিঠের উপর ভয়ানক এক পিষ্টক ঘা হইল। উহা দিন দিন বাড়িতে থাকে। বহু ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসা চলিল কিন্তু কোন ফল হইল না। একদিন তাহারা চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের সিভিল সার্জন ছাহেবের নিকট গেলেন। তিনি তাহাকে ভালরূপে দেখিয়া বলিয়া দিলেন তাহার এই রোগ আরোগ্য হইবার নহে। বর্তমানে অপারেশন ছাড়া ইহার কোন গতি নাই। অপারেশন করিলেও জীবনের আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় ইচ্ছা করিলে নিজ দায়িত্বে অপারেশন করাইতে পারেন এই কথা শুনিয়া তিনি জীবনের আশায় একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। অপারেশন করিলে হয়তো অতি সহসা মারা যাইবেন, এই ভয়ে অপারেশন করাইতে রাজি হইলেন না। দরবারে পাকের সুপ্রসিদ্ধ খলিফা আহলা মৌজার জনাব হজরত কাজি আছদ আলী ছাহেব তাহার আত্মিয় হন। রোগ শয্যায় তিনি হজরত আছদ আলী ছাহেবের দোয়া চাহিলে তিনি বলিলেন, "নিরাশ হইবেন না। আল্লাহ্ তা'য়ালা নিতান্তই ক্ষমতাশালী ও দয়াবান। তিনি ইচ্ছা করিলে মৃতকেও জীবন দান করিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতেক ডাক্তার আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন। হয়তো আপনি এমন কোন আচরণ করিয়াছেন; যাহাতে আল্লাহ্তা'য়ালা নারাজ হইয়াছেন। এমতাবস্থায় আপনি কোন একজন "তবিবে হাজেফ" অলি আল্লাহের আশ্রয়ে আত্মসমর্পনে খোদা তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রার্থনা জানান। ইহাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয় আপনাকে আরোগ্যদান করিবেন।"

কাজি সাহেব বলিলেন, এইরূপ কামেল অলিআল্লাহ্ কোথায় পাইব। সন্ধান পাইলে নিশ্চয় আশ্রিত হইব। জনাব, কাজি আছদ আলী ছাহেব বলিলেন, চলুন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হজরত ছাহেব কেবলার কাছে যাই।

আমার বিশ্বাস তিনি দয়া করিলে আপনি অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করিবেন। তিনি অতি উচ্চ ক্ষমতাবান পাপী-তাপীর মুক্তিদাতা “গাউছুল আজম”। কাজি ছাহেব জীবনের আশায় অগত্যা রাজী হইলেন। কয়েকদিন পর তাঁহারা উভয়ে দরবার শরীফ আসিয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। কাজি আছদ আলী ছাহেব হজরতের একজন অন্যতম ভক্ত। তিনি তাঁহাকে হজরতের সামনে হাজির করিয়া আরজ করিলেন, “হুজুর ইনি সমস্ত চিকিৎসায় বিফল হইয়া হতাশ হৃদয়ে আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছেন। এখন আপনার দোয়া ও দয়া চাহেন।” ইহাতে হজরত তাহাকে আদেশ দিলেন, “মিঞা! কিছু গোলমরিচ পিশিয়া গরম কর এবং উহাতে লাগাইয়া দাও।”

কাজি ছাহেব হজরতের নির্দেশ মত কিছু গোল মরিচ পিশাইয়া গরম করিলেন এবং পিঠের ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিলেন। প্রথমবারেই ক্ষত ফাটিয়া আরোগ্যের পথে আগাইয়া চলিল। ইহার পর আরো উক্ত ঔষধ লাগাইবার পর যন্ত্রনা সম্পূর্ণ লাঘব হইয়া ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেল। হজরতের এই অপূর্ব খোদাদাদ চিকিৎসা শক্তি দেখিয়া কাজি মনওয়ার আলী খাঁ ছাহেব হজরতের একজন ভক্ত হইয়া গেলেন।

হজরতের পদমর্যাদা ও কশ্‌ফ শক্তির পরিচয়

পটিয়া থানার অন্তর্গত সাতবারিয়া গ্রাম নিবাসী হাজী মৌলভী আবদুর রসিদ ছাহেব হজরতের আশেক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ছুফী হিসাবে লোক সমাজে সুপরিচিত ছিলেন।

ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা নূর বক্‌স ছাহেব সে সময়ে মোহছনিয়া মাদ্রাসায় পড়াইতেন। তিনি উক্ত মৌলভী আবদুর রসিদ ছাহেবকে ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হজরতের ওফাতের পূর্বে একদা তিনি মাদ্রাসায় পড়াইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “মিঞা তোমরা তো প্রায় সকলেই হজরত মৌলানা শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ ছাহেবের খেদমতে যাও। তিনি একজন জবরদস্ত অলি

আল্লাহ্ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু "মজজুব' ও নামাযের পায়বন্দ নহেন বলিয়া ভয়ে তাঁহার খেদমতে গেলাম না। কারণ আমিতো কাজের লোক। তাহাদের দৃষ্টিতে আবার কোন অবস্থাই না হইয়া যায়, তাই খুব ভয় করিতেছি।"

আবদুর রসিদ ছাহেব উত্তরে তাহাকে বলিলেন, "হুজুর! মানুষের নানা কথায় কান না দিয়া একবার নিজে যাইয়া দেখিতেন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন। আমার তো মনে হয়, তিনি মজজুব নহেন। তাহার মত অলি আল্লাহ্ বর্ত্তমান যুগে আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয় আপনি নিজে একবার গেলে ভাল হইত।"

কিছুদিন পর, ছুটি উপলক্ষে মৌলানা নূর বক্স ছাহেব হজরতের খেদমতে আসিলেন হজরত সেইসময় দায়েরা শরীফে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হজরতের সামনে আসিয়া আচ্ছালামু আলায়কুম বলার সাথে সাথেই হজরত ছালামের উত্তর দিয়া বলিতে লাগিলেন, মিঞা! মজজুব কে পাছ কেঁউ আয়া? মিঞা! মজজুবকে পাছ কেঁউ আয়া? মাইতো মজজুবে মাহজ নেহী হোঁ। মজজুবে ছালেক হোঁ। বায়তুল মোকাদ্দছ মে নমাজ পড়তা হোঁ!" এই কালাম শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি সেখানে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর আদবের খাতিরে সেখান হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহাতে তিনি হজরতের বেলায়েত পদমর্যাদা 'মজজুবে ছালেক" বেলায়েতের সর্বোচ্চ মোকাম বলিয়া অবহিত হইলেন। তিনি হজরতের দরবার হইতে যাওয়ার পরে, তাহার খোদা প্রেরণা শক্তি এমনভাবে বাড়িয়া গেল যে তিনি কোরান তেলাওয়াত ও নামায, প্রেমবিভোর চিত্তে হুজুরী কলবের সহিত পড়িতে পারিতেন। তিনি নিজেই এই ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সর্বদা ইহা প্রচার করিতেন।

হজরতের ফয়েজ এর্শাদ ও পরিচয়
জনাব মৌলভী আবদুর রহমান ছাহেবের প্রতি রহস্যময়বাণী ও ফয়েজ এর্শাদ

রাউজান থানার অন্তর্গত সর্ত্তাকুল নিবাসী জনাব মৌলভী আবদুর রহমান ছাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি হজরতের ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি ও মৌলভী রহিম উল্লাহ্ ছাহেব প্রায় সময় হজরতের খেদমতে আসিতেন। হজরত ছাহেব কেবলা একদিন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি মোহাম্মদ তকীর হাট চিন?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ হুজুর চিনি।" হজরত নির্দেশ করিলেন, "কোহেতুরের কিনারায় বসিয়া সওদাগরী কর।"

তিনি বাড়ী গিয়া অনেক চেষ্টায় মাত্র বাইশটি টাকা সংগ্রহ করিয়া পরদিন ভোরে সহরে চলিয়া গেলেন। তিনি বাইশ টাকার মনোহারী মাল খরিদ করিয়া বাড়ী আসিলেন। তাহার পরদিন মোহাম্মদ তকীর হাটে ব্যবসা করিতে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার দোকান খালী হইয়া গেল। মাল আর দিতে পারিতেছেন না। বাড়ীতে আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন বাইশ টাকার মাল ছিয়াত্তর টাকা বিক্রয় হইয়াছে।

তাহার পরের দিন পুনরায় সহরে গেলেন। প্রতি কিস্তিতে–পঞ্চাশ টাকা শোধ করিবার চুক্তিতে এইবার একশত বিশ টাকার মাল লইয়া বাড়ী আসিলেন। সহর হইতে হজরতের জন্য একখানা অতি সুন্দর আয়নাও খরিদ করিয়া আনিয়াছেন। পরদিন আয়না হাতে হজরতের খেদমতে হাজির হইলেন। কদমবুচি করিয়া আয়নাখানি হজরতের সামনে পেশ করিয়া আরজ করিলেন, "হুজুর আপনার আদেশ মত মোহাম্মদ তকীর হাটে কতক মাল বিক্রয় করিয়া আমি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছি।" ইহা শ্রবণে হজরত অত্যন্ত "জালাল" হইয়া গেলেন! আয়না খানি স্বজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিছ্নে বোলা তোমকো কে মোহাম্মদ তকীর হাট মে সওদা করো! তোম হামারে বাজার মে সওদা মত করো!" তারপর হজরতের বাম পার্শ্বে রক্ষিত লাঠিটি লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি ভয়ে

পলায়ন করিলেন। ইহাতে তাহার মনে ভয়ানক চিন্তা আসিয়া গেল। কি কারণে বিপরীত হইল, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না। তবুও অতি চিন্তিত মনে বাজার তারিখে মাল লইয়া বাজারে বসিলেন। বাজার পূর্ণ মানুষ কিন্তু এক পয়সাও বিক্রয় নাই। পরদিন অতি ছোট মনে মালগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য সহরে চলিয়া গেলেন। বাজারের অবস্থা বলিয়া মহাজনকে মালগুলি ফেরত দিলেন। পরে তিনি হজরতের খেদমতে আসিয়া দেখিলেন, হজরত আন্দর বাড়ীর প্রাঙ্গনে একখানা চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। এবং ভক্ত মণ্ডলী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি পতঙ্গের মত কাঁপিয়া হজরতের চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। এবং নয়ন জলে তাঁহার রাতুল চরণ সিক্ত করিয়া দিলেন। হজরত লাঠি দিয়া সজোরে কয়েকটি প্রহার করিলেন। এবং পা মোবারক তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। হজরতের ভ্রাতুস্পুত্র ছৈয়দ গোলাম ছোবহান প্রকাশ চুন্নমিঞা তথায় উপস্থিত ছিলেন। হজরত তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চুন্নমিঞা ইহাকে উঠাইয়া লও তো!" তখন চুন্নমিঞা অতি কষ্টে তাহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। সকলে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তবুও তিনি কঁদিতে কাঁদিতে বক্ষস্থল ভিজাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। হজরত সরবত তৈয়ার করিয়া উপস্থিত সকলকে সরবৎ দান করিলেন, তাহাকে হজরত নিজ হস্তে কিছু সরবত পান করাইয়া দিলেন। এবং আদেশ করিলেন, "তোম ময়মনসিং মে ছায়ের করো"। ইহাতে তাহার মনে পূনঃ নব আশার সঞ্চার হইল। সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি ময়মনসিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর রাত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি পথচলা বন্ধ করিলেন না। তাহার মনে নূতন আশা,–নূতন প্রেরণা,–তিনি দ্রুতগতিতে পথ চলিতে লাগিলেন। সারা রাত পথ চলার পর তিনি এক প্রকার কাতর হইয়া পড়িলেন। নেজামপুর এক বাড়ীতে মোছাফের হইলেন। তথায় তিনি তিন দিন রহিলেন। ইহার মধ্যে একদিন সেই বাড়ীতে এক শিশু সন্তানের মাতৃরোগ হয়। তাহারা ডাক্তারের খোজে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের বিপদে তিনিও অধির

হইলেন। গৃহস্বামী তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন আল্লার নাম লইয়া শিশুটি একটু দেখেন। তিনি যাইয়া হজরতের নাম লইয়া সাধারণ ভাবে দোয়া পড়িতেই শিশু আরোগ্য লাভ করিল। তাহারা অত্যন্ত খুশি হইয়া ভক্তি সহকারে তাহাকে সতেরটি টাকা দান করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে বিদায় গ্রহণান্তে পথ চলিতে লাগিলেন। হাটিতে হাটিতে তিনি আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এবং কুমিল্লা জেলার সরাইল নামক গ্রামের এক বাড়ীতে মোছাফের হইলেন। খোদার মর্জিতে সেখানেও তাহার কাজ জুটিয়া গেল। সেখানে বাড়ীওয়ালী প্রসব বেদনায় ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া তাহার নিকট তাবিজ চাহিলেন। তিনি তাবিজ দেওয়ার সাথে সাথে বাড়ীওয়ালীর সন্তান প্রসব হইয়া যায়। বাড়ীর মালিক তাহাকে অতি যত্নে আরো কয়েকদিন রাখিয়া পরে ময়মনসিং পৌঁছাইয়া দেয়। তথায় তিনি মসজিদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তাহার জজবাতী হাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার অবস্থা দর্শনে লোকজন তাহার ভক্ত হইতে আরম্ভ করিল। এবং তাহার নিকট তাবিজ দোয়া চাইতে লাগিল। তাহার এমন সৌভাগ্য যে, হজরতের শুভদৃষ্টিতে তিনি যাহাকে যাহা প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহাতেই সুফল ফলিতে আরম্ভ হইল। তাহার নিকট নানা প্রকার হাজতি লোকের ভীর দেখিয়া মসজিদের মোতওয়াল্লি ছাহেব তাহাকে তাহার বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার নিকট বহু টাকা পয়সা আসিতে লাগিল। মোতওয়াল্লি ছাহেব তাহার টাকা পয়সার হেফাজত করিতেন এবং নিজ হাতেই তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যে "পাগল মৌলভী ছাহেব" নামে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেকেই তাহাকে অগাধ ভক্তি বিশ্বাস করিতে লাগিল। তিনি প্রায় সময় প্রেরণায় বিভোর থাকায় নামায রোজা করিতে পারিতেন না। এতদশ্রবণে মৌলভী জামাল উদ্দিন নামক এক সুপ্রসিদ্ধ স্থানীয় আলেম তাহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তথায় তাহার এক বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। একদিন বহু লোকের সঙ্গে মৌলভী জামাল উদ্দিন আসিতেছেন জানিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে

করিলেন, মৌলভী ছাহেব হয়ত সদলবলে তাহার সঙ্গে নামায সংক্রান্ত বিষয়ে বাহছ করিতে আসিতেছেন।
তিনি ধ্যানে বসিয়া হজরতের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ধ্যান মগ্ন অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, হজরত তাহার সামনে হাজির। এবং তাহাকে বলিতেছেন, "মিঞা আবদুর রহমান! তোম মৎ ঘাবড়াও! জামালুদ্দিন কেয়া করেগা। তোম হামারা লাড়কা হায়, হাম তোমারে ছাথ হায়।" ইহাতে তিনি চক্ষু খুলিলেন। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া জারি হইয়া গেল–

আহলে দুনিয়া কাফেরানে মতলাকান্দ
রোজ ও শব দর বক বক ও দর জক জকন্দ।।

"দুনিয়াদার লোক নিশ্চয় কাফের। তাহারা দিবারাত্র বকাবকি করিয়াই সময় কাটায়।" ঠিক সেই সময় মৌলভী জামাল উদ্দিন ছাহেব, তাঁহার বাসার দরজায় উপস্থিত। তিনি এই শেয়েরটি তাহার মুখে শুনিয়া এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে তাহার সঙ্গিদের বলিলেন, "তোমরা সব চলিয়া যাও। এতগুলি লোক আমার পিছনে কেন আসিয়াছ। মৌলভীর লড়াই দেখিতে নাকি! সবাই ফিরিয়া যাও। এইরূপ লোকের প্রতি সরিয়তের আইন প্রযোজ্য নহে। এই ব্যক্তি নিশ্চয় এমন কোন বাদসার গোলাম, যাহার কোন তুলনা হইতে পারেনা। আমার মনে হয় ইনি একজন উচ্চদরের আউলিয়ার প্রতিনিধি। তোমরা সবাই আদবের সাথে ফিরিয়া যাও।" মৌলভী জামাল উদ্দিন ছাহেব তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। মৌলভী ছাহেব চকিতে না বসিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্বক নতজানু হইয়া তাহার সামনে মাটিতে বসিয়া গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ তাঁহার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! আমাকে এক হাকিম মারার অপরাধে মানহানী ও অনধিকার প্রবেশ মোকদ্দমায় জড়িত করিয়া আসামী করিয়াছে। আমার জন্য একটু দোয়া করুন।"
হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "তোম্‌কো খালাস দিয়া তোম্ খালাস হ্যায়।" অতঃপর তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পর মোকদ্দমার তারিখ পড়িল। দেখিলেন, মৌলভী জামালুদ্দিন ছাহেবকে

মোকদ্দমায় বেকসুর খালাস দিয়াছেন। ইহাতে মৌলভী ছাহেবের ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি অতি আনন্দিত মনে তাহার এক শিষ্যসহ পুনরায় তাহার খেদমতে আসিয়া তাহাকে দশটি টাকা উপহার দিয়া বলিলেন, "হুজুর! আপনার দোয়ায় আমি বেকসুর খালাস পাইয়াছি। তাই সংবাদ দিতে আপনার খেদমতে আসিয়াছি।" মৌলভী ছাহেব চলিয়া গেলেন। মৌলভী আবদুর রহমান ছাহেব হজরতের অপূর্ব ক্ষমতা ও দয়াদৃষ্টি প্রত্যক্ষ দর্শনে কাতরভাবে সেজদায় পড়িয়া আল্লাহ্ তা'লার শোকরিয়া আদায় করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মৌলানা কাঞ্চনপুরীর প্রতি ফয়েজ এর্শাদ ও অপূর্ব বাণী

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর নিবাসী মৌলানা আবদুল আজিজ ছাহেব হজরত ছাহেব কেবলার ভক্ত অনুরক্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হজরতের ফয়েজ ও কৃপাকণা হাছিল করিয়া একজন খ্যাতনামা বুজর্গ হিসাবে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ও ভক্ত আছেন, যাহারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে উন্নত ও হৃদয়ালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনাব মৌলানা আবদুল আজিজ ছাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম বার তিনি যখন হজরতের খেদমতে আসেন, হজরত তখন আন্দর হুজরায় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় শায়িত ছিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, যেন শুধু একখানা চাদর বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বার বার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন; হজরত বিছানায় নাই। খালি একখানা চাদরই দেখা যাইতেছে। হঠাৎ দেখিলেন, হজরত ছাহেব কেবলা চেহারা মোবারক হইতে চাদরখানা সরাইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এবং গম্ভির স্বরে বলিতেছেন, “আদব করো। আদবকা মোকাম হ্যায়। তোমহারে পাওকে নীচে কোরান হ্যায়”। ইহা শ্রবণের সাথে সাথে যেন তাহার পায়ের নীচে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ অনুভূতি হইতে লাগিল। তিনি ভয়ে বসিয়া পড়িলেন কিছুক্ষণ পর হজরত পুনঃ তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন, “কবুতর হ্যায়, খোস জিয়েঙ্গে, পাকছাফ জিয়েঙ্গে”। তিনি ভয়ে বিহ্বলিত চিত্তে বলিলেন, “হুজুর ছবকুছ আল্লাহ্‌কা হাতমে হ্যায়”। হজরত প্রতিউত্তরে বলিলেন, “আপ যো কহে হক হ্যায়। মগর মাই যো কেহ দিয়া আপ দেখ লেঙ্গে”। অতঃপর তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমকো হামারে পাছ কিছনে বেজা হ্যায়"। তিনি উত্তর করিলেন, "রূপসা নিবাসী মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর পুত্র আহাম্মদ গাজী চৌধুরী ছাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন"। ইহা শ্রবণে হজরত বলিলেন, "হজরত ইউসুফ কো ভাইওঁনে কুঁয়েমে ঢালেথে। আল্লাহ্ তা'য়ালানে উঠালিয়া। উছকো ভি ভাইওঁনে কুঁয়েমে ঢালেগা। আল্লাহ্ তা'য়ালা উঠালেগা"। তৎপর তাহাকে বহির্বাটীতে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি তথা হইতে যাইয়া বহির্দ্বায়েরাতে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন, হজরত ছাহেবও দায়েরা শরীফের দক্ষিণ দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছেন। হজরত দায়েরা শরীফে প্রবেশ মাত্রই বিছানার উপর উত্তর শিয়রে শয়ন করিলেন। তিনি হজরতের পার্শ্বে পশ্চিমমুখি হইয়া বসিলেন। হজরত ছাহেব কেবলা চোখেচোখে চাহিয়া "তাওয়াজ্জোহ্" দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাহার প্রেরণাপূর্ণ অবস্থা দেখা দিল। হজরতের চক্ষুদ্বয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। কাঞ্চনপুরী বলেন, "কছম আল্লাহ্! আমার জীবনে হজরতের এমন রঙ্গিন চক্ষু আর কখনও দেখিনাই।" তাহার পর তিনি তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র মৌলানা আমিনুল হক ছাহেবের স্কন্ধে ভর দিয়া বাহিরে গেলেন। এবং পুনঃ প্রবেশ করিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। তিনি কাঞ্চনপুরিকে নির্দেশ দিলেন, "তোম কোর্ত্তা উল্টাকে পহেনো"। ইহাতে তিনি পরিধানের জামা উল্টাইয়া পরিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, ইহার মধ্যে কি নিহিত আছে। পরে বুঝিলেন, হজরত বাহ্যিক সৌন্দর্য্য হইতে আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য্যকে অধিক পছন্দ করেন।

অতঃপর উপবিষ্ট শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া অতি অসন্তুষ্টির সহিত গম্ভির স্বরে বলিলেন, "তোমলোগ খোদাকো ভুল্‌কর হামারে পিছে কেওঁ এতনা লাগ গিয়ে হো? কেয়া আজ জুমায়া কা দিন নেহী হ্যায়? তোম লোগ অজু করকে মসজিদ মে যাকর নামায পড়হো। আওর আল্লাহ্ আল্লাহ্ করকে আপনে আপনে ঠিকানামে চলে যাও"। হজরতের এই পবিত্র নির্দেশে সকলের চৈতন্য উদয় হইল। সকলে অতি তাড়াতাড়ি মসজিদের প্রতি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। হজরত আকদাছও সকলের পিছনে ধীরে ধীরে

যাইতে লাগিলেন। সকলে যখন মসজিদ পুকুরের ঘাটে পৌঁছিল, হজরত তখন বাড়ীর প্রতি রওনা দিলেন।

নামায পড়িয়া আরো অনেক লোকজনসহ দায়েরা শরীফে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, হজরত দক্ষিণ দ্বার দিয়া দায়েরা শরীফে প্রবেশ করিতেছেন এবং যাইয়া বিছানায় পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িলেন। হজরত কাঞ্চনপুরীর প্রতি শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাওয়াজ্জোহ ও ফয়েজ এনায়েত করিতে লাগিলেন। এই সময় কাঞ্চনপুরীর যাহা অবস্থা হইয়াছিল, উহা বর্ণনার অতীত। কিছুক্ষণ পর হজরত আন্দর হুজরায় চলিয়া যান। পরদিন শান্ত অবস্থায় হজরত তামাক সেবন করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় বিদায় গ্রহণ মানসে তিনি হজরতের সামনে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "আপ্ কেঁউ রোতে হোঁ"। তিনি আরজ করিলেন, "হুজুর এই অধমকে হুজুরের দাস শ্রেণীতে গণ্য করা হউক!" প্রতি উত্তরে হজরত বলিলেন; "আচ্ছা"। তবুও তাহার ক্রন্দন বন্ধ হইতেছে না। হজরত পূনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফের আপ্ কেঁউ রোতে হো!" উত্তরে কাঞ্চনপুরি মিনতি জানাইয়া বলিলেন, "হুজুর কোন অপরাধের দায়ে যেন হুজুরের দপ্তর হইতে আমার নাম খারিজ হইয়া না যায়। ইহাই আমার একমাত্র কামনা"। হজরত তাহাকে বলিলেন, "কুচ খাওফ নেহী"। অতঃপর অতি বিনয় সহকারে হজরতকে কদমবুচি করিতে উদ্যত হইলে, হজরত বলিলেন, "আভী নেহী, আয়েন্দা মে আরজু পুরা হোগা"। তিনি ছালাম দিবার উদ্দেশ্যে দাড়াইতেই হজরত তাঁহাকে ডানহস্ত উত্তোলনে আচ্ছালামু আলাইকুম বলিয়া ফেলিলেন। অতএব তিনি ওয়ালাইকুমুচ্ছালাম বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

তিনি বাড়ীতে যাইয়া আহম্মদ গাজী চৌধুরী ছাহেবের সাথে দেখা করিলেন। তাহাকে হজরতের ভবিষ্যতবাণী বর্ণনা করিলেন। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার তো কোন ভাই নাই, কে আমাকে কূপে নিক্ষেপ করিবে! অলি আল্লাহ্দের রহস্যময় কালামের মর্ম উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। না জানি ইহাতে কোন্ পবিত্র রহস্য নিহীত রহিয়াছে"।

কিছুদিন পর পুনরায় তিনি হজরতের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হজরত তাহাকে কোরান শরীফ তেলাওয়াতের নির্দেশ দিলেন। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া বিছমিল্লাহ্ পাঠান্তে কোরান তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যেন স্পষ্ট অনুভব করিলেন–"ঘড়িতে চাবি দেওয়ার সময় যেমন কর্কর্ শব্দ হয়। তাঁহার কল্বের মধ্যেও সেই রূপ হইতেছে। তাহার দেহ মন হালকা ও পবিত্র অনুভব হইতে লাগিল। এইভাবে কয়েক মাস কোরান পাঠ করিয়া কয়েক পারা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল।

কিছুদিন পর পূনঃ তিনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হজরত তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আওর কেউ আয়া, তোমরা তো এতনা ছিপারা হোগিয়া।" কত ছিপারা বলিয়াছিলেন, বর্ণনাকারীর উহা স্মরণ না থাকায় এখানে উহা উহ্য রহিল। হজরত যত পারার কথা বলিয়াছিলেন ঠিক তত পারাই তাহার মুখস্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি হজরতকে উপহার দেওয়ার নিয়তে একশিশি আতর আনিয়াছিলেন। হজরতের খেদমতে উহা পেশ করিয়া তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, "হুজুর আমি গরীব মানুষ, আপনার জন্য কিছুই আনিতে পারি নাই"। হজরত তাহার প্রতি করুণ নয়নে তাকাইয়া বলিলেন, "মাই তোমারে পাছ কুই চিজকি মোহতাজ নেহী হো"।

দেশীয় একজন মৌলভী ছাহেব তাহার সাথে হজরতের দরবারে আসিয়াছিলেন। তিনি হজরত আকদাছের বেলায়েত সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহসূচক শ্লেষউক্তি করিতেন। তিনি যখন হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, হজরত তাহাকে দেখিয়াই তাহার প্রতি পিছন ফিরিয়া বসিলেন এবং মহাকবী খসরু রচিত নিম্নলিখিত "শেয়ের"টি পাঠ করিতে লাগিলেন।

খল্ক মি গোয়েদ কে খসরু ভুত পুরস্তি মিকুনদ।
আরে আরে মিকুনম বাখলকে আলম কারে নিস্ত।।

মহা কবি খসরু বলেন– "লোকে বলে খসরু ভুতের পুজা করে সত্যই আমি ভুতের পুজা করি। ইহাতে বিশ্ববাসীর সাথে আমার কোন কাজ নাই। ইহা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার"।

উক্ত শেয়েরটি শুনিয়া মৌলভী ছাহেব তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন। তিনি আরো বুঝিলেন যে, হজরত তাহার ভক্তি বিশ্বাস ও আলাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। তাই তাহার প্রতি পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি করজোড়ে হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কদমে লুটিয়া পড়িলেন। এবং তাহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে কাতর নিবেদন জানাইলেন। হজরত তাহাকে ক্ষমা করিয়া ফয়েজ বর্ষণ করিলেন। কিছুদিন পর, পুনরায় হজরতের দরবারে আরজি করিলে, হজরত তাহাকে নিজ শিষ্যে গণ্য করিয়া নেন।

মৌলানা কাঞ্চন পুরী ছাহেব বলেন, হজরত ওফাত গ্রহণের পর এক রাত্রে তিনি হজরত আকদাছকে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি স্বপ্নে হজরত আকদাছের সহিত হস্ত "মোছাফেহা" করমর্দন করিতে উদ্যত হইলে হজরত তাহাকে বলিলেন, "তুমি হাজার বছর অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিলেও আমার হাত ধরিয়া "মোছাফেহা করিবার উপযুক্ত হইবেনা"। ইহা শ্রবণে তিনি হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিলেন, "হুজুর কি কাজ করিলে উপযুক্ততা অর্জন করিতে পারিব!" হজরত তাহাকে একটি দোয়া শিখাইয়া দিয়া বলিলেন "ইহা পড়িতে থাক। তুমি যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে"। স্বপ্নে ইহা পড়িতে পড়িতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার হৃদয়ে এক আবেগ উদয় হইল। কি ব্যাপার। হজরতের সঙ্গে 'মোছাফেহা" করিতে পারিলেন না! হজরত ইহজগতে বর্তমান থাকিতেও তাঁহার কদমবুচি করিতে দেন নাই। আমার মত হতভাগা আর কে আছে! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হজরত তো তাহাকে আশা দিয়াছিলেন, "আভী নেহী। আয়েন্দামে আরজু পুরা হোগা"। এই পবিত্র বাণীতো পুরা হইলনা। তিনিও ইহজগতে নাই। কি হইবে!

হঠাৎ এক রাত্রে হজরতকে তিনি আবার স্বপ্নে দেখিলেন। দেখিতেছেন, তিনি হজরতের সামনে দাড়াইয়া আছেন। এবং হজরত তাহাকে যথারীতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোম কওন হো?" তিনি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "হুজুর! গোলাম আবদুল আজিজ"। হজরত তাহার নিকট জানিতে চাহিলেন "কেয়া! তোম অহী আবদুল আজিজ হো জিছনে হামারা কান

বাঁধহা হ্যায়?” এই বাণী শ্রবণ করিতেই তিনি হজরতের পবিত্র চরণে পড়িয়া কদমবুচি করিতে লাগিলেন। এবং হজরত বলিতে লাগিলেন “মই হাসরমে পহেলা কহোঙ্গা – লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্”। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তিনি জাগ্রত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। নিরাশার শূন্য ময়দানে তাহার আশাপুষ্প প্রস্ফুটিত দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দলহরী বহিয়া চলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হজরত কেন বলিলেন যে “কেয়া তোম অহি আবদুল আজিজ হো যিছনে হামারা কান বাঁধহা হ্যায়! কোন বেয়াদপী হইল কী!” শেষে স্থির করিলেন যে, ইহা পীর মুরিদের মধ্যে যে সুদৃঢ় নেছবত প্রেম সম্পর্ক হজরত তাহার কথাই বলিয়াছেন। মুরিদের যাবতীয় অভাব অভিযোগ পীর না শুনিয়া পারেন না। পীরের কান মুরিদের সাথেই বাঁধা থাকে।

তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, রূপসা নিবাসী চৌধুরী ছাহেব সম্বন্ধে হজরত কি ভবিষ্যত বাণী করিয়া গেলেন, তাহাতো এখনও তাহার বুঝে আসিলনা। হজরতের পরলোকগমনের সুদীর্ঘ চারি বৎসর পর, ঢাকায় এক জনসভায় শুনিতে পাইলেন যে, জনাব চৌধুরী আবদুচ্ছালাম ছাহেব তাহার বক্তৃতায় বলিতেছেন, আহাম্মদ গাজী চৌধুরী ছাহেবকে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এমনি এক কূপে নিক্ষেপ করিয়াছেন যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা উদ্ধার না করিলে, তাহার আর উপায় নাই। ইহা শুনিয়া হজরতের ভবিষ্যত বাণীর প্রতি তাহার খেয়াল হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, চৌধুরী ছাহেব নিজ মুখে বলিয়াছেন যে তাহার কোন ভাই নাই। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যাহাকে তাহার বিমাতা সহ বহুদিন পূর্বে তাহার পিতা স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ ঔরস জাত সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বর্তমানে উপযুক্ত হইয়া আহাম্মদ গাজী চৌধুরী ছাহেবের কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের প্ররোচনায় ও সহায়তায় মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী ছাহেবের উত্তরাধিকারী সূত্রে মালীকানা দাবী করিয়া আদালতে এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আহাম্মদ গাজী চৌধুরী ছাহেব বেকায়দায় পড়িয়াছেন। তাহাকে উত্তরাধীকারীত্ব হইতে এড়াইয়া যাওয়ার মত উপায় পাইতেছেন

না। এই সংবাদ পাইয়া মৌলভী ছাহেব অতি সত্বর চৌধুরী আহাম্মদ গাজী ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাকে হজরতের পূর্বোক্ত ভবিষ্যত বানীর কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহাতে তিনি "ছাহেবে কশ্‌ফ" দূরদর্শী হজরতের কৃপাদৃষ্টি এবং আশীর্বাদে এই কূপতুল্য সঙ্কটময় মোকদ্দমার কবল হইতে আল্লাহের অনুগ্রহে জয়ী হইবেন বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন। হজরতের প্রতি তাহার ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বাড়ীয়া গেল। তিনি মৌলানা কাঞ্চনপুরী ছাহেবকে নানা প্রকার উপঢৌকনাদি সহ হজরতের পবিত্র দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি হজরতের দরবারে আসিয়া দোয়া প্রার্থনা জানাইলেন। কিছুদিন পর চৌধুরী ছাহেবের উক্ত বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা বাধ্য হইয়া মোকদ্দমা আপোষ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিছুদিন পর বৈমাত্রেয়-ভ্রাতাটি হঠাৎ ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। ফলে খোদার লীলায় চৌধুরী ছাহেব পূর্ণাকারে জয়ী সাব্যস্ত হইলেন। এইভাবে হজরত আকদাছ তাহার ভক্ত অনুরক্তদের নানা বিপদাপদে উদ্ধার ও জয়যুক্ত করেন। সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার নজরে একটি শষ্যকণা সাদৃশ।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

মহাজেরে মক্কীর ছালামের উত্তরদানে অলৌকিক কেরামত প্রদর্শন ও ছালাম প্রেরণ

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত নেয়াজপুর নিবাসী হাফেজ আহম্মদ উল্লাহ্ ছাহেব বর্ণনা করেন যে তাহার নিজ গ্রাম নিবাসী হাজি আমিরুদ্দিন ছাহেব জৈনপুরী মৌলানা ছাহেবের মুরিদ ছিলেন। তিনি মক্কাশরীফ হজ্ব করিবার কালে মহাজেরে মক্কী "ছাহেবে দালায়েল" অলিয়ে কামেল সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ জনাব মৌলানা আবদুল হক ছাহেবের সাহচর্য অর্জনে তাহার ফয়েজ অনুগ্রহ গ্রহণে সমর্থ হন। বিদায় কালে মক্কী ছাহেব তাহাকে আদেশ দিলেন, আপনি দেশে ফিরিয়া গাউছুল আজম হজরত মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারী ছাহেবের খেদমতে যাইয়া তাঁহাকে আমার আন্তরিক ভক্তি ও ছালাম পৌঁছাইবেন। উক্ত হাজী ছাহেব হজরতের বেলায়েতে অবিশ্বাসী ছিলেন। হজরতের উপর মক্কী ছাহেবের ভক্তি দেখিয়া তিনিও কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিলেন। অতঃপর বাড়ীতে আসিয়া মক্কী ছাহেবের নির্দেশ পালনে ছালাম পৌঁছাইবার মানসে তিনি হজরত ছাহেব কেবলার খেদমতে রওয়ানা হইলেন। তিনি হজরত ছাহেব কেবলার দরবারে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পূর্ব হইতেই হজরত বার বার "ওয়া-লাইকুমচ্ছালাম" উচ্চস্বরে উল্লেখ করিতেছিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ হজরত কাহার ছালামের উত্তর দান করিতেছেন–না বুঝিয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর হাজি আমিরুদ্দিন ছাহেব দরবারে উপস্থিত হইলেন। হজরত আকদাছ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বার বার "ওয়া-লাইকুমচ্ছালাম" "ওয়া-লাইকুমচ্ছালাম" বলিতে লাগিলেন। হাজি ছাহেব, মক্কী ছাহেবের ছালাম

পেশ করার কোন সুযোগই পাইতেছেন না। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন কি করিয়া মক্কী ছাহেবের জিম্মাদারী আদায় করা যায়। এক সময় হজরত তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি যখন আমার দোস্তের ছালাম নিয়া আসিয়াছেন, তখন আমার ছালামও তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। তথায় "শাহ্ কুলজাম" কেও এই চারি আনা পয়সা দিবেন। আমি তাহার নিকট হইতে চারি আনা পয়সা নিয়াছিলাম; এই বলিয়া তাহাকে একখানা চৌ-আনি হাতে দিয়া কোন প্রকার প্রতি উত্তরের সুযোগ না দিয়া বিদায় দিলেন। হাজি ছাহেব কোন প্রকার প্রতি উত্তর করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাড়ীর পথ ধরিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, মক্কী ছাহেব ও হজরত মাইজভাণ্ডারী উভয়েই আল্লাহের মহান অলি আল্লাহ্। তাহার ভুল সংশোধন করিবার জন্যই হয়তো মক্কী ছাহেব তাহাকে মাইজভাণ্ডার পাঠাইয়াছেন।

তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে আবার কোন্ জিম্মাদারীতে আটকাইয়া পড়িলেন। তিনি হজ্ব করিয়া আসিয়াছেন। কি করিয়া মক্কী ছাহেবের নিকট ছালাম পৌঁছাইবেন! শাহ্ কুলজাম কে, কোথায় তাহার দেখা পাইবেন। এই মহান দায়িত্ব নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা পালন করাইবেন। না হয়তো একজন ছাহেবে কশ্‌ফ অলি আল্লাহ্ তাহাকে এই গুরু দায়িত্ব দিবেন না। চিন্তিত মনে তিনি কাল যাপন করিতেছেন। একদা ১৬ই রমজান শুক্রবার জুমার নামায সমাপনান্তে তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় তাহার নিজ গ্রাম নিবাসী একজন বৃদ্ধ ধনীলোক তাহাকে ছালাম দিয়া হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,–"হাজি ছাহেব আমিতো আপনার খোজে আছি। আমি এইবার হজ্ব করিবার নিয়ত করিয়াছি। সঙ্গে আপনাকে নেওয়ার আশা করিয়াছি। আপনার যাতায়াতের এবং আপনার পারিবারিক সমস্ত খরচ আমরা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত–আমি বহন করিব।" এই বলিয়া তিনি তাহার হাতে পনরটি টাকা দিয়া আবশ্যকীয়–খরচাদি করিতে বলিলেন। এবং হজ্ব যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। হজরতের এই অলৌকিকতা ও দূরদর্শীতা দেখিয়া হজরতের প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ জন্মিয়া গেল।

অতঃপর উভয়ে প্রস্তুত হইয়া যথাসময়ে হজ্বে রওয়ানা হইলেন, মক্কাশরীফ পৌঁছিয়া প্রথমে তিনি হজরতের ছালাম মক্কি ছাহেবের খেদমতে পৌঁছাইয়া দিলেন। মক্কি ছাহেব ছালামের উত্তরে হজরতের অনেক যশোকীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা হজব্রত সমাপন করিলেন কিন্তু হাজি ছাহেব শাহ্ কুলজামের কোথাও দেখা পাইলেন না। অনেক খোজ করিলেন। কাহারো কাছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা অবাক বিস্ময়ে বলেন যে শাহ্ কুলজামের দেখা পাওয়া তো সহজসাধ্য নহে। তিনি তো আর আমাদের আপনাদের মত নহেন। অতঃপর তাঁহারা বাড়ীর পথে জিদ্দাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহার মনে শান্তি নাই। হজরতের চালানী জিম্মাদারী এখনও আদায় করিতে পারেন নাই। তাহার মনে কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যে, এতবড় জিম্মাদারী আদায় করিতে যখন সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় উহাও আদায় করিতে উপায় করিয়া দিবেন। তাহারা জাহাজে উঠিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পরে এক জায়গায় দেখিলেন, চতুর্দিক হইতে লোকেরা পানিতে পয়সা নিক্ষেপ করিতেছে। সন্ধানে জানিতে পারিলেন ইহা জলাধিপতি শাহ্ কুলজামের জায়গা বলিয়া খ্যাত জায়গা। হাজি ছাহেব মনোযোগের সহিত উহা দেখিতেছেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একজন অতি সুন্দর দীর্ঘকায় লোক। তাঁহার পা বোটের গর্ভে এবং মাথা তাহার বরাবরে জাহাজের কিছু বাহিরে, তাহার সামনে দাড়াইয়া আছেন। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিতেছেন, আপনার নিকট আমার চারি আনা পয়সা আছে, দিয়া দিন। হাজি ছাহেব অবস্থা বুঝিয়া অতি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে হজরতের দেওয়া চৌ-আনীখানা বাহির করিয়া দিয়া দিলেন। শাহ্ কুলজাম পয়সা হাতে লইয়া 'মারহাবা গাউছুল আজম শাহ্ আহমদ উল্লাহ্" বলিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি তাহার সাথী হাজি ছাহেবকেও উহা দেখাইবার সময় পাইলেন না। হজরতের কৃপায় তিনি শাহ্ কুলজামের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমানত আদায়ে আল্লাহ্ তা'লার শোকরিয়া আদায় করিলেন। তিনি বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, জলাধিপতি শাহ্ কুলজামের সহিত হজরতের কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক! হজরত আকদাছকে গাউছুল আজম বলিয়া চিনিতে তাহার আর বাকী রহিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

(১) হজরতের ছোহবতে জৈনপুরী মৌলানা শাহাবুদ্দিন ছাহেব

জৈনপুর নিবাসী পীরে তরীকত হজরত মৌলানা কেরামত আলী ছাহেবের বংশধর মৌলানা পীর শাহাবুদ্দিন ছাহেব হজরত আকদাছকে ভক্তি করিতেন। একদিন তিনি হজরতের খেদমতে হাজির হইলেন। হজরত তখন তাঁহাদের সামনের পুকুরের পাড় দিয়া উত্তর দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। মৌলানা শাহাবুদ্দিন, হজরতের এক ভক্ত খায়েজ আহমদ এবং আরো অনেক লোকজন হজরতের পিছনে পিছনে চলিয়াছিলেন। হজরত হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাই খাজা ছাহেব নাকি!" খায়েজ আহাম্মদ উত্তর করিলেন "হুজুর আমি আপনার গোলাম খায়েজ আহাম্মদ।" এমতাবস্থায় মৌলানা শাহাবুদ্দিন ছাহেব মনে মনে ভাবিতে ছিলেন, তিনি এত বড় পীর খান্দানীর মৌলানা হইয়া হজরতের পিছন পিছন হাটিলে লোকে না জানি কি বলে। ঠিক সেই সময় হজরত হঠাৎ পিছন ফিরিয়া খায়েজ আহমদের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, মিঞা! শাহাবুদ্দিন ছাহেবের চৌগাটি আপনাকে দিলে ভাল হইবে না? ইহা শ্রবণ মাত্র মৌলানা ছাহেব নিজ কল্পনার কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া গেলেন। না জানি হজরত তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে তাহার এলেম ও বুজর্গি অন্যকে অর্পন করিয়া দেন! এই ভয়ে অতি বিনয় সহকারে হজরতের খেদমতে আবেদন জানাইলেন, "হুজুর আমি অতি গরীব লোক। আমার থেকে দেওয়া যাইতে পারে, এমন কিছুই নাই। আমি হুজুরের দরবারে ভিক্ষার প্রত্যাশী। আপনার পবিত্র দরবারে "ছায়েল" মেহমান আসিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করুন"। হজরত আবার হাটিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া

আসিলেন। উক্ত খায়েজ আহমদ ছাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, "সেই সময় আমার ও মৌলানা শাহাবুদ্দিন ছাহেবের অবস্থা এমন 'জজব' ও প্রেরণাপূর্ণ হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনার অতীত"। মৌলানা শাহাবুদ্দিন ছাহেব হজরতের দরবারে বিভিন্ন প্রকৃতির ও ভাবধারার লোকজন দেখিয়া একদিন হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হুজুর আপনার দরবারে বহু "মসরবের মানুষ দেখিতেছি"। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "মিঞা! যিছ দোকান মে হারচিজ রাহতা-হ্যায়, ওয়ে আচ্ছা হ্যায়"।

(২) হজরতের দরবারে জৈনপুরীর মৌলানা হাফেজ আহমদ ছাহেব

হজরতের দরবারে জৈনপুরীর সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মৌলানা হাফেজ আহমদ ছাহেব একদা উপস্থিত হন। তিনি অতি সুন্দরভাবে ওয়ায়েজ নছিহত করিতেন। দেশবাসীর অনুরোধে জনাব মৌলভী শাহ্ ছৈয়দ ফয়েজুল হক ছাহেব তাঁহাকে ওয়ায়েজের জন্য অনুরোধ করিলেন; হজরতের দায়েরা শরীফের সামনে মাহফিলের এন্তেজাম করা হইল। মৌলানা ছাহেব হজরতের কাছে ওয়ায়েজ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হজরত তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি আরো প্রার্থনা জানাইলেন যে হজরত আকদাছ যেন সভাপতি রূপে তাহার পার্শ্বে থাকেন। হজরত তাহাতেও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। জৈনপুরী সাহেব হজরতের নির্দেশক্রমে ওয়ায়েজ আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, সেই দিন মৌলানা ছাহেবের ওয়ায়েজ এত আকর্ষণীয় হইয়াছিল যে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। ওয়ায়েজ করাকালিন তাহার যে প্রেরণাপূর্ণ অজদী অবস্থা আসিয়াছিল, তাহা আর কোন দিন পরিদৃষ্ট হয় নাই। হজরত তাহার ওয়ায়েজে খুসি হইয়া তাহাকে দোয়া করিলেন। এবং নির্দেশ দিলেন, "মিঞা মৌলানা ছাহেব কাঁটেছে ঝাড় কো কাট করকে গোলাপ আওর রায়হানকা ঝাড় লাগা দিজিয়ে।" সেই দিন হইতে মৌলানা ছাহেবের ওয়ায়েজ নছিহতে অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি দেখা দেয়। মানুষ তাহার বক্তৃতায় মুগ্ধ না হইয়া পরিতনা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

(১) রেশমী পরিচ্ছদ মোহছনীয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

চট্টগ্রাম মোহছনীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মৌলানা আবদুল মোনায়েম ছাহেব একদা হজরতের খেদমতে আসিয়া "ওহাদতে অজুদ" খোদাতত্ত্ব মছায়েলা জানিতে হজরতের নিকট প্রশ্ন করিলেন। ইহাতে হজরত অত্যন্ত "জালাল" হইয়া উঠেন।

হজরত আকদাছ একটি লাঠি হাতে লইয়া তাহাকে তাড়াইতে উদ্যত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "রেশমী কাপড় পরিয়া আমার কাছে আবার খোদাতত্ত্ব জানিতে আসিয়াছ"। ইহাতে মৌলানা ছাহেব অতি ভয়ে দ্রুত পলাইয়া গেলেন। সম্মুখস্থ মসজিদের কাছে যাইয়া তাহার রেশমী জামা কাপড় বদলাইয়া লইলেন। তবুও তিনি অতি ভয়ে আদবের সহিত এলমের গর্ব ত্যাগ করিয়া বিনয় সহকারে পুনরায় হজরতের খেদমতে হাজির হইলেন। এইবার হজরত তাহাকে তাড়াইলেন না এবং অতি সাদরে খেদমতে বসিতে আদেশ দিলেন। তারপর তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রকার তৌহিদ তত্ত্ব – আলাপ আলোচনার বিনিময়ে প্রশ্ন ও জওয়াব আরম্ভ হইল। হজরতের আধ্যাত্মিক আলোকে তাহার দেহ ও আত্মা আলোকিত হইয়া গেল। এমন কি তাহার কলব ও সমস্ত রগরেশা পর্যন্ত আলোড়িত ও জারী হইয়া গেল। হজরতের এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দর্শনে মৌলানা ছাহেব হজরতের অন্যতম ভক্তে গণ্য হইলেন।

(২) তবার্‌রোক প্রদানে–সন্তান দান

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ছিপাতলী নিবাসী মৌলানা হাশমত আলী ছাহেব হুগলী গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে হেড মৌলভীর কাজ করিতেন। তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। অনেক আউলিয়া বুজুর্গের দরবারে যাইয়া তিনি খোদার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার তকদির ফলে নাই। তিনি হজরত আকদাছের অনেক অলৌকিক ঘটনা জন সমাজে শুনিয়া একদিন বৃদ্ধ বয়সে শেষ তদবিরে তকদীর পরীক্ষা করিতে হজরতের দরবারে আসিলেন। তিনি হজরতের সামনে হাজির হইয়া তাঁহাকে কিছু বলার পূর্বেই হজরত তাহার হাতে দুইখানা বাতাসা দিয়া বলিলেন, "তোমকো দো ফুল দিয়া, এক ছা'দী দোছরে নেজামী।" অতঃপর বিদায় লইয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। হজরত প্রদত্ত বাতাসা দুইখানা তাহার স্ত্রীকে খাওয়াইয়া দিলেন।

ইহার চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহার দুইজন ছেলের জন্ম হইল। একজনের নাম রাখা হয় আবুল হায়াত এবং অপর জনের নাম আবু তাহের। একদিন মৌলানা হাসমত আলী ছাহেব বর্ণনা করেন,–"আমি তাঁহার এই অপূর্ব অলৌকিক কেরামত ও খোদাদাদ শক্তি দেখিয়া অপরিসীম আনন্দিত হইলাম। এবং খোদার দরবারে প্রত্যহ শোকরিয়া আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহার এই উছিলায় পরম দয়াময় খোদাতা'য়ালা আমার আশা পূর্ণ করেন। হজরতের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি ও প্রেরণা আসে। আমি ক্রমে তাঁহার ভক্তশিষ্যে পরিণত হইয়া গেলাম।"

বর্তমানে ছেলে দুইজন, একজন ইছলামী মাদ্রাসায় ও অন্যজন ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার দোয়ায় একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও অন্যজন কলেজে প্রফেসারী করেন।

(৩) কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসার মৌলানা জনাব ছফি উল্লাহ্ ছাহেব মারফত হজরতের পরিচয়

কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মৌলানা কুতবে জমান শাহছুফী জনাব ছফি উল্লাহ্ ছাহেবের সঙ্গে হজরতের আধ্যাত্মিক পরিচয় ছিল। তিনি হজরত ছাহেব হইতে বাতেনী ফয়েজ অর্জন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন। একদিন চট্টগ্রামের নদীমপুর নিবাসী এক্সাইজ ইনসপেক্টর মৌলভী মোহাম্মদ ইউনুচ ছাহেব ও নানুপুর নিবাসী ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু তাহের মিঞা উক্ত মৌলানা ছফি উল্লাহ্ ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি তাহাদের বাড়ী ও বাসস্থানের পরিচয় চাহিলেন। তাহারা উত্তর করিলেন, "হুজুর আমাদের বাড়ী চট্টগ্রাম"। তখন মৌলানা ছাহেব চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা গাউছুল আজম হজরত মৌলানা শাহ্ ছুফী আহমদ উল্লাহ্‌কে চিনেন?" উত্তরে তাহারা বলিলেন "হুজুর চিনি"। তখন মৌলানা ছাহেব অতি জালালী অবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "মিঞা কি চিন! কিরূপ চিন? ছয়শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার মত এইরূপ অলি আল্লাহ্ পৃথিবীতে আসেন নাই"। হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায় হজরত পীরানে পীর দস্তগীর (রঃ) কে লক্ষ্য করিয়া তিনি ছয়শত বৎসর বলিয়াছিলেন। তাহার নিকট হজরত আকদাছ গাউছুল আজম রূপে পরিচিত ছিলেন।

(৪) মেয়েলোকের প্রতি হজরতের ফয়েজ রহমত এবং বেহেস্ত ও মনকির নকীর সম্পর্কে তাহার তাছার্রোফাত

(ক) হজরত আকদাছের ভ্রাতুস্পুত্র জনাব ছৈয়দ গোলাম ছোবহান ছাহেবের স্ত্রী ছৈয়দা রাবেয়া খাতুন হজরত ছাহেবের মুরিদ ছিলেন। তিনি জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেবের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আকদাছ তাহাকে একটা জিকির শিখাইয়া দিয়াছিলেন। নামাযের পর তিনি উহা পড়িতেন। উক্ত জিকির পড়ার সময় তাহার কল্‌বে জজব হইত। তাহার স্বামী উহা দর্শনে একদিন "মেয়ে লোকের

আবার ফকিরী কি” বলিয়া তাহাকে প্রহার করেন। সেই রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে উক্ত রাবেয়া খাতুন হজরত কেবলার খেদমতে আসিয়া ভাবাবেগে কাঁদিয়া ফেলেন। হজরত তাহাকে খুববেশী স্নেহ করিতেন। তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং মাথায় রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসায় সমস্ত জ্ঞাত হইলেন। তখন তাঁহার জালালী অবস্থা উপস্থিত হয়। জনাব ছৈয়দ গোলাম ছোবহান তখন নিদ্রিত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিতেছিলেন যেন হজরত আকদাছ লাঠি হাতে তাহাকে মারিতে চাহিতেছেন। তিনি জাগরিত হইয়া তাড়াতাড়ি হজরতের খেদমতে চলিয়া আসেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানান যে তিনি ভবিষ্যতে আর কোন দিন রাবেয়া খাতুনের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবেন না।

(খ) অপর একদিন ছৈয়দা রাবেয়া খাতুন হজরত আকদাছের নিকট প্রশ্ন করিলেন, “বাবা! মনকির নকির কবরে ছওয়াল জওয়াব করিবার সময় আমি কি বলিব!” হজরত বলিলেন, “তুমি তোমাকে দেওয়া জিকিরটি খেয়াল রাখিও।” রাবেয়া খাতুন বলিলেন, “বাবা! তাহা আমি পারিবনা।” হজরত বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি আমাকে স্মরণ করিও।” রাবেয়া বলিলেন, “না বাবা আমি অতসব পারিবনা আমার খেয়াল থাকিবেনা।” হজরত হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন “আচ্ছা মা তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। আমিই সব বলিব।”

(গ) হজরতের ওফাতের প্রায় ছয় মাসের মধ্যের একটি ঘটনা। উক্ত সৈয়দা রাবেয়া খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র ছৈয়দ সুলতান আহমদ মারা যায়। কয়েকদিন পর ছৈয়দা রাবেয়া খাতুন হজরত আকদাছের রওজা পাকে গিয়া খুব বেশী কান্নাকাটি করেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বিভোরচিত্তে তথায় বসিয়া থাকেন। হজরত আকদাছকে তিনি বিভোর অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। হজরত তাহাকে বলিতেছেন, “রাবেয়া! তোমার সুলতানকে দেখাইলে আর কাঁদিবেনা তো”! রাবেয়া খাতুন বলিলেন যে, তিনি আর কাঁদিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার সামনে একখানা মনোরম প্রশস্থ এবং উন্মুক্ত বাগান দেখিতে পাইলেন। তথায় সু-স্নিগ্ধ নহরাদি প্রবাহিত এবং নানা রকম ফল ফুলের বৃক্ষরাজি পরিশোভিত দেখিতে পান। সেই মনোরম বাগানের মধ্যে তিনি

তাহার ছেলে সুলতান আহমদকে আরো অনেক ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন।

তিনি আরো বর্ণনা করেন, হজরত তাহাকে বলিয়াছিলেন, "রাবেয়া তুমি আমার দেলামহ্নাকে যত্ন করিও। আমি তোমাকে দেখিব"। তিনি শেষ পর্যন্ত জনাব ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেবের তখন সন্তান সন্ততি হইয়াছে, তখনও তাঁহাকে কোলে বসিতে বাধ্য করিতেন। বলিতেন, "হজরতের নির্দেশ আমাকে পালন করিতে হইবে"। জনাব ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব বাধ্য হইয়া মাটিতে হাতের ভার রাখিয়া তাহার কোলে বসিতেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

হজরত আকদাছের বেলায়েত প্রাপ্ত প্রধান খলিফাদের নাম

দিকদিগান্তর হইতে তৃষ্ণাতুর পথিকের মত অগনিত ধর্মীয় মোজাহেদ আলেমগণ খোদা অন্বেষণ পথে খোদায়ী প্রেম প্রেরণাসুধা অর্জনে ভূবনব্যাপী মহাসাগর রূপী বিশ্বগাউছ হজরত সকাশে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ধাইয়া আসিতে লাগিলেন। এবং হজরত তাঁহার প্রেম জোয়ারে ভক্ত অনুরক্ত মোজাহেদ আলেম বাহিনীকে প্লাবিত ও দেশ দেশান্তরে প্রসারিত করিয়া বিশ্বসৃষ্টির তৃষ্ণানিবারণে বিশ্বকে প্রেম উম্মাদনায় সজীব করিয়া তুলিতে লাগিলেন। কত নির্জন অরণ্যে তিনি বাজার বসাইলেন, কত নিধনকে ধনী করিলেন, কত মানহীনে সম্মানীত করিলেন তাহার ইয়ত্বা নাই।

তাঁহার পবিত্র করুণা ধারা অর্জনে যাহারা ধনী হইয়া খোদা অন্বেষণে অলিআল্লাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) অর্জন করিয়া সুপরিচিত "হাদীয়ে কামেল" হইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান করা কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংগৃহীত তথ্যগুলিও এই সাধারণ ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই নমুনা স্বরূপ কয়েক জন সুপরিচিত স্মৃতিধারী অলি আল্লাহের পবিত্র নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী অছিয়র রহমান ছাহেব (রঃ)
চরণ দ্বীপ। বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(২) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী কাজী আছদ আলী ছাহেব (রঃ)
আহল্লা মৌজা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(৩) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ ছাহেব (রঃ)
খিতাবচর, চট্টগ্রাম।

(৪) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী আমিরুজ্জমান ছাহেব (রঃ)
পটিয়া-চট্টগ্রাম।

(৫) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী আবদুর রজ্জাক ছাহেব প্রকাশ হাকিম শাহ (রঃ) সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

(৬) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী (রঃ)
চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(৭) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী মজিবুল্লাহ ছাহেব (কঃ),
রাউজান, চট্টগ্রাম।

(৮) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী খলিলুর রহমান ছাহেব (রঃ)
রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

(৯) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী রাহাতুল্লাহ ছাহেব (রঃ)
রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

(১০) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী মোহছেন আলী (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

(১১) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আমানুল্লাহ (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

(১২) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ফরিদুজ্জমান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

(১৩) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আফাজুদ্দিন (রঃ), কালারমার ছড়া, মহেশখালী।

(১৪) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ),
[মণ্ডল] আরকান, বার্মা।

(১৫) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী মিঞা হোছাইন (রঃ), খেনুদি, বার্মা।

(১৬) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল হামিদ (রঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

(১৭) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), সোনাপুর, নোয়াখালী।

(১৮) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।

(১৯) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী রেজওয়ান উদ্দিন (রঃ),
সাহ নগর, চট্টগ্রাম।

(২০) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী মহব্বত আলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

(২১) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী রহিম উল্লাহ্ (রঃ), রাউজান, চট্টগ্রাম।

(২২) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী হাফেজ কারী, মোহাদ্দেছ ছৈয়দ তফাজুল হোছাইন ছাহেব (রঃ), মির্জাপুর, চট্টগ্রাম।

(২৩) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী মুফ্তী ছৈয়দ আমিনুল হক (রঃ) ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

(২৪) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী করিমবক্স প্রকাশ বজলুল করিম (রঃ) মন্দকিনী, চট্টগ্রাম।

(২৫) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ ইউসুফ আলী ছাহেব (রঃ),
হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(২৬) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল কুদ্দুচ (রঃ),
হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(২৭) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী এয়াকুব গাজী (রঃ)
শ্রীপুর, নোয়াখালী।

(২৮) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী নজির আহাম্মদ প্রকাশ নজির শাহ্ (রঃ),
সীতাকুণ্ড, মাজার-ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

(২৯) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী হাছি মিঞা (রঃ) চাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

(৩০) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী এবাদুল্লাহ শাহ্ (রঃ),
হারবাঙ্গ চকরিয়া, চট্টগ্রাম।

(৩১) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী জাফর আহাম্মদ প্রকাশ মামু ফকীর (রঃ),
রেঙ্গুন, বার্মা।

(৩২) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী বাচা মিঞা ফকীর (রঃ),
কাউখালী, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

(৩৩) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী বাচা শাহ (রঃ) ফতেহপুর,
হাটহাজারী।

(৩৪) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী শাহ ওয়ালী মস্তান (রঃ), পার্বত্য চট্টগ্রাম।
(৩৫) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আবদুল আজিজ (রঃ), আজিম নগর, চট্টগ্রাম।
(৩৬) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী আবদুর রহমান ছাহেব (রঃ), ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।
(৩৭) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী আবদুল জলিল প্রকাশ বালুশাহ (রঃ), ছাদেক নগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
(৩৮) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী পানীশাহ (রঃ), ছাদেক নগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
(৩৯) জনাব মৌলভী শাহ ছুফী মতিয়র রহমান শাহ (রঃ), পূর্ব ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।
(৪০) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী এয়াকুব নূরী (রঃ), নোয়াখালী।
(৪১) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।
(৪২) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আসরাফ আলী (রঃ), দুখাইয়া, চান্দপুর।
(৪৩) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল আজিজ (রঃ), ফেনী, নোয়াখালী।
(৪৪) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী আলী আজম (রঃ) মণ্ডল, নোয়াখালী।
(৪৫) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল গফুর প্রকাশ কম্বলী শাহ্ (রঃ), মোহনপুর, ফরিদপুর।
(৪৬) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী গোলাম রহমান (রঃ), বরিশাল।
(৪৭) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আবদুল হাদী (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।
(৪৮) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুল গণি (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।
(৪৯) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী আবদুচ্ছালাম (রঃ), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।
(৫০) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী ছৈয়দ ফয়জুল হক ফানীফিল্লাহ, নিজপুত্র, মাইজভাণ্ডার।

(৫১) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল নিজ ভ্রাতুস্পুত্র, মাইজভাণ্ডার।

(৫২) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী কুতবে রব্বানী মাহবুবে ছোবহানী গাউছুল আজম বিল বেরাছত ছৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ), নিজ ভ্রাতুস্পুত্র।

যাহারা হজরত আকদাছ হইতে ফয়েজ এর্শাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার খলিফায়ে আজম জনাব "বাবাজান কেবলা হজরত মৌলানা শাহ্ ছুফী গাউছল আজম বিল বেরাছত ছৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) এর সাহচর্য্যতায় পূর্ণ কামালিয়ত অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী – রজব আলী (রঃ) সাকরাপুর, কুমিল্লা।

(২) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী জমিরুদ্দিন (রঃ) তিশনা, কুমিল্লা।

(৩) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী সিরাজুল হক (রঃ) নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম।

(৪) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী অলিউল্লাহ ছাহেব (রঃ), রাজাপুর, কুমিল্লা।

(৫) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী নূর বক্স ছাহেব (রঃ), গোয়ালিয়া, নোয়াখালী।

(৬) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী মোহাম্মদ হোছাইন, ঢাকা।

(৭) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী আমিনুল্লাহ ছাহেব, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

(৮) জনাব মৌলভী শাহ্ ছুফী আবদুল্লাহ ছাহেব, বাঁশখালী।

বিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের জনসমাজে পরিচয়ে কেরামত

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলীর আত্মসমর্পনের দ্বারা স্বাধীন বেলায়েতের মূর্ত্তছবি হজরতের আধ্যাত্মিক তরিকত প্রভাবে সকল বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া দ্রুত প্রসার লাভ করিল। বাস্তব পক্ষে পরম আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় মনোনীত তরিকত প্রণালীর মোড় তাহাদের বদৌলতে যেন অগ্রগতির পথে ফিরাইয়া দিলেন। তাহাদের অনুসরণে ক্ষুদ্রজ্ঞানী মানবকুল অতিসহজে সত্যালোকের সন্ধান নিতে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারাই হইলেন সত্য ও অসত্যের অন্ধকার ও আলোকের সুপথ ও কুপথের সংগ্রামে হজরতের প্রথম সেনাবাহিনী। তাই পরম বন্ধু, আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমদপ্তরে বদর যুদ্ধের বীর সাহাবী মোজাহেদ শহীদ ও গাজী সেনানীর মত তাহাদের নাম নুরানী অক্ষরে সজ্জিত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেম অভিযানের ফলে লক্ষ লক্ষ পথহারা মানুষের পথের সন্ধান হইয়াছে। বিপথবাহী শত্রু আক্রান্ত মানবকুল মহা ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাই তো তাঁহারা মহান সম্রাটের গাজীতুল্য আলিশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন।

হজরত শুধু এলেমধারী আলেমবৃন্দকে প্রেম সম্পদ বিলাইতে আসেন নাই। অহঙ্কারী আলেমদের এলেম-গর্ব খর্ব করিয়া প্রেরণার জলে কেবল মাত্র তাহাদের স্নান করাইতেও আল্লাহ্ এই ভবে পাঠান নাই। তিনি বিশ্বসৃষ্টির রহমতধারী সকলের করুণা নিয়াই ত এই ধরণীতে পদার্পন করিয়াছেন; ভববাসীর যাবতীয় প্রাপ্য তাঁহারই প্রেমাগারে সঞ্চিত জমায়েত রহিয়াছে। যাহারা খোদাতত্ত্বে সর্বাঙ্গীন অন্ধ, যাহারা সংসার চক্রের মায়াজালে বন্দী

রহিয়াছে, ধনজনের মায়ামোহে বিভোর হইয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িয়াছে; অথচ মহান স্রষ্টার কথা, পরকালিন মুক্তির কথা তাহাদের হৃদয়ে মোটেই স্থান পায় নাই, তাহাদের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা নিতান্তই কর্তব্য। তাই তিনি প্রেমসুত্রের আকর্ষণে অগণিত ধনী গনী সুধীমণ্ডলীকে টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দমনীয় মহাশক্তির টানে তিষ্টিতে না পারিয়া–দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞান পিপাসু লোকেরা হজরতের পানে পতঙ্গের মত আসিয়া প্রেমপ্রজ্জ্বলিত প্রেরণার আগুনে দহিতে লাগিল।

একদা কুমিল্লা নিবাসী চিওড়া কাজিবাড়ীর নওয়াব মীর মোশারফ হোসাইন ছাহেব হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) দরবারে পাকে আসিয়া তাঁহার রুহানী প্রেরণা ফয়েজ লাভ করেন। একসময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে বাবাজান কেবলার রওজা মোবারকের ভিত্তি প্রস্তর দেওয়ার কালে বিরাট জলসায় নওয়াব ছাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বর্ণনা করেন যে, নায়েব আজিজ মিঞার মারফত প্রাপ্ত–হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) একখানা জুতা মোবারকের বদৌলতে তিনি অনেক সময় বড় বড় বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। উক্ত জুতা মোবারক তিনি প্রতিসপ্তাহে আতর মাখাইয়া রাখিতেন এবং সঙ্কটকালে হজরতের উছিলায় আল্লাহ্ তা'লা সমীপে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া সফলকাম হইতেন।

শেরে বাংলা মরহুম জনাব এ, কে, ফজলুল হক ছাহেব প্রথম ওকালতি পাশ করিয়া হজরত আকদাছের খেদমতে উপস্থিত হন। এবং উন্নতির জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি একদিন প্রকাশ্য জনসভায় বলেন যে, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও বাবা বোস্তামীর সুনজর যতদিন তাঁহার উপর বর্তমান থাকিবে ততদিন কোন শক্তিই তাঁহার মাথা নত করাইতে পারিবে না এবং তাঁহার জয় সুনিশ্চিত। তিনি তাঁহাদের সুনজর কামনা করেন।

খানবাহাদুর ফজলুল কাদেরের প্রতি পরীক্ষার হলে রহমত বর্ষণ

(১) চট্টগ্রামস্থিত চন্দনপুরা নিবাসী খান বাহাদুর ফজলুল কাদের ছাহেব সাবরেজিষ্ট্রারী পরীক্ষার প্রার্থী ছিলেন। তাঁহার সমপরীক্ষার্থীরা সকলেই তাহার অপেক্ষা জ্ঞানে ও মানে অত্যধিক উপযুক্ত ছিলেন। ইহাতে তিনি নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন। অত:পর একদিন তিনি হজরত আকদাছের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি সফলকাম হইতে পারেন। প্রায় সময় হজরত হাজতি লোকদিগকে তাহাদের নাম, পিতার নাম ও আসিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন। খান বাহাদুর ছাহেবকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, “হুজুর অধিনের নাম ফজলুল কাদের, পিতার নাম এমদাদ আলী দারোগা ছাহেব, বাড়ী চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম। হজরত তিনবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও তিনবার উত্তর দিলেন। অতঃপর হজরত নিম্নলিখিত ফারছি বয়াতটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন –

কাদেরা কুদরত তু দারী
হারছে খাহী আঁকুনী।
মুর্দারা জিন্দা তো সাজি
জিন্দারা বেজাঁ কুনী।।

তৎপর বলিলেন, “যাও মিঞা! দোয়া করিলাম”। খান বাহাদুর ছাহেব বলেন, “কিছুদিন গত হইল। পরীক্ষার তারিখে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হইলাম। অনেক লোকেই পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি নূতন হইলেও আমার নিকট পুরাতন মনে হইল। কে যেন আমার অন্তরে বসিয়া উহার উত্তর যোগাইতেছিলেন। আমি পুলকিত মনে লিখিতে লাগিলাম। হল হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। নিশ্চয় হজরত আমাকে খাস করিয়া দোয়া করিয়াছেন। নয়তো আমার পক্ষে এই প্রশ্নের জওয়াব লিখা সম্ভব হইতনা। তবুও মনে কেমন এক প্রকার ভয় হইতে লাগিল। কারণ যাহারা পরীক্ষা দিয়াছেন তাহারা সবাই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহারা নিশ্চয় আমার চেয়ে

ভাল লিখিয়াছেন। মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। সময় আসিল পরীক্ষার ফল বাহির হইল। শুনিতে পাইলাম আমিই প্রথম হইয়া পাশ করিয়াছি। আমার চাকুরী হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম; হুজুর-ই আমার একমাত্র উছিলা। আমি আনন্দের সহিত শুকরিয়া আদায় করিলাম! আমি প্রায় সময় তাঁহার খেদমতে হাজির হইতাম। তাঁহারই দোয়ার বরকতে খোদার রহমতে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি ইনসপেক্টর পদে বরিত হই"।

(২) সাব রেজিষ্ট্রারী পরীক্ষায় হজরতের রহমত বর্ষণ

ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর নিবাসী মৌলবী মফজলুর রহমান ছাহেব একদা বর্ণনা করেন, তিনি সাবরেজিষ্ট্রারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য হজরত আকদাছের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দোয়া প্রার্থনা করেন। হজরত যথারীতি নাম, পিতার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন। অতঃপর হজরত তাহার প্রতি একটু করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপে বলিলেন, "দোয়া করিলাম, চলিয়া যাও।" তিনি সুনামের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাবরেজিষ্ট্রার হইলেন। সেই অবধি তিনি হজরতের খেদমতে আসিতেন। অতি সম্মানের সহিত সুদীর্ঘকাল চাকুরী করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার পরে ইনসপেক্টর পদে উন্নীত হইয়া অবসর প্রাপ্ত হন। এইভাবে বহু লোক হজরতের দোয়ার জন্য দৈনিক তাঁহার দরবারে পাকে আসিতেন এবং খোদার রহমতে সফলকাম হইতেন।

হজরতের অনুগ্রহে আকরম আলী চৌধুরীর সন্তান লাভ

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত মিরশ্বরাই থানার হাইদকাঁন্দি নিবাসী জনাব আকরম আলী চৌধুরী ছাহেবের সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তিনি নানাবিধ চেষ্টায় বিফল হইয়া একদা হজরতের দরবারে প্রার্থনা জানাইলেন। সেই সময় একজন লোক হজরতের খেদমতে একখানা ইক্ষু হাদিয়া লইয়া হাজির হইল। তিনি ইক্ষুখানা লইয়া নিজ পায়ের নীচে দিয়া তিন টুকরা করিয়া লইলেন। আগা ও গোড়ার দুই টুকরা দুইজনকে দিয়া

মধ্যের টুকরা আকরম আলী চৌধুরী ছাহেবকে দিলেন। এবং বলিলেন, "যাও মিঞা মধ্যেরটি দিলাম। খাইয়া ফেল। আমি দোয়া করিলাম"। মধ্যের টুকরা অর্পন করার রহস্য তিনি বুঝিলেন না। চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। বিবিকে ইক্ষুখানা দিয়া হজরতের অর্পিত তবার্‌রোক খাইতে বলিলেন। কিছুদিন গত হইলে তাহার এক সন্তান হইল। দেশীয় প্রথা অনুযায়ী মেয়েলোকেরা তাহার কপালে সোনাচান্দির দাগ বসাইল। গ্রাম্য মেয়ে লোকেরা ইহাকে তৎকালিন মৃত্যুবারন পদ্ধতী বলিয়া মনে করিত। চৌধুরী ছাহেবের মনতো ভাঙ্গা। ছেলে বাঁচিবার আশাতো নাই। তবু-ও হজরতের দোয়ায় আশ্বস্ত হইয়া সাধারণ খরচে ছেলের নাম রাখিলেন, মোহাম্মদ ইছমাইল। ইছমাইল নিরাপদে বড় হইতে লাগিল। ইহার পর পর আরো দুইটি ছেলে জন্ম হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, কেন হজরত তাহাকে ইক্ষুর মধ্যের টুকরা দিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি পূর্ণ আশ্বস্ত হইলেন যে খোদার রহমতে ইছমাইল দীর্ঘায়ু হইবে। হজরতই তাহাকে উক্ত সন্তান দান করিয়াছেন। তাহার বিবি ছাহেবও হজরতের উক্ত ঘটনা শুনিয়া খোদার নিকট শুকরিয়া আদায় করিলেন। তাঁহারা উভয়ে হজরতের খেদমতে আসিতেন। ইছমাইল যখন কুড়ি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তাহার মাতাপিতা তাহাকে হজরতের এই ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন "তুমি আমাদের হজরতের অর্পিত একমাত্র সন্তান। তোমার উপরই খোদার কৃপায় আমাদের সুখশান্তির আশা। তুমি হজরতের পবিত্র খেদমতে হাজির হইয়া দোয়া হাছিল কর"। চৌধুরী ইছমাইল ছাহেব বলেন যে, মাতাপিতার এই আদেশ পালনে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহিত ও আনন্দিত মনে হজরতের ওফাতের ছয় বৎসর পূর্বে তাঁহার খেদমতে হাজির হন। এযাবত প্রায় সময় প্রতি ওরছ শরীফেই তিনি উপস্থিত হন। মির্জাপুরী হাফেজ ছাহেবও ইহার কিছুদিন পরে তাহাদের উপস্থিতিতে হজরতের খেদমতে হাজির হন। সেই সময় পটিয়ার কাঞ্চননগরী মৌলভী আহমদ ছফা হুজুরের খাদেম ছিলেন এবং হজরত বাবাজান কেবলা মৌলানা ছৈয়দ গোলাম রহমান ছাহেব (কঃ) ছায়েরে রত

ছিলেন। মৌলবী মিঞা হোছেন ও ছৈয়দ মিঞা তাহার পরে দরবারে হাজির হন। তিনি হজরতের হাতে ‘দস্তবায়েত” গ্রহণের অনেক মিনতি ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হজরত তাহাকে “দস্তবায়েত” করেন নাই। তিনি যেন মনঃক্ষুন্ন হইয়া পড়িলেন। মৌলবী আহমদ ছফা ছাহেব তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে, হজরত আকদাছের নিকট যাহারা আসেন এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন, তাহাদের “দস্তবায়েতের” এমন কোন বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বিনা বায়াতে হজরত ফয়েজ দানে কল্‌ব জারী করিতে সক্ষম। এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সর্বত্র বিরাজমান। কল্‌ব জারী করাই ইছমাইল চৌধুরীর একান্ত আশা ছিল। হজরতের সামনে আসিলেই সরবত বা চা পান করাইয়া দিতেন। হজরত চা ও সরবতে অত্যধিক অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা বাড়িতে থাকে কিন্তু কল্‌ব জারী হইত না। তিনি বলিয়াছেন হজরতের খেদমতে শরীক হওয়ার তিন বৎসর পরে একদা শ্রাবণ মাসে কাজকর্ম সারিয়া শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় তাহার কল্‌বে যেন এক অপূর্ব আলোড়ন আরম্ভ হইল। তিনি ভয়ানক অস্থির ও ভীত হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাহার হৃদয়ে ভয়ানক কম্পন আসিয়া সমস্ত শরীর আলোড়িত হইতে লাগিল। মৌলবী আহমদ ছফার উপদেশ ক্রমে তিনি হজরত আকদাছের চেহারা মোবারক স্মরণে রাখিয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ কম্পন কমিয়া আসে। সেইদিন হইতে তাহার কল্‌ব জারি হয়।

“তবার্‌রোক মারফত সন্তান দান”

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ধলই নিবাসী জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী ছাহেব বর্ণনা করিয়াছেন– চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পাঁচলাইশ থানার মোহরা গ্রাম নিবাসী সাবরেজিষ্ট্রার জনাব আবদুল লতিফ খান ছাহেব অপুত্রক ছিলেন। তিনি একদিন হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) পবিত্র খেদমতে হাজির হইয়া সন্তান লাভে মিনতি সহকারে দোয়া প্রার্থনা করিলেন। হজরত তাহাকে তিনটি তবার্‌রোক দিয়া বলিলেন, “তোমাকে তিনটি কুল অর্পন করিলাম”। তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পর

ক্রমান্বয়ে তাহার তিন জন ছেলে ভুমিষ্ঠ হয়। খোদার কৃপায় তিন ছেলেই বাঁচিয়া রহিল। তাহার বড় ছেলের নাম জনাব এ কে খান, মধ্যম ছেলের নাম জনাব এম আর খান ও কনিষ্ঠের নাম জনাব এস এইচ খান। তাহারা প্রত্যেকেই মানব সমাজে সুপরিচিত। এবং জনাব এ কে খান ছাহেব বিদ্যাবুদ্ধিতে ও ধনেজনে পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত ও খ্যাত।

"মুর্দাদের প্রতি হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও দয়া"

কোন কোন সময় দেখা যাইত হজরত কেবলা তাঁহার বাড়ীর উত্তর দিকস্থ দমদমা নামক কবরস্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। এমন কি রাত্র নিশিযোগেও তিনি নিঝুম নির্জন কবরস্থানে বসিয়া থাকিতেন। অত্র এলাকায় বিষধর সর্প ও অত্যাচারী জ্বিনদের বিশেষ প্রকোপ ছিল। প্রদীপ ও লাঠি ছাড়া লোকজন সন্ধ্যাকালে বাহির হইত না। আর হজরত ছাহেব রাত্রের ঘোর অন্ধকারে বর্ষার ঝড় তুফানে সাপ জ্বিনে কোন প্রকার ভয় না করিয়া যে কোন কবরস্থানে চলিয়া যাইতেন। একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রে হজরতের মধ্যম ভ্রাতা জনাব মরহুম আবদুল হামিদ ছাহেব, যিনি ছোট মওলানা আমিনুল হক ছাহেবের পিতা হন। একদা দাওয়াত উপলক্ষে কোন বাড়ীতে গিয়াছিলেন। কারণ বশতঃ তথায় তাহার রাত গভীর হইয়া যায়। তিনি দুইজন সঙ্গিসহ দমদমার নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া আসিতেছিলেন। দমদমা কবরস্থানে হজরতকে একা বসা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি হজরতকে বলিলেন "আপনি এমন গভীর রাত্রে একা এই নির্জন কবরস্থানে কেন বসিয়া রহিয়াছেন। আপনি তো জানেন এখানে জ্বিনে কত লোকজন নষ্ট করিয়াছে। তদুপরি বিষধর সর্প ইত্যাদির চলাচলও এখানে অনেক বেশী। মানুষ প্রদীপ লইয়া চলাফেরা করিতে পারিতেছেনা, অথচ আপনি অন্ধকার এই নিশিথ রাত্রে এখানে বসিয়া আছেন। চলুন বাড়ী যাই।" হজরত উত্তর করিলেন, "ভাই ছাহেব! আপনি কোন ভয় করিবেন না। আপনি যাহাদের ভয় করিতেছেন, তাহারা আমার অনুগত। তাহারা আমার আদেশ মানিতে বাধ্য। এই কবরস্থানের মুর্দাদের চিৎকারে আমি ঘরে থাকিতে পারিতেছিনা। তাই আমি তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনি চলিয়া যান ভয় পাইবেন না।"

হজরত আদম (আঃ) পর্য্যন্ত হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিচয়

(১) আলমে বরজখ বা রুহানী জগতে হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব এত বেশী ছিল যে, হজরত আদম (আঃ) পর্যন্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক নজরে ছিলেন।

হজরতের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর মরহুম মৌলবী আবদুল হাকিম ছাহেবের কবরের উপর একটি গর্জন গাছ ছিল। উহা রওজা শরীফের পূর্বপার্শ্বস্থ পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উত্থিত ছিল। হজরত, হারিচাঁন্দ নামক তাঁহার এক প্রতিবেশী ভক্তকে গাছটি কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। গাছটি যখন কাটা হইল তখন মৌঃ আবদুল হাকিমের পুত্র ছিদ্দিক আহমদ গাছ পড়ার শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসে। সে হারিচাঁন্দকে রুক্ষ ভাষায় বলিতে লাগিল, “কি হে! আমার অনুমতি ছাড়া গাছটী অনর্থক কাটিলে কেন?” হারিচাঁন্দ উত্তরে বলিলেন, “ভাই আমার কোন অপরাধ নাই। আমি ফকির মৌলবী ছাহেবের নির্দেশ পালন করিতেছি মাত্র”। তখন ছিদ্দিক আহমদ রাগান্বিত ভাবে বলিয়া উঠিল, “মৌলবী ছাহেবের ফকিরি আমার গাছের উপর আসিল কেন?” ইহা শ্রবনে হজরতের জজবাতী হাল অত্যন্ত গালেব হইয়া উঠিল। তিনি রহস্য না বলিয়া পারিলেন না। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন। “আরে কমবখ্‌ত! তোর বাবার দুই কানে দুইটি বিছা ঝুলিয়া রহিয়াছে তাইতো আমি উহা কাটাইয়াছি। আমি তো ভালই করিয়াছি। তাহাতে উহা দমন হইয়া গিয়াছে। আর তুমি বলিতেছ আমি তোমার খারাপ করিয়াছি। দূরহ হারামজাদা এখান হইতে দূরহ”। ছেলেটি বাড়ীতে চলিয়া গেল। বাড়ী যাওয়ার পর উক্ত ছিদ্দিক আহমদের প্রবল জ্বর আসে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার জবান বন্ধ হইয়া যায়। দিন দিন অবস্থার অবনতি দেখিয়া তাহার মাতা তাহাকে হজরতের বিবি ছাহেবানীর নিকট পাঠাইয়া দেন। এবং হযরতের নিকট ভুল ও বেয়াদবির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া ক্ষমা লইয়া দিতে অনুরোধ জানায়। হজরতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দোয়া

প্রার্থনা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, তীর কামটা হইতে ছাড়িয়া গেলে আর ধরা যায় না। ফলে কিছুদিন পরে উক্ত ছিদ্দিক আহমদের মৃত্যু ঘটে।

(২) একদা সকাল বেলায় সম্মুখস্ত পুকুরের পশ্চিম পাড়ে হজরত আকদাছ বসিয়াছিলেন। হজরতের চারিদিকে হাজতী মকছুদী ও ভক্তবৃন্দের ভীড় ছিল। এমন সময় আজিম নগর নিবাসী ছুফী আবদুর রহমান ছাহেব হজরতের খেদমতে এক "হাউত্তা"–(দুধের ভাণ্ড) দুধ লইয়া উপস্থিত হন। আবদুর রহমান ছুফী বলিয়াছেন: "আমি যখন দুধের পাত্রটি হজরতের সামনে রাখিয়া কদমবুচি করিলাম, তখন হজরত আমাকে আদেশ দিলেন "মিঞা আবদুর রহমান! দুধগুলি আমার "আবতাবায়" (লোটায়) ঢালিয়া দাও।" আমি আদেশ মত তাহাই করিলাম। তখন দক্ষিণ পশ্চিম দিকে জোড়াজুড়ি দুইটি আমগাছ ছিল। গাছ দুইটির প্রতি হজরত তাকাইয়া বলিলেন, "এই দুধগুলি" নিয়া কিছু উহাদের গোড়ায় ঢালিয়া দাও, বাকী সব নিয়া আস। আমি কিছু দুধ আম গাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিয়া বাকী দুধ লোটা সহ হজরতের সামনে রাখিয়া দিলাম তখন হজরতের চেহারা মোবারক অত্যন্ত লালবর্ণ জ্বালালিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, "দুধগুলি তোমার হাউত্তায় (ভাণ্ডে) ঢালিয়া লও"। আমি তাহাই করিলাম। তৎপর একজন খাদেমকে আদেশ দিলেন, এই গুলি ছৈয়দ ছাহেবের বেটিকে দিয়া আস"। হজরতের পুত্রবধু জনাব শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেবের মাতাজানকে হজরত ছৈয়দের বেটি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি মির্জাপুরের মওলানা ছৈয়দ মছিহুল্লাহ্ ছাহেবের কন্যা ছিলেন। একজন খাদেম দুধগুলি ঘরে দিয়া আসিলেন। হজরত গাছ দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মিঞা আবদুর রহমান! তোমকো মালুম হ্যায়? ইয়ে দোন কওন হেঁ! তোমার কি জানা আছে, এই দুইজন কে?" আমি অতি ভীত মনে উত্তর করিলাম, হুজুর, আমগাছ। তখন হজরত জজ্‌বাতী অবস্থায় বলিয়া উঠিলেন 'নেহি মিঞা? বাবা আদম হ্যায়। বহুত দিন তক মোন্তাজের খাড়া হ্যায়। ইছ ওয়াস্তে উছকা চুতর পর দো কাতরে পানি দিয়া।" না মিঞা! বাবা আদম (আঃ)।

অনেকদিন তক অপেক্ষায় দাড়াইয়া আছেন। তাই তাঁহার নিতম্বে দুইফোটা পানি দিলাম। তিনি আবার আমাকে বলিলেন, "মিঞা আবদুর রহমান! মৌলানা মখলছুর রহমান ছাহেব কো পয়ছানতা হায়?" আমি বলিলাম, হুজুর নাম শুনিয়াছি কিন্তু কখনও যাই নাই। হজরত বলিতে লাগিলেন, "মিঞা একদিন আমি তাহার নিকট পড়িতে যাইতেছিলাম। গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁ কেতাব দুইটি আমার বগলে ছিল। যখন নৌকায় উঠি, নৌকায় দুই জন জোয়ান, মাথায় কালচুল। তাহারা নৌকাকে হেলাইতে লাগিল। যাহাতে নৌকাখানা পানিতে ডুবিয়া যায়। আমি তখন দুইজনকে দুই থাপ্পর লাগাইয়া দিলাম। দেখি তাহারা পানিতে ডুবিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আবদুর রহমান তুমি কি জান তাহারা কোথায় গেল। আমি নীরব রহিলাম। হজরত বলিলেন, "পরে দেখি ঐ দুইজনই মৌলানা ছাহেবের দরজাতে দুইটি কুত্তা হইয়া খাড়া রহিয়াছে। যাহাতে কোন লোকজন তথায় যাইতে না পারে। আমি উভয়কে লাঠি দিয়া তাড়াইয়া দিলাম"।

"আবদুর রহমান! তুমি টিপু সোলতানের মসজিদ চিন?" আমি বলিলাম, হুজুর? কলিকাতায় মাটিয়া বুরুজে বলিয়া শুনিয়াছি। হজরত বলিলেন, "মিঞা! দেখিতেছি, এই দুই হারামজাদা সেই মসজিদের দরজাতে দুইটি ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকের কি সাধ্য মসজিদে ঢুকে! আমি উভয়কে আমার লাঠি দিয়া জোড়ে প্রহার করিলাম। তাহারা চিৎকার করিয়া ভয়ে পালাইয়া গেল। তিনি তাঁহার দক্ষিণ হাত দিয়া দক্ষিণ পাশে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "তুমি এই রাস্তা দিয়া বাড়ী চলিয়া যাও"। বাম পাশে নির্দেশে বলিলেন, "এই রাস্তায় যাইওনা। নিজ ঘরে গিয়া কোরান শরীফ তেলাওয়াত কর আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর। কোথাও যাইওনা। এইখানে একটি বাজার হওয়ার আছে। তুমি এইখানে আসিওনা"। এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিয়া খাড়া হইলেন। আবার আমাকে ডাকিলেন। আমি নিকটে গেলাম তিনি তাঁহার বাম হাত দিয়া আমার ঘাড় শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার কপাল মোবারকের সাথে আমার কপালকে লাগাইতে চেষ্টা করিলেন। ভয়ে আমার সমস্ত শরীরে কম্পন আরম্ভ হইল। হজরত যেন

তাহা অনুভব করিয়া আর কপালে লাগাইলেন না। তাঁহার দক্ষিণ হাতের সাহাদত অঙ্গুলী দিয়া আমার কপালে কি যেন লিখিয়া দিলেন।

আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আদেশ দিলেন, "যাও মিঞা! আপনা ঘরে বসিয়া থাক"। সেইদিন হইতে ঘরেই বসিয়া থাকি। জায়নাজা, জুম্মার নামায বা নিতান্ত দরকারী কাজ ছাড়া ঘর হইতে বাহির হই না।

পূর্বে আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বর্তমানে খোদার ফজলে তাঁহার অপার অনুগ্রহে আমার জায়গা জমি হালচাষ ও গৃহস্থীতে ভরপুর। গোলাভরা ধান, যথেষ্ট ক্ষেতি। আঁখ ক্ষেতেই বৎসরে আমার হাজার দুই হাজার টাকা রোজগার হয়। আমার ছেলেরা এই সমস্তের তত্ত্বাবধান করিয়া অনেক রুজি করে। ছেলেমেয়েদের লইয়া পরমসুখে আল্লাহ্‌র মেহেরে দিন কাটাইতেছি। আমি এখন বৃদ্ধাবস্থায় পড়িয়াছি। মৃত্যু হয়তো সন্নিকটে। না জানি হজরতের কোন আদেশ লঙ্গন হইয়া যায়। আমি এখনও পাড়ার ছেলে মেয়েদের কোরান শরীফ শিক্ষা দিই এবং নিজে কোরান পাঠ করি।

আপনি আমার পীরের আওলাদ এবং সকলের চেয়ে প্রিয়তম। দয়া করিয়া আপনি আমার হজরত আকদাছের খেদমতে আমার জন্য সুপারীশ করিবেন। যাহাতে পরকালে আমার মুক্তি হয়। উক্ত ঘটনা বর্ণনাকারী ছুফী আবদুর রহমান ছাহেব, মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মিঞা ছাহেবের নিকট উহা বর্ণনা দেন।

হজরতের এই সমস্ত জজবাতি কালামের রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, হজরত এক একটি উদাহরণ দিয়া উহার মূলরহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। "মোখলেছুর রহমান" দয়াময়ের খালেছ মহব্বতের স্থান। যাহাতে আল্লাহ্ তা'লাকে বিনা স্বার্থে মহব্বত করা যায়। "গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁ" প্রেমধারা ও তরীকত পদ্ধতী। যাহা উক্ত স্থানে পৌঁছিবার সম্বল। নৌকা নিজদেহ বা মানব তরণীকে নির্দেশ করিতেছেন। কালচুলধারী জোয়ান বলিষ্ঠ নফ্ছ শয়তানকে বুঝাইতেছে। যাহা মানবকে বিপথগামী করিয়া নিম্নস্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। টিপু সুলতানের মসজিদ যেখানে আল্লাহ্‌কে একাগ্রচিত্তে সেজদা করা যায় বা আল্লাহ্‌কে পাওয়ায় স্থান, অর্থাৎ

অলিউল্লাহগনকে বুঝাইতেছেন, ব্যাঘ্র শয়তানের প্রবল বাধাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। দক্ষিণরাস্তা ছেরাতুল মোস্তাকীম মুক্ত বাধাহীন রাস্তাকে নির্দেশ করিতেছেন বলিয়া বুঝা যায়। তাঁহার কালামে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়, তিনি উক্ত পথের প্রবল বাধা ও কন্টককে দূরিভূত করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পার্থিব তছরূপ ও প্রভাবের ইঙ্গিত।

হজরতের বেলায়তি প্রভাবে অযোগ্যকে যোগ্যতা দান

রাউজান নয়াপাড়া নিবাসী ডাক্তার ফজলুল করিম ছাহেব বলেন– "আমার পিতা হেকিম নুরজ্জমান ছাহেব হজরত কেবলা কাবার কামালিয়ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খেদমতে আসিয়া তাঁহার নিকট বায়াত গ্রহন করেন। আমার পিতা ছাহেব নিতান্তই সোজা ও অল্পজ্ঞানী লোক ছিলেন। কয়েক বৎসর পর হজরত তাহাকে হেকিম ছাহেব বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এবং হেকিমী চিকিৎসা করিতে আদেশ দিলেন। তিনি হজরত ছাহেবকে বলিলেন, হুজুর! আমিতো কিছুই জানিনা। ঔষধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা আমি জীবনে কাহাকেও কোন দিন পানি পড়া পর্যন্ত দিই নাই। কি করিয়া হেকিমী চিকিৎসা করিব। হজরত বলিলেন "যাও মিঞা তুমি সব জান। তোমার খোদাও সব জানেন। তিনি উম্মিকে জ্ঞান দান করেন"। অতঃপর আমার পিতা ছাহেব বাড়ীতে গেলেন। তাহার বাড়ী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের জন্য লোকজন আসিতে আরম্ভ করিল। তিনিও অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত ঔষধ দিতে লাগিলেন। যেই সময় যাহা দরকার চিন্তা করার আগেই যেন তাহা তাহার বিবেকে আসিয়া যাইত। কোন অভিজ্ঞ হেকিম যেন তাহার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে অভিজ্ঞতা যোগাইতেছেন। তাহার কোন রোগী ঔষধ নিয়া বিফল মনোরথ হইতে শুনি নাই। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যে তাহার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অনেক ডাক্তার কবিরাজ পর্যন্ত পরামর্শের জন্য তাহার নিকট আসিতেন। তাহার আরও একটা বুজর্গী চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। কাহারো কোন কিছু হারাইয়া গেলে বা চুরি হইলে খবর দিয়া দিতেন। ইহা যেন তিনি

কশ্‌ফ দ্বারাই করিতেন। আমার পিতা ছাহেবের অন্য কোন উপার্জন ছিলনা। একমাত্র হেকিমী চিকিৎসাতেই তিনি পারিবারিক সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াও বাইশ কানী জমি খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার ওফাতের পূর্বে চারিকানী জমি রাখিয়া বাকী জমি তাহার ভাইদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে আমি আপত্তি করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, "খোদাই রজ্জাক – রিজিক তাঁহার নিকটেই চাও। তিনি সবকিছুই দিবেন" তার পর আমার পিতার ওফাতের পর হইতে আমি হেকিমী চিকিৎসা করিয়া খোদার কৃপায় অতিসুখে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছি।

"কলা মারফত জাফর আলী শাহ্‌কে 'কশ্‌ফ' শক্তিদান"

শাহছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব বর্ণনা করেন, নিম্নোক্ত ঘটনাবলী–জিয়াউল হোসাইন মিঞাজি ও তাহার দাদী আম্মা হজরত ছাহেবানীর মুখে শুনিয়াছেন যে,–সাতকানিয়া নিবাসী জাফর আলী নামক হজরতের এক ভক্ত তাহার খেদমতে আসিতেন। হজরত কেবলার বেলায়েত প্রচারের প্রথমাবস্থায় এক রাত্রে প্রতিবেশী মোয়াজ্জেন ছায়াদ উল্লাহ্‌কে হজরত একটি পাকা কলা খাইতে বলিলেন। তিনি নিজ কাশীরোগের শেকায়েত করিয়া ঠাণ্ডা রাত্রে কলা খাইতে অস্বীকার করিলেন। হজরত বাহিরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ডাকিয়া বলিলেন; "এখানে কে আছ?" উক্ত জাফর আলী করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হুজুর আমি বান্দা জাফর আলী আছি।" হজরত আবার ছায়াদ উল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন এই কলাটি আপনার জন্য রাখিয়াছিলাম, এখন জাফর আলী চাহিতেছে; তাহাকে দিব কি? মোয়াজ্জেন ছাহেব বলিলেন, হুজুর দিয়া দেন। আমি ঠাণ্ডার সময় কলা খাইতে পারিব না।" হজরত কলাটি জাফর আলীকে দিয়া দিলেন। জাফর আলীর উক্ত কলাটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাল ও জজব গালেব হয়। অতঃপর হজরত আন্দর হুজরায় চলিয়া যান। জাফর আলী সারারাত অত্যন্ত মস্তি ও জজবা হালতে বকাবকী করেন। এবং সকাল হইতেই আগত হাজতী মখছুদিগণের হাজত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবানী করিতে

থাকেন। একজন লোক হজরতের খেদমতে নিজ সন্তানের রোগ মুক্তির প্রার্থনা লইয়া আসে। জাফর আলী তাহাকে দেখিয়াই তাহার সন্তানের মৃত্যু সংবাদ দেন। ইহাতে লোকটি হজরতের সমীপে কান্দিয়া পড়ে। হজরত দেখিলেন ঠিকই সন্তান মারা গিয়াছে। হজরত জাফর আলীকে হিজরত করিতে আদেশ দেন। এবং বলেন, "জাফর আলী এইরূপ বলিও না; এমন কথা বলা নিষেধ।"

জাফর আলী হিজরত করিবার সময় পার্শ্ববর্তী বাড়ীর জেয়াউল হোছাইনকে বলিলেন, "দেখ জেয়াউল হোছাইন, তোমাকে আমি ভালবাসী। তুমি আমাকে খানা পানি ও জরুরী দ্রব্যাদী দিয়া প্রায় সময় সাহায্য করিয়া থাক। তদুপরি বাবাও তোমাকে ভালবাসেন। আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। তুমি বল, হে জাফর আলী শাহ্! বাবা তোমাকে যেইরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তুমি আমাকেও ঐরূপ করিয়া দাও। কারণ উহা না চাহিলে হয় না। চাহিতে হয়।" জেয়াউল হোছাইন তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল, "আপনার কাছে, একটি থলিয়া, একটি লাঠি ও একটি লোটা এইতো?" জাফর আলী বলিলেন, "যাহা আছে সাত বাদশার কাছেও তাহা নাই। আমি বাবার রঙ্গিন দরিয়ায় ডুব দিতে শিখিয়াছি। এবং নিজেকে রঙ্গিন করিবার কৌশল জানি। তোমাকে দিয়া দিলে উহা কমিবে না; বরং আমি ডুব মারিয়া উহা পূরণ করিয়া নিব। তোমার কপালে যে দুইটি চক্ষু আছে, অন্তরেও সেইরূপ দুইটি চক্ষু আছে। তুমি যদি আমাকে বল, বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার মুদ্রিত আন্তরিক চক্ষু দুইটি উন্মেলিত করিয়া দিব। তখন তুমি আমার মত দেখিতে পাইবে।" জেয়াউল হোছাইন বলিল "আপনার পথে আপনি চলিয়া যান। পাগলামী করিবেন না।" তবুও তিনি আফছোচ করিয়া বলিলেন; "তুমি এখনও ছোট্ট মানুষ বুঝ হয় নাই।" এই বলিয়া তাহার থলিয়া হইতে দুই খানা খড়ম বাহির করিয়া জেয়াউল হোছাইনকে দিয়া বলিলেন, "দেখ তোমার যখন বুঝ হইবে এবং ইহার কদর বুঝিতে পারিবে; তখন এই খড়ম দুইটির উপর দাঁড়াইয়া বলিও, হে আল্লাহ্! তুমি এই খড়মের বরকতে জাফর আলী শাহ্ আমাকে যাহা দিতে

চাহিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাও। তখন তুমি আমার মত হইয়া যাইবে। তোমার মাতাকে বলিও জাফর আলী প্রদত্ত এই খড়ম জোড়া যেন আতর মাখাইয়া–সাদা কাপড় বাঁধিয়া বাক্সে রাখিয়া দেয়।" জেয়াউল হোছাইন খড়ম দুইখানা ঘরে নিয়া তাহার মাতাকে না পাইয়া গোলার নীচে রাখিয়া দিল। জাফর আলী শাহ্ পুনঃ ফেরত আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খড়ম কি করিয়াছ!" সে বলিল "গোলার নীচে রাখিয়া আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন "আরে কমবক্ত! তোমার কপালে নাই। আমি দিতে চাহিয়াছিলাম।" পরে তাহার মাতা শুনিয়া খড়ম দুইখানা তালাস করিয়া লইতে আদেশ দিলে, তালাস করিয়া দেখে যে খড়ম দুইখানা যথাস্থানে নাই।

(১) "সাগর জলে হজরতের অসাধারণ প্রভাব ও খালের গতি পরিবর্তন"

একদা হজরত বহু লোকজন সহ নাজির হাট যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জেয়াউল হোছাইন মিঞাজি নামক তাঁহার প্রতিবেশী ও এক ভক্ত সাথী ছিলেন। নাজির হাট যাইতে ধূরঙ্গ খাল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ইহা একটি খড়স্রোতা বারমাহি খাল ছিল। হজরত পথ চলিয়া খালের নিকটবর্তী হইতেই দেখিতে পাইলেন খালে প্রবল স্রোত। এই প্রবল স্রোতে তিনি খাল অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন। সঙ্গি জেয়াউল হোছাইন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "হুজুর! খালে স্রোত প্রবল। এইখানে পার না হইলে বোধ হয় ভাল হইত।" হজরত ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি জলস্রোতে নামিয়া পড়িলেন। জেয়াউল হোছাইনও অগত্যা তাঁহার পিছনে নামিয়া পড়িলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহার পা মোবারক পিছলাইয়া গেল। ইহাতে হজরতের পরিধেয় কাপড় কিছু অংশ ভিজিয়া যায়। হজরত অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চেহারা মোবারকে যেন রক্তের আভা দেখা দিল। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। তিনি স্বরোষে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেয়াদপ।

হারামজাদী! বেয়াদপ। হারামজাদী!" বলিতে বলিতে তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া স্রোতের উপর স্বজোরে প্রহার করিতে লাগিলেন জেয়াউল হোছাইন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। হজরত পিছন দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হারামজাদী বেয়াদপী করে, হারামজাদীকে পিটাইয়া দিয়াছি।" তৎপর পশ্চিম পার্শ্বে যাইয়া তাঁহার পাদুকা দিয়া আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "হারামজাদী দূর হও"।

ইহা সর্বত্র প্রচারিত যে, হজরতের এই ঘটনার পর হইতে ধূরঙ্গ খালের স্রোত অন্যদিক বাহিয়া গতি পরিবর্তন করতঃ হালদা নদীতে পতিত হইয়াছে। এবং পূর্ববর্তী খাল হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মৃতখালে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যায়। একদা আজিম নগর নিবাসী আবদুল মজিদ মিঞা নামক হজরতের এক আত্মীয় বহুলোক সহ দেশবাসীর অনুরোধে হজরতের খেদমতে আসিয়া উক্ত খালের স্রোতগতি পূর্ব্ববৎ দক্ষিণ মুখে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য কাতর নিবেদন জানাইতেই, হজরত তাহাকে উত্তর করিলেন, "হারামজাদী রছুল করীম (দঃ) এর সহিত বেয়াদপী করিয়াছে। কেন আবার ফিরিয়া আসিবে?" তিনি নবী করিম (দঃ) এর সর্বক্ষমতা ও গুণের প্রতীক ছিলেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই তিনি তাঁহার পবিত্র কালামে পরিচয় দিতেছেন; সে নবীর সঙ্গে বেয়াদপী করিয়াছে। এই পর্যন্ত দেখা যায় সে অনেক চেষ্টা, এমনকি বর্ত্তমান গতিপথে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পাকা বাঁধ দিয়াও ধুরঙ্গ খালের গতি পূর্বের পথে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই।

সাগর গর্ভে হজরতের প্রভাব ও শাহ্ কুলজামের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের নিদর্শন

নেজামপুরী মৌলানা জনাব ফজলুর রহমান ছাহেব দোয়া প্রার্থী হইয়া একবার হজরত আকদাছের নিকট উপস্থিত হন। হজরত তাহাকে দুই আনা পয়সা হাতে দিয়া বলিলেন, "মৌলানা ছাহেব। আমি যখন সাগর ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন তথায় আমার একবন্ধু 'সাহে কুলজাম' হইতে দুই আনা পয়সা ধার নিয়াছিলাম আপনি তাহাকে এই পয়সাগুলি দিয়া দিবেন।"

মৌলানা ছাহেব হজরতের এই মোবারক কালামের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। "শাহ্ কুলজাম" যে হজরতকে অত্যন্ত ভালবাসেন; তাহাদের মধ্যে যে নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না। সাগরবাসী প্রত্যেকেই যে হজরতকে ভক্তি করে ও অবনতশিরে মানে, সাগরও যে হজরতের বেলায়তী প্রভাবে পরিচালিত। তিনি যে তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মৌলানা ছাহেব বুঝিতে পারেন নাই হজরত পয়সার মারফত তাহাকে সাগর গর্ভের ক্ষমতার ইঙ্গিত দিলেন। পক্ষান্তরে তাহাকে হজ্ব করিবার ইঙ্গিত ও ক্ষমতা দান করিলেন। মৌলানা ছাহেব তো তাহা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মৌলানা ছাহেব হজরতকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হুজুর! শাহে কুলজাম কোথায়। তাহাকে আমি কোথায় পাইব? আমি কি করিয়া এই আমানত আদায় করিব! হজরত উত্তর করিলেন "আপনি তাহাকে কুলজাম সাগরে পাইবেন।" শুধুমাত্র এই উত্তরটি করিয়া হজরত চুপ করিলেন। তিনি বিদায়ান্তে বাড়ী গমন করিলেন। কিন্তু বিষম চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

কি করিয়া তিনি হজরতের এই মহান দায়িত্ব আদায় করিবেন। কোন্ উপায়ে তিনি শাহে কুলজামকে পাইতে পারেন। এমন অসম্ভব দায়িত্ব হজরত তাহার উপর চাপিয়া দিলেন, যাহা পরিশোধ করার কোন উপায়ই তিনি খুজিয়া পাইতেছেন না। দিনরাত এই চিন্তায় রহিলেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হইল। পয়সা–দুই আনা তাঁহার সঙ্গে রহিল কোন সুযোগে এবং কোথায় সৌভাগ্যক্রমে শাহে কুলজামের সাক্ষাৎ পান। কিছুদিন পর তাহার মনে হজ্ব করিবার বাসনা জাগে।

তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কুলজাম সাগর পার হইয়া জিদ্দা যাইতে হয়। তিনি মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। "এইবার যদি আল্লাহ্ হজ্বে নেন তো নিশ্চয় হজরতের আদেশ মত কুলজাম সাগরে শাহে কুলজামের দেখা পাইতে পারি। বোধ হয় হজরতের এই আমানতের উছিলায় শাহ্ কুলজামের সাক্ষাৎ আমার ভাগ্যে জুটিবে। এই জন্যই বোধ হয় হজরত পয়সা দুই আনা–দিয়াছেন। আমাকে নিশ্চয় তিনি হজ্বে যাইতেও সাহায্য করিতেছেন। এইবার নিশ্চয় আমানত শোধ করিতে পারিব।" তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে হজ্বের আয়োজন শুরু করিলেন।

হজ্বের সময় তিনি হজ্বে গেলেন। পয়সা দুই আনা তাহার সঙ্গেই আছে। কুলজাম সাগর অতিক্রম করিতে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন অনেককে–জিজ্ঞাসা করিলেন। কোথাও শাহ্ কুলজামের দেখা পাইলেন না। হজ্ব কার্য্য সমাধা করিয়া-আসিবার পথেও অনেক চেষ্টা করিয়া শাহ্ কুলজামের দেখা পাইলেন না। এইবার তিনি হতাশ হইয়া নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। কি উপায় করেন। আল্লাহ্ পাক, দর্শনের যাহা একটা উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তো ভাগ্য ফলিলনা। আমানত আদায় হইলনা। অন্য উপায়ে আদায় করিলে শাহ্ কুলজাম যদি গ্রহন না করেন এবং হজরতও যদি নারাজ হন কি করিবেন। আশায় রহিলেন হাতে হাতে দিতে যখন নির্দেশ করিয়াছেন উপায়ও একটি করিয়া দিবেন।

কয়েক বৎসর গত হইল। খোদার কৃপায় আবার তাহার হজ্বে যাওয়ার সুযোগ হইল। এইবারও তিনি পুলকিত মনে পয়সা দুই আনা সঙ্গে লইয়া হজ্ব করিতে গেলেন। কুলজাম সাগর পার হইতে অনেক সন্ধান করিলেন। কিন্তু কুলজাম শাহের সন্ধান পাইলেন না। তিনি ভাবিয়া অস্থির হইলেন। দুইবার সুযোগ পাইয়াও শাহ্ কুলজামের দর্শন মিলিল না। তিনি চিন্তিত মনে হজ্ব করিতে চলিয়া গেলেন। যথারীতি হজ্বকার্য্য সমাপন করিয়া

আসিবার পথে আবার চেষ্টা করিলেন। কোথাও কোন নিশান পাইলেন না। অবশেষে জাহাজে উঠিয়া গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, এক অতীব সুন্দর দীর্ঘকায় দিব্যকান্তি পুরুষ জাহাজের বাহিরে দ্বিতলের বরাবর শূন্যে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি হাত পাতিয়া বলিতেছেন–"হাজী ছাহেব! আপনার নিকট আমার অনেক দিনের দুই আনা পয়সা রহিয়াছে, দিয়া দেন তো! ইহা দর্শনে ও শ্রবণে অবাক চিত্তে পকেটে হাত দিয়া পয়সা দুই আনা বাহির করিয়া দিলেন। এবং আগাগোড়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া লইলেন। পয়সাগুলি হাতে লইয়া তিনি বলিলেন; হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীকে আমার ছালাম দিবেন।" ইহা বলিয়া তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বহুদিন পরে তিনি হজরতের আদেশ পালনে সক্ষম হন। খোদার দরবারে শুকরিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, হজরতের পয়সা দুই আনার বদৌলতে তাহার দুইবার হজ্ব করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে একরাতে মক্কা শরীফ হইতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাগমন

(১) চট্টগ্রাম, নানুপুর নিবাসী ছৈয়দ খায়ের উদ্দিন ডাক্তার ছাহেবের একজন বন্ধু কাবা শরীফ হজ্ব করিতে গিয়াছিলেন। হজ্ব সমাপন করিয়া হাজীগণ বাড়ীতে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি টাকা পয়সা খরচ হইয়া যাওয়ায় বাড়ী ফিরিতে অসমর্থ হইয়া চিন্তিতভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সঙ্গি হাজীগণ হইতে সাহায্যের চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হন। অবশেষে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি আরবী ভাষা না জানায় মনের ভাব কাহারো নিকট ব্যক্ত করিতেও অপারগ। অবশেষে তিনি বোবার মত ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসীম কষ্টে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল। তিনি বিপদতারণ মহাপ্রভুর স্মরণ লইলেন। তিনি বিশেষ মিনতির সহিত খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, "হে করুণাময়! বিশ্বে যদি তোমার কোন মহান মাহবুব থাকেন, জামানার দুঃখ নিবারক ক্ষমতাবান তোমার কোন প্রিয় বন্ধু যদি জগতে থাকেন, তবে তাঁহারই উছিলায় তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমাকে দেশে ফিরিবার উপায় করিয়া দাও। তুমি ছাড়া আমার আর কোন গতি নাই। প্রভু হে! তোমার প্রিয় হাবিব নবীর রওজা মোবারক জেয়ারত করিতে আসিয়া এবং তোমারই পবিত্র কাবাগৃহ তাওয়াফ করিতে আসিয়া যদি কোন ভুলত্রুটি করিয়া থাকি, প্রভু তাহা ক্ষমা কর"। আল্লাহ্ তা'লা তাহার প্রার্থনা কবুল করিলেন। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি নির্জনে ঘুরিতেছিলেন, এমন সময় মাইজভাণ্ডারী মওলানা জনাব হজরত আহমদ

উল্লাহ্ (কঃ) ছাহেবকে তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যাম্বিত এবং আহ্লাদিত হইলেন। পুলকে যেন তাহার শক্তি শতগুণ বাড়িয়া গেল। তছলিমাত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ– "হুজুর আপনি কখন মক্কা শরীফ আসিয়াছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন যে, তিনি হজ্বের পূর্বে আসিয়াছেন। আমার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি মর্মাহত হইলেন। এবং সঙ্গি হাজিগণের সহিত চলিয়া না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অকপটে আমার দুরবস্থার কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তিনি আমার প্রতি দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "ভাই ছাহেব! আর কোন চিন্তা নাই আমার সঙ্গে আসুন। আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে আপনাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবেন।" এই কথা বলিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। আমিও আনন্দিত মনে তাঁহার পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। মগরিবের নামাযের সময় হইল। দুইজনে এক নির্জন স্থানে নামায সমাধা করিয়া লইলাম। তিনি একটি থলিয়া হইতে আমাকে কিছু মেওয়া ও পানিয় দিলেন। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিভূত হইয়া আসিয়াছে। তিনি থলিয়া হইতে একটি মোমবাতি বাহির করিয়া জ্বালাইলেন। এবং বাতিটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনার সম্মুখ-দিকে দৃষ্টি করুন।" আমি সম্মুখ পানে তাকাইয়া দেখিলাম অদূরে একটি প্রদীপ্ত অত্যোজ্বল আলো জ্বলিতেছে। উহার আলোকরশ্মী যেন আমার মুখের পানে ধাইয়া আসিতেছে। আমি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ দেখিতেছি বলিয়া জানাইলাম। তিনি আমাকে একটি "ইছিম" শিখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভাই ছাহেব আপনি এই "ইছিমখানা পড়িতে পড়িতে একধ্যানে দ্রুত ঐ প্রদীপটির দিকে অগ্রসর হউন। এদিক ওদিক তাকাইবেন না। কথামত কাজ করিলে আল্লাহ্ অতি সত্তর আপনাকে দেশে পৌঁছাইবেন। দেশে পৌঁছিয়া এই সমস্ত কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না।" আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "ইছিম"খানা জপিতে জপিতে প্রদীপটির দিকে একাগ্রচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিয়া হঠাৎ আমি মন্ত্রখানা ভুলিয়া গেলাম। এবং সামনের উজ্জ্বল প্রদীপটাও অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিপদ

মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলাম। এদিক ওদিক তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম, আমি চট্টগ্রাম শহরে সদরঘাটে বউটা লাকড়ী নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তখন সময় সোবেহ ছাদেক চারিদিকে লোকজন চলাফেরা করিতেছে। আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এইমাত্র যেন পথচলা আরম্ভ করিলাম, কখন রাত শেষ হইল এবং কেমন করিয়াই আমি চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড। এ কী কেরামত!

হজরত ছাহেবের এই অপূর্ব অলৌকিক শক্তি, অদ্ভুত ও অবর্ণনীয় কেরামত এবং স্বদেশীয় লোকের প্রতি অযাচিত, অপ্রত্যাশিত এবং অসীম অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ দর্শনে আমি যেন আনন্দাকুল হইয়া খোদার শোকরিয়া ও তাঁহার স্মরণে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লাগিলাম। এবং কেমন করিয়া তাঁহার দরবারে পাকে পৌঁছিয়া তাঁহাকে কদমবুচি দিব এবং তাঁহার অবস্থা অবলোকন করিব ইহাতেই আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমার বিশ্বাস মৌলানা ছাহেব হজ্বে যান নাই, গেলে আমি দেশে থাকিতে নিশ্চয় শুনিতাম। তিনি আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয় বাড়ীতে আছেন। এই সমস্ত কল্পনা করিতে করিতে আমি বাড়ীর প্রতি নহে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ পানে রওনা হইলাম। তখন আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। দিবা দুইটার সময় আমি দরবার শরীফ আসিয়া পৌঁছি। তখন দেখিতে পাই, হজরত বহির্দায়েরা শরীফে উপবিষ্ট। খবর নিয়া জানিলাম তিনি ইতিমধ্যে কোথাও যান নাই। আমার অনুমান সত্য। সমস্তই তাঁহার কেরামত। আমি আত্মহারা পতঙ্গের মত তাঁহার পবিত্র চরণে লুটাইয়া পড়িয়া আনন্দাশ্রুতে তাঁহার পদযুগল ভাসাইয়া দিলাম।

হজরত আমার মাথায় করুণা মাখা হাত ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হাজি ছাহেব আপনার ওয়াদা ঠিক রাখিবেন। কোন কষ্ট হয় নাই তো!" আমি আরজ করিলাম "হুজুর! আমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দয়া করিয়া পূনরায় আমাকে উহা শিখাইয়া দেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আর দরকার নাই। আপনার কাজ তো সারিয়া গিয়াছে।

আবার কেন?” এই বলিয়া খাদেম গণকে বলিলেন, “এই লোকটি বহুদূর হইতে আসিয়াছেন, তিনি পথশ্রমে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, পানাহারে পরিতৃপ্ত কর”। খাদেম ছাহেব আদেশ পাইয়া আমাকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইয়া বসিতে দিলেন এবং নানাভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া অতি সতকর্তার সহিত তাহাদের প্রশ্নের জওয়াব দিলাম। এবং মক্কাশরিফ হইতে অদ্যই কোন দয়ালু পরোপকারী বাদশার অনুগ্রহে আসিয়াছি বলিয়া জানাইলাম।

তাহাদের সহিত বেশী আলাপ না করিয়া পূনঃ হজরতের খেদমতে গেলাম। তিনি আমাকে অতি স্নেহভরে বলিলেন, “আপনি নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান। আপনার জন্য আপনার আত্মীয়স্বজনেরা আকুল হইয়া রহিয়াছে”। আমি তাঁহার পাকচরণে ভক্তিপূর্ণ কদমবুচি করিয়া তাঁহার আদেশ মত বাড়ীর প্রতি রাওনা হইলাম। বাড়ীতে পৌঁছিলে সকলেই আমাকে দেখিয়া যেন অপ্রত্যাশিত ধন লাভ করিল। তাহাদের হৃদয়ে যেন নিরাশার অন্ধকারে আলোকরশ্মী দেখা দিল। আমি যে দেশে ফিরিয়া আসিব তাহার আশা তাহারা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। এখন তাহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিল আমি কেমন করিয়া বাড়ী আসিলাম। আমি হজরতের কথা গোপন রাখিয়া এক কথাতেই উত্তর করিতে লাগিলাম যে একজন মহৎধর্মপ্রাণ বাদশাতুল্য ব্যক্তিই আমাকে বাড়ী আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। আজ পর্যন্ত হজরত কেবলা কাবার এই অপূর্ব কেরামত আমি কাহারো নিকট প্রকাশ করিনাই। এই মাত্র প্রথমেই আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম।”

নানুপুর নিবাসী ডাক্তার খায়ের উদ্দিন ছাহেব বলেন –

বক্তপুর নিবাসী আবদুল জলিল গোমস্তার সহিত একদিন হজরত সম্বন্ধে আমার আলাপ হয়। তিনি আমাকে বলেন–

আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু হাজি ছাহেব, সদা সর্বদা আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, “ভাই আপনার সাথে আমার নেহায়েত এক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে, যাহা এখন বলিতে অক্ষম। আমার মৃত্যুকালিন অবস্থায় আপনাকে

বলিতে পারি। আপনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন যাহাতে না বলিয়া মৃত্যুবরণ না করি। নচেৎ ইছলাম ধর্মের এক বড় রহস্য গোপন থাকিয়া যাইবে।" বহুদিন পরে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তাহার মৃত্যু লক্ষণ দেখিয়া তাহার নিকট গোলাম গোমস্তা ছাহেব গেলেন। বন্ধুর মৃত্যুকালিন গোপন ধর্মীয় রহস্য জানিতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন। বন্ধু হাজি ছাহেব বলিলেন, "ভাই ছাহেব আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। সময় বোধ হয় আর বেশী বাকী নাই। অদ্যই আমি আপনাকে–আমার গোপন কথাটি জানাইব।" তিনি কোন অংশ গোপন না করিয়া সবিস্তারে হজরত আকদাছের উপরোক্ত কেরামতটি আমার নিকট বর্ণনা করিলেন। এবং বলিলেন, ভাই ছাহেব! এই কথাটা গোপন রাখিতে হজরত আমাকে অঙ্গিকার করাইয়াছিলেন। এতদিন আমি গোপন রাখিয়াছিলাম। আমার মৃত্যুকালেও এই রহস্যটি গোপন থাকিলে লোকে তাঁহার পরিচয় পাইতে কষ্ট হইবে বিধায় অদ্য আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। আপনি এইখানা কাহারো নিকট প্রকাশ করিলে আমার নামটি গোপন রাখিবেন।

"আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়ীতে থাকিয়া মক্কা-মদিনা ছায়ের"

(২) ইছাপুর নিবাসী হাজী রমিজ উদ্দিন সাহেব বলেন, তিনি হজ্ব করিবার মানসে মক্কা শরীফ যান। কাবা শরীফ "তওয়াফ" কালে হজরত ছাহেব কেবলাকে দেখিতে পান। তিনিও কা'বা শরীফ "তওয়াফ" করিতেছেন। লোকের খুব ভীড় থাকায় আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। তৎপর কাবা শরীফের যাবতীয় কার্যাদি সমাপন করিয়া মদিনা শরীফ হাজির হন। যখন নবীকরিম (দ:)'র পবিত্র "রওজা মোবারক" জেয়ারতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলেন হজরত ছাহেব কেবলাও তাঁহার কিছু দূরে পবিত্র "রওজা শরীফ" জেয়ারত করিতেছেন। তিনি জেয়ারত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া হজরত মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সহিত আলাপ করিবেন খেয়াল করিলেন। জেয়ারত শেষ করিয়া অনেক তালাস করিয়াও তিনি

হজরতের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, হজরত ছাহেব বাড়ী হইতে এযাবত কোথাও যান নাই। হজরতের খেদমতে কদমবুচি পূর্বক আরজ করিলে; তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "চুপ থাকাই উত্তম"।

এইভাবে হজরত অসংখ্য মানব হৃদয়ে যে অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্রীড়া সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা– মানব হৃদয়েই অধিকাংশ গোপন রহিয়াছে! কারণ হজরত তাঁহার বাতেনী রহস্যমূলক ক্ষমতাকে গোপনই রাখিতে চাহিতেন। তবুও তাহা প্রচারিত হইয়াছে।

"হজরতের বেলায়েতী ক্ষমতায় বাহুতে হাত রাখিয়া জনৈক হাজীর অলৌকিকভাবে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন"

নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত, সুধারাম থানার জগদানন্দ গ্রাম নিবাসী মৌলানা মোহাম্মদ ইদ্রিচ ভুঁইয়া ছাহেব বলেন, তিনি পাঠ্যাবস্থায় সীতাকুণ্ড মাদ্রাসায় পড়াকালিন জনাব হাজী আবদুল আজিজ ছাহেবের বাড়ীতে জায়গীর থাকিতেন। তাহারা বেশ ভদ্র ও প্রতিপত্তিশালী লোক হন। সেই গ্রামের প্রায় লোকজন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ যাইত ইহা দেখিয়া তিনি একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "মাইজভাণ্ডার দরবারের বুজর্গির প্রমাণ কি"? ইহাতে তিনি হাজী ছাহেবের ছেলে ও গ্রামবাসীর নিকট নিম্নের ঘটনাটা শুনিয়া বিস্ময়ে অবাক-হইয়া রহিলেন। হাজী ছাহেবের ছেলে বর্ণনা করেন যে–

"আমার বাবাজান দুই তিন বৎসর হয় এন্তেকাল করেন। তিনি যখন হজ্ব করিতে যান; তাহার টাকা পয়সা তথায় হরণ হইয়া যায়। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়ী আসার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া হেরেম শরীফের বারান্দায় বসিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অতিদুঃখে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রে এক অপরিচিত মানব হঠাৎ তাহার সামনে আসিয়া তাহার কান্নাকাটির কারণ জানিতে চাওয়ায় তিনি সবিস্তারে নিজের দুঃখের কারণ

জানাইলেন। লোকটি অত্যন্ত সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাহার তেমন উপকার করিতে পারিবেন না, তবে আগামীকল্য মগরেবের নামাজের পর তাহার সহিত দেখা করিলে তিনি এমন একজন কামেল লোকের সন্ধান দিতে পারিবেন যিনি দয়া করিলে তাহার যাবতীয় দুঃখ কষ্ট লাঘব ও উদ্দেশ্য সফল হইবে।

পরদিন তিনি ঐ লোকটির সঙ্গে যথাস্থানে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন হজরত ছাহেব কেবলা নামায পড়িয়া বাহিরে আসিতেছেন। লোকটি সামান্য কিছুদূরে থাকিয়া তাহাকে হাতের ইসারায় দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, যিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন; তিনি মাইজভাণ্ডারী মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ জনাব আহমদুল্লাহ্ ছাহেব। তাঁহার খেদমতে গিয়া সত্ত্বর নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন কর। দেরী করিলে তাঁহাকে পাইবে না। আমার বাবা ইতিপূর্বে তাঁহাকে–চিনিতেন না। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার পাক চরণে পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এবং নিজ বিপদের কথা ব্যক্ত করিলেন।

হজরত তাহাকে বলিলেন, "কোন ভয় নাই আল্লাহ্ সাহায্যকারী বিদ্যমান আছেন।" অতঃপর হজরত তাহার মস্তক মুখমণ্ডল সহ একখানা, বস্ত্রদ্বারা আবৃত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালন করিলে হজরত তাহার ডানবাহু ধরিয়া তাহাকে হাটিতে বলিলেন। হজরতের নির্দেশমত কিছুক্ষণ পথ চলার পর তিনি অনুভব করিলেন যেন তাহার দক্ষিণ বাহু হালকা হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল যেন হজরতের বাহু মোবারক তাহার বাহুর উপর নাই। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন অবশ মনে হইল। তিনি আর চলিতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডার পরিবর্তে তাহার ভীষণ গরম অনুভুত হইতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন। মুখ হইতে কাপড় উঠাইয়া হজরত আছেন কিনা তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন, হজরত নাই। এবং নিজকে তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বিমূঢ়ের মত অনেক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে তাহার হুস হইলে বাড়ীতে গেলেন। সকলে তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। তিনি অকপটে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। পরদিন তিনি

সপরিবারে প্রথমে দরবার শরীফে হজরতের খেদমতে হাজির হইয়া ভক্তিপূর্ণ কদমবুচি জানাইলেন। এই ঘটনার পর হইতে উক্ত গ্রামের লোকেরা মাইজভাণ্ডার যাওয়া আসা আরম্ভ করেন।"

উক্ত ঘটনা শ্রবনের পর মৌলানা মোহাম্মদ ইদ্রিচ ছাহেবের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এবং তিনিও দরবার শরীফ আসিয়া হজরতের অফুরন্ত আধ্যাত্মিক নেয়ামতের ভাগী হইতে লাগিলেন।

হজরতের বেলায়েতী ক্ষমতায় নাজির হাট হইতে বাজার প্রেরণ

মাইজভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী ঠাণ্ডা মিঞা সওদাগর ছাহেব বলেন, একদা তাহার পিতা মরহুম ওয়াশিল মিঞা ছাহেব নাজির হাটে বাজার করিবার সময় হঠাৎ হজরত ছাহেব কেবলাকে হাটের মধ্যে দেখিতে পান। তিনি তাঁহাকে ভক্তিভাবে কদমবুচি করিয়া সরিয়া যাইতেই, হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওয়াশীল মিঞা! তুমি বাড়ী যাওয়ার সময় আমার এই বাজারের দ্রব্যগুলি নিয়া আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিও।" তিনি অত্যন্ত আদবের সহিত তাঁহার হাত হইতে বাজার থলিয়াটি নিলেন এবং মনে করিলেন, হজরতের যাইতে বোধহয় দেরী হইবে। অন্য কাহাকেও বোধহয় পান নাই। তাই তাহাকে বাজার নিতে দিয়াছেন।

অতঃপর ওয়াশীল মিঞা নিজ বাজার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় হজরতের বাজার থলিয়াটি তাহার বাড়ীতে নিয়া পৌঁছাইয়া দেন। সেখানে সকলে প্রশ্ন করিতে লাগিল, বাজারগুলি কাহার? তিনি উত্তরে বলিলেন যে "বাজার আপনাদের।" হজরত কেবলা আমাকে নাজির হাট হইতে আনিতে দিয়াছেন। তাহারা তাহাকে জানাইলেন যে হজরত কেবলা আজ সারাদিন হুজুরা শরীফ হইতে বাহিরও হন নাই। শেষ পর্যন্ত ওয়াশীল মিঞা হজরতের হুজুরা শরীফে যাইয়া তাহার নিকট বলিলেন, "হুজুর! আপনি কি এই বাজারগুলি আনিবার জন্য আমাকে নাজিরহাটে দেন নাই?" হজরত ইসৎহাস্যে মৃদু উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ দিয়াছি। তুমি দিয়া চলিয়া যাও।"

ইহাতে উপস্থিত সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। হজরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বাজার প্রেরণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

এইভাবে হজরত একই স্থানে থাকিয়া – বহুলোকের সাথে একই সময়ে দর্শনদান,–বিপদ বারণ, সঙ্কটহরণ এবং স্মরণের সঙ্গে স্মরণকারীকে যে কোন প্রকার সাহায্য করিয়া বেড়াইতেন। ইহা তাঁহার বেলায়েতী তছার্রোফের উচ্চতম ক্ষমতা যাহা সর্বোচ্চ গাউছিয়াত ও কুতবিয়তের স্পষ্ট প্রমাণ ও পরিচায়ক। তাঁহার নিকট কোন প্রকার জাতীভেদ নাই। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান ধনী-নির্ধনের কোন প্রশ্নই নাই। যে তাঁহার দরবারে ভক্তি নিয়া আসে বা যে কোন স্থানে থাকিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে একবার স্মরণ করে, তাহাকে তিনি অকাতরে, অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য ও সহায়তা করিয়া থাকেন। হজরত পীরানে পীর দস্তগীর (রঃ) এর সামনে সারা পৃথিবী যেমন একটি সরিষার দানা সাদৃশ, তেমনি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর নিকটও সমগ্র পৃথিবী যেন একটি সরিষা তুল্য।

পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি-জ্বীনপরী জীবজন্তু গাছপালা তরুলতা সকলই – তাঁহার অনুগত। পৃথিবীর যাবতীয় বলামুছিবতও যেন তাঁহার ইঙ্গিতবাহী আজ্ঞাবহ দাস। সকলেরই রীতিনীতি কার্যক্রম যেন তাঁহারই প্রভাবে সংঘটিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব

নানুপুর নিবাসী মুন্সি খায়ের উদ্দিন ডাক্তার ছাহেব একদা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রির শ্বাশুড়ি হজরতের একজন নিষ্ঠাবতী ভক্ত রমণী ছিলেন। তিনি সময় সময় হজরতের খেদমতে হাজির হইতেন। এক সময় দোয়া প্রার্থীনী হইয়া তিনি সন্ধ্যাকালে তাঁহার খেদমতে হাজির হন। পানাহারে রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় তিনি বাড়ী যাইতে অপারগ হন। তবুও তিনি বাড়ী যাইবার জন্য হজরতের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। হজরত তাহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি খুব ভোরে চলিয়া যাইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।
সকালে ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি যখন চলিয়া যাইবার জন্য তৈয়ার হইলেন তখন দেখিলেন সূর্য্য প্রায় উঠিবার সময় হইয়াছে। পূর্বদিক প্রায় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাড়াতাড়ি হজরতের নিকট আসিয়া বলিলেন, "হুজুর! গত রাত্রে আপনি যাইতে বারণ করায় আমি যাই নাই। মনে করিয়াছিলাম সকালে সূর্য্য উঠার আগে চলিয়া যাইব। এখন তো সূর্য্য উঠিয়া যাইতেছে। চারিদিকে লোকজন চলাফেরা করিতেছে। বাড়ীতে না গেলে আমার স্বামী বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। এখন কি করি"।

তাহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া হজরত বলিলেন, "তোমার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। তোমাকে কেহ দেখিবে না, সূর্য্য উদয়ের পূর্বেই তুমি বাড়ী পৌঁছিয়া যাইবে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়া নিরুদ্বেগে বাড়ী চলিয়া যাও। তোমার না পৌঁছা পর্যন্ত সূর্যোদয় হইবে না।" কালবিলম্ব না করিয়া হজরতের আদেশ মত তিনি বাড়ী রওনা হইলেন। পথে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পাইলেন না। দরবার শরীফ হইতে তাহার বাড়ী প্রায় সাড়ে তিন

মাইল দূরে অবস্থিত। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পরও দেখিলেন সূর্যোদয় হয় নাই। ইহাতে তিনি হজরতের পবিত্রবাণীর প্রভাব উপলব্ধি করিয়া হজরতের অত্যধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে শোকরিয়া আদায় করিতে লাগিলেন।

হজরতের প্রতি ব্যাঘ্রের আনুগত্যতা

একদিন হজরতের প্রিয়তমা কন্যা মোছাম্মৎ ছৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা বিবি হজরতের নিকট ছোট কালে আবদার করিয়া জানাইয়া ছিলেন, "বাবা আমি তো কোনদিন বাঘ দেখিনাই। বাঘ দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা। আমাকে বাঘ দেখাইতে হইবে"।
হজরত তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা বাবা"।
একদিন অনেক রাত্রে হজরত ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাঘ দেখিতে কে কে ইচ্ছা করিয়াছ! বাহিরে তাকাইয়া দেখ। বাঘ আসিয়া তোমাদের সামনে উঠানে দাঁড়াইয়া আছে"।
তখন সবাই ঘরে থাকিয়া উঁকি মারিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল। দেখিল, প্রকাণ্ড বলিষ্ঠকায় একটি বাঘ, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কে যেন উহাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বন্দি করিয়া রাখিয়াছে। যেন কাহারো পোষা শিক্ষিত বাঘ। এইরূপ প্রায় সময়ে নিঝুম রাত্রে সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী দিগকেও হজরত আকদাছের খেদমতে আসিতে দেখা যাইত।

হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে সাধারণ দ্রব্যে অদ্ভুতভাবে কলেরা রোগ নিরাময়

হজরতের এক ভক্ত জেয়াউল হোছাইনের স্ত্রীর এক সময় কলেরা রোগ হয়। ডাক্তারী চিকিৎসায় হতাশ হইয়া এবং রোগীর অবস্থা ভয়ানক দেখিয়া তিনি উন্মাদের মত যাইয়া হজরতের পায়ে স্ত্রীর প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। হজরত তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভাই ছাহেব। অতি শীঘ্র আপনার বিবিকে নারিচ পাতার ঝোল পাকাইয়া খাওয়াইয়া দিন। আল্লার হুকুমে

আপনার বিবি আরোগ্য লাভ করিবে।” তিনি অতি স্বত্ত্বর বাড়ী গিয়া হজরতের নির্দেশমত নারিচ পাতার ঝোল পাকাইলেন। এবং রোগীকে খাওয়াইতে উদ্যত হইলে ডাক্তার কবিরাজগণ যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা বলিলেন যে, উহা খাওয়াইলে রোগী এখনই মারা যাইবে। তিনি কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ণ একপাত্র নারিচ পাতার ঝোল রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেন। খোদার কি অপার মহিমা! হজরতের বাক্যে কি অপূর্ব ক্ষমতা! সাধারণ নারিচ পাতার ঝোলেই রোগীর কলেরার উপসর্গ সমূহ বন্ধ হইয়া রোগী ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িলেন। রোগী ঘুম হইতে জাগিলেই খুব দুর্বলতা অনুভব করেন, এবং হজরতের নির্দেশিত নারিচ পাতার ঝোল পুনরায় খাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। জেয়াউল হোছাইন ছাহেব রোগীকে পুনরায় নারিচ পাতার ঝোল ও কিছু শাকভাত খাওয়াইয়া দিলেন। কি ভয়ানক ব্যাপার! ইহাতে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতে থাকে। কলেরার উপসর্গ সমূহ দ্বিগুণবেগে আরম্ভ হইল। তিনি দৌড়িয়া হজরত সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা হুজুরের খেদমতে পেশ করিলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, “আমি তো আপনাকে দুইবার খাওয়াইতে বলিনাই এবং শাকভাতও দিতে বলিনাই। যান পুনরায় শুধু ঝোল খাওয়াইয়া দেন।” তিনি বাড়ীতে গিয়া পূনরায় নারিচের ঝোল খাওয়াইয়া দেন; ইহাতে রোগী পূনরায় শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়েন, এ রোগের উপসর্গ সমূহ তীরোহিত হইয়া যায়। খোদার ফজলে রোগীকে অন্য ঔষধ খাওয়াইতে হয় নাই। রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া যায়।

যষ্টির প্রহারে কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে হজরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রকাশ

চট্টগ্রাম টাউন নিবাসী একজন ধনী লোক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া বহুদিন যাবত কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি হজরতের বেলায়েতী প্রভাবের কথা লোকমুখে শুনিয়া, রোগমুক্তির আশীর্বাদ কামনায় একদিন হজরতের দরবারে উপস্থিত হন।

তিনি হজরতকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! আমি যত জায়গায় যত বড় কবিরাজ ডাক্তারের নাম শুনিয়াছি তাহাদের দ্বারা সাধ্যাতীত অর্থ-ব্যয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি আমার জটিল রোগ কিছুতেই আরোগ্য হয় নাই। আমি রোগ যন্ত্রনায় জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি। অতঃপর আপনার কথা শুনিয়া অতি আশায় শেষ বারের মত চেষ্টা করিতে হুজুরের দরবারে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া হজরত বলিয়া উঠিলেন, "আরে কমবখ্‌ত, নাফরমান! তুমি খোদাকে ভয় করনাই কেন? তোমার মত পাপীকে দোররা মারা দরকার" ইহা বলিয়াই তিনি তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা তাহাকে স্বজোরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এমনভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন যে উপস্থিত লোকেরা হায় হায় করিতে লাগিল। একেতো কুষ্ঠরোগে শরীর ক্ষতবিক্ষত, তদুপরি হজরতের লাঠির আঘাত। লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, হয়তঃ লোকটির জীবনায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। হজরতের লাঠির আঘাতে লোকটি বিচলিত হইল না বা যন্ত্রনা সূচক কোন শব্দও করিলনা। কিছুক্ষণ প্রহার করার পর হজরত অন্দর হুজুরায় চলিয়া গেলেন। লোকটি ধীরে ধীরে উঠিয়া গোছল করিয়া আসিল। অতঃপর হজরত বহির্বাটীতে আগমন করিলে লোকটি হজরতকে কদমবুচি করিয়া চলিয়া যান। প্রায় তিন মাস পর লোকটি পুনরায় হজরতের খেদমতে আসে। এখন তাহার শরীরে আর কুষ্ঠরোগ নাই। ক্ষতের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলিলেন যে তিনি এখান থেকে যাওয়ার পর আর কোন ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। হজরতের লাঠি মোবারকের আঘাতেই তাহার জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বরিষন করিয়াছে। হজরতের ফয়েজ রহমত ও দোয়ার বরকতে আশাকরি আমি চিরতরে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এই রূপে হজরত বিভিন্ন পদ্ধতীতে তাঁহার ফয়েজ রহমত দান ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে মানবের উপকার করিতেন।

যষ্টির প্রহারে আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও অনুগ্রহ বর্ষণ

রাউজান থানার অধিবাসী জনৈক বৌদ্ধ দারোগা,–দারোগার চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিতে যখন সহরে আসেন, তখন তাহার মাতা নিয়ত করেন যে "আমার ছেলে চাকুরী পাইলে প্রথম বেতন হইতে একটাকার মিছরী লইয়া ছেলেকে মাইজভাণ্ডারে ফকীর মৌলবী ছাহেবের খেদমতে পাঠাইব।" ছেলে পরীক্ষা দিয়া খোদার ফজলে চাকুরী পাইল। প্রথম মাসের বেতন লইয়া বাড়ীতে গেলে তাহার মাতা বলিলেন,–"বাবা তোমার প্রথম মাসের বেতন হইতে একটাকার মিছরী লইয়া তোমাকে মাইজভাণ্ডার পাঠাইবার আমার নিয়ত ছিল। সুতরাং–এক টাকার মিছরী লইয়া তুমি মাইজভাণ্ডার ফকীর মৌলবী ছাহেবের কাছে যাও।" ছেলে বলিলেন, "মা একটাকার তো প্রায় পাঁচসের মিছরী পাওয়া যাইবে। এত মিছরী কি ফকীর ছাহেব খাইবেন! দুই এক সের মিছরী লইয়া বাদবাকী পয়সাগুলি ফকীর ছাহেবকে দিলে বোধহয় ভাল হইবে।" ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মা বলিয়া উঠিলেন, 'সর্বনাশ! তুমি কি বলিতেছ। আমার যাহা নিয়ত তাহা করিবে। সাবধান আর কিছু বলিও না। তুমি মাটিতে মাথা রাখিয়া খতকর। ক্ষমা চাও। তিনি সব গোপন কথা জানেন।" ছেলে বলিলেন "মা! আমি ভুল করিয়াছি। ক্ষমা চাহিতেছি।" অতঃপর এক টাকার মিছরী কিনিয়া মায়ের কথামত দরবার শরীফে আসিলেন। তখন দুপুর বেলা।

লোকজন খুব কম। সবাই যেন ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে রহিয়াছে। হজরত ভীষণ জালালী অবস্থায় আছেন। লোকজন সামনে গেলে লাঠি দিয়া প্রহার করেন। রাউজানের বৌদ্ধ লোকটি একজন খাদেমকে ডাকিয়া তাহাকে হজরতের সামনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। কারণ তাহার মায়ের আদেশ আছে যে কোন প্রকারেই হউক ফকীর ছাহেবের সহিত দেখা করিতে হইবে। অগত্যা খাদেম ছাহেব লোকটিকে হজরতের সামনে নিয়া দিলেন। তাহাকে দেখিয়াই হজরত বলিয়া উঠিলেন, "অত মিছরী কেন আনিয়াছ, ফকীর ছাহেব কি অত মিছরী খাইবে? দুই একসের হইলেতো হয়।" ইহা শুনিয়া বৌদ্ধ দারাগো ছাহেবের মায়ের কথা মনে পড়িল। তিনি

অবনত মস্তকে হজরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হজরত স্বজোরে দারাগো ছাহেবকে লাঠি দ্বারা তিনটি আঘাত করিলেন। তার পর তাহাকে এক টুকরা মিছরী হাতে দিয়া বলিলেন "চলিয়া যা এই মিছরী টুকরা তোর মাকে দিস্। অসৎ, অসৎ কাজে গিয়াছিলি! সৎভাবে থাকিস! ভাল হইবে।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

হজরত মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেব যিনি হজরত কেবলা কাবার একমাত্র সাজ্জাদানশীন আওলাদ ও ওয়ারেছ, বলেন, "যখন আমি হজরতের নামে প্রতিষ্ঠিত জুনিয়র মাদ্রাসাঘরের বিলের টাকা উঠাইয়া আনিতে চট্টগ্রাম সহরে যাই; যেখানে ট্রেজারীতে আসাকালিন উক্ত অবসরপ্রাপ্ত বৌদ্ধ দারোগাবাবুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার পরিচয় পাইয়া হঠাৎ তিনি শিহরিয়া উঠেন। এবং শরীর হইতে জামা ও কোট খুলিয়া আমাকে বলেন, "দেখুন তাঁহার নাম শুনিয়া আমার গায়ের লোম কি ভাবে খাড়া হইয়া গিয়াছে। তিনি কি সহজ আউলিয়া ছিলেন?" অল্প সময়ে দারোগা বাবু আমাকে তাহার সাধ্যমত সমাদর ও ভক্তি দেখাইলেন। এবং উপরে লিখিত ঘটনাটি বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন "আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি তিনি আমাকে যখন আঘাত করিয়াছিলেন তখন আমি শুধু আঘাতের শব্দ শুনিয়া ছিলাম কিন্তু আঘাত জনিত কোন কষ্ট পাই নাই। আচ্ছা বাঘের মুখে নিক্ষেপিত লোটাটি কি এখনও আছে? যাহাকে তিনি এই লোটা নিক্ষেপপূর্ব্বক বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি আমাদের এলাকার লোক।" আমি জানাইলাম যে, হাঁ লোটাটি এখনও আছে।

পানি তবার্‌রোক দানে গলক্ষত রোগ আরোগ্য

রাউজান থানার রায়বাহাদুর রাজকুমার বাবুর ছোটকালে গলার ভিতর এক বিষাক্ত গলক্ষত রোগ হয়। বহু চিকিৎসার পরও কোন সুফল না পাওয়ায় তাহার পিতা মহাশয় "ওয়ালীমস্তান" নামে হজরতের এক ভক্তের সঙ্গে একপাত্র দুধ দিয়া তাহাকে হজরত ছাহেবের খেদমতে পাঠাইয়া দেন।

দুধের পাত্র হজরতের সামনে রাখিয়া “ওয়ালীমস্তান ছাহেব” হজরত সমীপে রাজকুমার বাবুর রোগ আরোগ্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন।

হজরত দুধগুলি একটি বড় পাত্রে ঢালিয়া রাখিতে আদেশ দেন। দুধ ঢালিয়া রাখা হইলে “ওয়ালীমস্তান” উক্ত ভাণ্ডে করিয়া পুকুর হইতে কিছু পানি আনিয়া হজরত সমীপে রাখেন এবং দম করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। হজরত পানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া দূরে থাকিয়া একটি মাত্র দম করিলেন। মোস্তান ছাহেব পানির পাত্রটি বাহিরে আনিয়া রাজকুমার বাবুকে সমস্ত পানি পান করাইলেন। পানের সময় দেখিলেন, উহা এত গরম যে, যেন ফুটন্ত পানি; অথচ পানে কোন কষ্ট হয় নাই। তাহারা বিদায় লইয়া বাড়ী রওনা হইলেন। পথে সর্ত্তাখালে নামিয়া রাজকুমার বাবু ভাবিলেন “পানি পান করিতে খুব কষ্ট হইত। অথচ হজরতের “দমকরা” পানিতে তো কোন কষ্ট হয় নাই। এখন খালের কিছু পানি পান করিয়া দেখি কষ্ট হয় কিনা।” তিনি কিছু পানি পান করিয়া দেখিলেন। কই নাতো! কোন কষ্ট নাই, ইহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

বাড়ীতে গিয়া তাহার বাবাকে তাহার আরোগ্য সংবাদ দিলেন। তাহার মাতা তাহার রোগ আরোগ্য বিষয় পরীক্ষা করার জন্য তাহাকে চিড়া দধি খাইতে দিলেন। রাজকুমার স্বচ্ছন্দে খাইয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাহার পিতামাতা অত্যন্ত খুসি হইয়া রাজ কুমারকে সামনের সপ্তাহে পুনরায় ফকীর ছাহেবের জন্য পেরা মিঠাই লইয়া পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

পর সপ্তাহে ওয়ালী মস্তানের সহিত রাজকুমারকে পেরামিঠাই দিয়া পুনরায় পাঠাইলেন এবং যাহাতে রাজকুমার ভবিষ্যতে ধনেজনে বিদ্যাবুদ্ধিতে ঐশ্বর্যশালী ও দীর্ঘায়ু হয়, তাহার জন্য দোয়া চাহিতে বলা হয়।

এইবার হজরত তাহাকে যথারীতি নাম ধাম পিতার নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার উত্তর করিলেন, “হুজুর নাম রাজকুমার। বাবা আমাকে এই পেরাগুলি লইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন। আমি আপনার আশীর্বাদে গলক্ষতরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার দীর্ঘায়ু, বিদ্যাবুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও যশঃমানের জন্য বাবা আশীর্বাদ করিতে বলিয়াছেন।”

হজরত ছাহেব আমার মাথা ও পিঠের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা আশীর্বাদ করিলাম। তুই বড় লোক হবি।"
ইহার পর হইতে কোন দিন কোন পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন নাই। বি, এ, পাশ করিয়া এম, এল, সি হইয়াছেন। রায়বাহাদুর খেতাব পাইয়াছেন।
মৌলানা শাহ ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব বলেন, "যখন মরহুম সাহজাদা খায়রুল বশর মিঞা, হাইদকান্দি নিবাসী মৌং ছিদ্দিক আহমদ বি, এল ও ছৈয়দ ছায়াদুল্লাহ, সহ তখনকার 'বি' ডিভিসনের এস ডি-ও মৌং ছৈয়দ মোহাম্মদ হামিদ হাছান নোমানী ছাহেবের বাসায় দরবার শরীফস্থ মোছাফেরদের সুবিধার্থে কতেক গঠনমূলক কার্য্যের পরামর্শ ও সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাই, তখন উক্ত এস-ডি-ও ছাহেব রায়বাহাদুর রাজকুমার বাবুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। রায় বাহাদুর হজরতের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার সাথে সাথে বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিলেন। আমার তো সমস্ত শরীর আলোড়ন করিয়া উঠিয়াছে। ইনি কি সেই ফকীর হজরত ছাহেবের পৌত্র! যিনি আমার জীবন দাতা বিদ্যাদাতা, ঐশ্বর্য্য দাতা ও সর্বস্ব দাতা! যাঁহার আশীর্বাদে আজ আমি রায়বাহাদুর বলিয়া আপনাদের সাথে পরিচিত। ইহা বলিয়া তিনি একশত টাকার একখানা চেক কাটিয়া দিয়া বলিলেন যখন দরকার মনে করেন আমাকে জানাইলে আমি যথাসাধ্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিব।
সেইদিন তিনি তাহার বাল্যকালের উপরোক্ত ঘটনাটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন।

তবার্‌রোক মাধ্যমে জটিল রোগমুক্তি

নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ছিলনীয়ার নেয়াজপুর গ্রাম নিবাসী মরহুম মাইজুদ্দিন ভূঁইয়ার পুত্র হাজী হাফেজ আহমদ উল্লাহ্ ভূঁইয়া ছাহেব বলেন,
আমি কোন এক সময় এমন এক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, যাহার কোন প্রকার চিকিৎসা না পাইয়া আমি জীবনের আশায় একেবারে হতাশ হইয়া

পড়িয়াছিলাম। শেষে লোকমুখে হজরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রশংসা-শুনিয়া তাহার খেদমতে দোয়াপ্রার্থী হইয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

আমি এক সের খোরমা লইয়া হজরতের দরবারে আসিয়া বহির্দায়েরা শরীফে প্রবেশ করিতেই ভিতর বাড়ী হইতে ছয় সাত বৎসরের একজন ছেলে আসিয়া বলিলেন, "নোয়াখালী হইতে আগত মোছফেরকে হুজুর তলব করিয়াছেন। সেখানকার কেহ ইহাতে সাড়া না-দেওয়ায় আমি বলিলাম, আমিই তো নোয়াখালীর লোক। তখন বালকটি আমাকে বলিলেন, আপনাকে হুজুর ডাকিয়াছেন পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলাম, বালকটা হজরতের নাতী "দেলাময়না"। যিনি বর্তমান গদীনশীন,- হজরত মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেব যাহাকে হজরত অতি স্নেহ ভরে "দেলাময়না" নামে অভিহিত করিতেন। অতঃপর আমি তাঁহার সহিত আন্দর বাড়ীতে হজরতের হুজরায় হাজির হইলাম। হজরত তখন চক্ষু মুদিতাবস্থায় বসিয়া আছেন। আমি প্রবেশ করিয়া ছালাম দিতেই আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি-তিনবার তাঁহার প্রশ্নোত্তরে নাম বলিলাম। তিনি চক্ষু বন্ধাবস্থায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন আসিয়াছেন" আমি বিনীতভাবে তাঁহার কাছে আরজ করিলাম, হুজুর! অনেক দিন যাবত রোগে কষ্ট পাইতেছি। কোন ঔষধেই ফল পাইতেছিনা। নিরুপায় হইয়া হুজুরের খেদমতে দোয়ার জন্য আসিয়াছি। এই বলিয়া খোরমাগুলি তাঁহার সামনে রাখিলাম। তিনি খোরমাগুলির উপর হাত রাখিয়া একটি খোরমা আমাকে দিয়া বলিলেন; "দোয়া করিতেছি" উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক একটি খোরমা বণ্টন করিয়া দিয়া একটি খোরমার অর্ধেকাংশ তিনি নিজ মুখে দিলেন এবং অপরাংশ তাঁহার পৌত্র দেলাময়নার হাতে দিয়া বলিলেন, "খোরমাগুলি ছৈয়দের বেটীকে দিয়া আসেন।"

আমি বিমারের কথা বলিলাম বটে; কিন্তু তিনি আমার কি বিমার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমিও বলিলাম না। মনে করিয়াছিলাম পরে বলিব কিন্তু ইহার পুর্বেই তিনি আমাকে বিদায় দিয়া দিলেন।

কি করিব। হজরতের খেদমত হইতে বিদায় পাইয়া অগত্যা বাড়ীর প্রতি রওনা হইলাম। পথে চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি ব্যাপার আমি আসিয়া দায়েরায় প্রবেশ করা মাত্রই আমার ডাক পড়িল। আমি যে নোয়াখালী হইতে আসিয়াছি তাহা তিনি কি করিয়া জানিলেন। নিশ্চয় তাঁহার কশ্‌ফ আছে।

অসুখের কথা কিছু খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। মনকে প্রবোধ দিলাম, আমি না বলিলেও নিশ্চয় তিনি জানেন। বলার হয়তো দরকার ছিল না। তাই জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

আমি বাড়ী যাওয়ার পর হইতে খোদার ফজলে ও হজরতের দোয়ার বরকতে দিন দিন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবং কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইয়া গেলাম। একটি মাত্র খোরমার দ্বারা হজরত আমাকে কি মহৌষধ যে খাওয়াইয়া দিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। সেই হইতে – আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁহার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়িয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম তিনি একজন সর্বশ্রেষ্ঠ অলিউল্লাহ্‌। সেই হইতে আমি প্রায়ই দরবার শরীফ যাওয়া আসা করিতেছি।

সরবৎ দানে হজরতের ফয়েজ বর্ষণ ও আত্মশুদ্ধি করণ

একদা হজরত স্বীয় খাদেম হেদায়েত আলীকে রমজানের দিনে সরবৎ পান করাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত ছাহেবানী বলিলেন: সেত রোজা রাখিয়াছে। আপনি রোজার মধ্যে তাহাকে সরবৎ পান করাইতেছেন কেন? তাহাকে তাড়াইয়া দেন। সে কোন কাজ কর্ম করেনা, শুধু বসিয়া বসিয়া খাইতেছে।” হজরত ছাহেব উত্তর করিলেন, “তাহাকে ছাপ করিয়া দিলাম। দেখিলাম সংসারে তাহার বাড়ীঘর নাই; সুতরাং তাহাকে তাড়াইয়া দিলে সে কোথায় যাইবে। সে আপনার বাড়ীর আস্তানায় ঝাড়ু দিবে। আপনি তাহাকে একমুটা ভাত দিলে সে তাহা খাইয়া কবুতরের মত আপনার আঙ্গিনায় পড়িয়া থাকিবে। আর না দিলে পানি খাইয়া থাকিবে। হজরতের কথায় হজরত ছাহেবানী চুপ হইয়া গেলেন। মগরেবের নামাযান্তে তিনি

মোরাকাবায় বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, হজরত হেদায়ত আলীর কি ছাপ করিতেছেন। তিনি দেখিলেন হেদায়ত আলীর বক্ষের উপরিভাগ সাদা তদ্‌নীম্নভাগ লাল; ও তদ্‌নীম্নভাগ লাল ও কাল। লাল ও কাল ভাগ ক্রমশঃ সাদা হইয়া সর্বোপরি সাদা ভাগের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। তখন হজরত ছাহেবানী বুঝিতে পারিলেন, হজরত সরবত দানে হেদায়েত আলীর আত্মশুদ্ধিই করিতেছেন। সেই দিন হইতে তিনি আর হজরতের কোন কাজে আপত্তি করিতেন না।

হজরতের আদেশের প্রভাবে দুধ ও কলা খাইয়া কামড়ি রোগ মুক্ত

বরমা হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মৌলবী মীর আহমদ ফারুকী ছাহেব বলেন, তিনি মোহছনীয়া মাদ্রাসায় পড়াকালীন তাহার মামা মৌলবী লুৎফর রহমান ছাহেবের সহিত মাইজভাণ্ডার হজরত ছাহেব কেবলার খেদমতে আসেন। তিনি তাহার আম্মাজানের পেটকামড়ী রোগের আরোগ্যের জন্য হজরতের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "তোমারী আম্মীকো কেলা আওর দুধ খানে কো বলো আচ্ছী হো যায়েগী।"

বাড়ী যাইয়া তিনি তাহার মাতাকে বলিলেন। তাহার মাতা তিন দিন তাহা খাওয়ার পর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন। ইহাতে তাহার মাতা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এতদিন এত দুধ ও কলা খাইয়াছেন; কত ঔষধ খাইয়াছেন; কোন ফল হইলনা অথচ হজরতের আদেশে তিনদিন দুধ ও কলা খাইয়া তাহার এমন রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। যাহা আরোগ্য হইবে বলিয়া আশা করিতে পারে নাই। তিনি স্থির করিলেন, ইহা নিশ্চয় হজরতের আদেশের ফয়েজ বরকত মাত্র।

রুটি প্রদানে ফয়েজ এনায়েত

উপরের বর্ণনাকারী মৌলবী মীর আহমদ ফারুকী ছাহেব আরো বলেন, তাঁহার মামা মৌং লুৎফর রহমান ছাহেব, হজরতের নিকট বায়াত গ্রহণের নিমিত্ত তিনবার আসিয়া চেষ্টা করেন। পূনঃ একদিন বায়াত গ্রহণের জন্য হজরতের খেদমতে আরজ করিলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "আলগ্ হো যাও" "কুনজশ্ক্কে তর্হা হো যাও।" অতএব তিনি আদেশ মত দূরে সরিয়া গেলেন। হজরত তাহাকে বায়াত করিলেন না।

আমরা সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে চাহিলাম। উত্তর আসিল পাওয়া যাইবে না। অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল, পাঁচখানা বড় রেকাবীতে অল্প অল্প জল ভাত লটিয়া শুটকি ও মিঠা কুমড়ার তরকারী সহ আমাদের জন্য আনা হইয়াছে। আমরা উহা খাইতে আরম্ভ করিলাম। পরে দেখি আবার গরমভাত ও গোস্ত আসিয়াছে তাহা হইতে আমরা পেট ভরিয়া খানা খাইলাম।

আন্দর বাড়ী হইতে একজন খাদেম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লুৎফর রহমান কে?" তখন আমার মামুছাহেব উত্তর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খাদেম ছাহেব তাহার হাতে একখানা রুটি দিয়া বলিলেন, "হজরত ছাহেব কেবলা তোমাকেই খাইতে দিয়াছেন।" আমার মামু-ছাহেব অত্যন্ত আনন্দের সহিত উহা খাইয়া ফেলিলেন, সেই দিন হইতে দেখা গেল তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবাদত বন্দেগিতে তাহার আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হজরতের অপূর্ব্ব কেরামত, ব্যাঘ্রের কবল হইতে প্রাণ রক্ষা

বরিশাল নিবাসী একজন লোক হজরতের কামালিয়ত সম্বন্ধে শুনিয়া অত্যাগ্রহে তাঁহার দরবারে আসিয়া তাঁহার হাতে বায়াত গ্রহণ করিতে নিয়ত করিলেন। নেজামপুরে আসিয়া তিনি বারৈয়াঢালা পার হইয়া মাইজভাণ্ডার আসিবার মানসে পার্বত্য পথ ধরিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তাহার অত্যন্ত পায়খানার হাজত হয়। তিনি রাস্তার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পায়খানার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন এক ভীষণাকৃতি ব্যাঘ্র বজ্রের মত গর্জন করিয়া তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি ব্যাঘ্রের বিকট মূর্তি দর্শনে ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন হায়। আর বুঝি রক্ষা নাই। জীবন বোধ হয় ব্যাঘ্রের কবলে হারাইতে হইবে। আমার মত হতভাগা আর কে আছে। একজন অলি আল্লাহ্‌র দরবারে যাইয়া পাপময় জীবনকে সার্থক করিব মনে করিয়াছিলাম। তাহা আর হইল কৈ? বোধহয় তাঁহার খেদমতে যাওয়া আমার ভাগ্যে নাই। হায় আল্লাহ্‌! তোমার দোস্তের দরবারে যাইতে বুঝি আমাকে দিলে না? এই সমস্ত চিন্তা করিতেই হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, এক সৌম্যমুর্তি পুরুষ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া 'দূর হও হারামজাদা' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া ব্যাঘ্রের মাথায় স্বজোরে আঘাত করিলেন। যষ্টির ভীষণ আঘাতে ব্যাঘ্রটি চিৎকার করিয়া পলাইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটিও কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই মহাসঙ্কট হইতে কে এই মহাপুরুষ

আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। তিনি যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন তখন পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মাইজভাণ্ডারীর দরবারে যাইতেছি, সেই জন্য বোধহয় আল্লাহ্ গায়েবী সাহায্য দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। দরবারের প্রতি তাহার ভক্তি পূর্ব অপেক্ষা আরো বাড়িয়া গেল।

দরবার শরীফে হাজির হইয়া তিনি হজরতকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করিয়া হঠাৎ এক চিৎকার দিয়া উঠিলেন। এবং হজরতের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হজরত তাহার পিঠের উপর হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন, মিঞা! আল্লাহ্র কুদরত দেখিয়া–এতই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ কেন? আল্লাহ্ তা'লা ইহা অপেক্ষা আরো দয়ালু। আরো ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু করিতে পারেন। হজরতের মধুর কালাম শুনিয়া লোকটি চুপ হইলেন হজরত আন্দর হুজরায় তশরিফ নিয়া গেলেন। উপস্থিত লোকগণ তাহার চিৎকার করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পথের সমস্ত ঘটনা তাহাদের নিকট বর্ণনা করেন।

লোকটি বলিলেন – পথের মধ্যে আমাকে উদ্ধারকারী লোকটিকে আমি কোন ফেরেশ্তা অথবা খিজির (আঃ) বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি যে হজরত ছাহেবই তাঁহার এই লাঠি দিয়া বাঘের মাথায় আঘাত করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার প্রাণ রক্ষাকারীকে–হঠাৎ দেখিয়াই আমি নিজকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। সকলে ঘটনাটি শুনিয়া অবাক হইল।

হজরতের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রভাবে ব্যাঘ্রের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার

একদিন হজরত কেবলা জালালী হালতে পুকুর পাড়ে বসিয়া অজু করিতেছিলেন হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হারামজাদা তুই এখান হইতে দূর হস নাই।" এই বলিয়া তাঁহার হস্তের লোটাটি জোরে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করিলেন। তখনও তাঁহার অজু সমাপন হয় নাই। তাড়াতাড়ি খাদেমগণ অন্য লোটা আনিয়া দিলেন। তিনি অজু সমাপন করিয়া দায়েরা শরীফে চলিয়া যান। এ দিকে হজরত পুকুরে লোটা ফেলিয়া দিয়াছেন দেখিয়া খাদেমগণ পুকুরে নামিয়া লোটা তালাস করিতে লাগিলেন। অনেক তালাসের পরও যখন পাওয়া গেলনা তখন তাহারা হতাশ চিত্তে উঠিয়া গেলেন। অলিউল্লাহদের কার্য্য বুঝা মুস্কিল। তিনি গালি দিলেন কাকে এবং লোটাই বা পুকুরে কেন নিক্ষেপ করিলেন সকলে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এত তালাসের পর লোটা পাওয়া না যাওয়ার কারণই বা কি!

ইহার দুই দিন পর রাঙ্গুনিয়া নিবাসী আসমত আলী নামক হজরতের জনৈক ভক্তশিষ্য কিছু নাস্তা ও হজরতের পুকুরে নিক্ষেপ করা লোটাটি লইয়া দরবার শরীফ হাজির হইলেন। তিনি হজরতের খেদমতে যাইয়া লোটা ও নাস্তা গুলি সামনে রাখিলেন এবং কদমবুচি করিয়া অনেকক্ষণ যাবত হজরতের কাছে দাড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বাহিরে আসিলে সকলে তাহাকে লোটা কোথায় পাইলেন জানিতে চাহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, সেই এক অপূর্ব ঘটনা। এই লোটার মারফত হজরত আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। ভাই আমি গরীব মানুষ মনে করিয়াছিলাম; পাহাড় হইতে কিছু লাকড়ী আনিব। এবং বিক্রয় করিয়া যাহা পাইব তাহা দিয়া নাস্তা তৈয়ার করিয়া হজরতের জন্য আনিব। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হইতে প্রায় ৪২ মাইল দুরে রাঙ্গুনিয়া কোদালা পাহাড়ে গিয়া কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া এক গাছ তলায় আঁটি বাঁধিতেছিলাম। এমন সময় এক বিরাট বাঘ কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া আমার সামনে হাজির হইল। বাঘের আকস্মিক আক্রমন প্রচেষ্টায় অনন্যোপায় হইয়া আমি "এয়া গাউছুল আজম" বলিয়া চিৎকার

করিয়া উঠিলাম। ইহা বলিতে না বলিতেই অকস্মাৎ শূন্য হইতে একটি লোটা আসিয়া বাঘের মুখের উপর পতিত হইল। বাঘটি ভয়ে চিৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাইলাম। এবং লোটাটি হাতে লইয়া দেখিলাম, ইহা হজরতের লোটা। লোটাটি হজরতকে ব্যবহার করিতে আমি দেখিয়াছি। তাই লোটাটি ও লাকড়ীগুলি লইয়া বাড়ী আসিলাম এবং বিক্রয় করিয়া হজরতের খেদমতে আনিতে সামান্য নাস্তা তৈয়ার করিলাম। অদ্য এই লোটা ও নাস্তা লইয়া হজরতের খেদমতে হাজির হইয়াছি। আমাকে হজরত অসীম দয়া করিয়া তাঁহার বেলায়েতী ক্ষমতায় নরখাদকের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন! না হয়তো আমার উপায় ছিল না।

"আয়নায়ে বারী"

হজরতের যষ্টির প্রহারে ফয়েজ-রহমত দান ও মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার

ভুজপুর নিবাসী কবি ছৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ ছাহেব হজরতের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় হজরতের খেদমতে থাকিতেন। সর্ব্বদা রোজা রাখিতেন। ইহাতে তাহার শরীর অতিশয় দুর্বল ও কৃশ ছিল। তিনি সময় সময় হজরতের পদযুগল এমনভাবে জড়াইয়া ধরিতেন যে, বাহিরের লোকজন আসিয়া তাহাকে হজরতের পা হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইত।

একদিন হজরত বাড়ীর সামনের পুকুর পাড়ে "জজব" হালতে বসিয়া রহিয়াছেন। তখন ছৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ দৌড়িয়া আসিয়া হজরতের পা মোবারক দুই হাতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, কেহই তাহাকে ছিনাইয়া নিতে পারিতেছেন না। হজরত তাহাকে হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। একে তো দুর্বল শরীর তদুপরি হজরতের যষ্টির প্রহার। তিনি বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না। ধরাশায়ী হইয়া পড়িলেন। নাকে মুখে ফেনা আসিল। মৃত্যুর লক্ষণ দেখা

দিল। উপস্থিত লোকজন তাহার এই ভয়ানক অবস্থা দর্শনে ভীত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। খবর রটিল কবি আবদুল ওয়ারেছ ছাহেব মারা গিয়াছেন; লোকজন ভয়ে পালাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর হজরতের শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিল। তিনি দৃষ্টি করিতেই অবদুল ওয়ারেছের অবস্থা গুরুতর বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। কি যেন তিনি ভাবিলেন। ক্ষণকাল চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। হঠাৎ এ'দিক ও'দিক তাকাইয়া দেখিলেন। সেখানে কেহ নাই। সকলেই পালাইয়া গিয়াছে। হজরত ডাকিয়া বলিলেন; "ওখানে কে আছে"। হারিচান্দ নামক হুজুরের এক ভক্ত তখনও পুকুর পাড়ে বাঁশ আড়ালের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। সে উত্তর করিল, "হুজুর আপনার এক নরাধম গোলাম আছি।" হজরত তাহাকে সজোরে এক বাণ্ডিল বাঁশ পুকুরে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। হারিচান্দ এক বাণ্ডিল বাঁশ তাড়াতাড়ি জলে নিক্ষেপ করিতেই "ঝুপ" করিয়া এক ভীষণ শব্দ হইল। খোদার রহস্য বুঝা ভার, বাঁশের শব্দ শুনিতেই মৃতপ্রায় ছৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ আস্তে আস্তে চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার অবস্থাদৃষ্টে মনে হইল তিনি যেন বহুক্ষণ নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। হজরত প্রস্থান করিলেন। সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তাহার কেমন বোধ হইতেছে। কোন প্রকার অসুবিধা অনুভব করিতেছেন কিনা। কিন্তু তিনি যেন কিছুই জানেন না। বলিলেন যে তিনি এইমাত্র ঘুম হইতে জাগিয়াছেন। তখন সকলের ধারণা হইল, ইহা হজরতের আধ্যাত্মিক লীলা ছাড়া আর কিছুই নহে। আউলিয়াদের কেরামত বুঝা আরো মুস্কিল। চারিদিকে খবর ছড়াইয়া পড়িল। মৃত আবার জীবিত হইয়াছে।

হজরতের বেলায়েতী প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত

হজরতের প্রিয়তম পৌত্র, তাঁহার নয়নমনি, হজরত মৌলানা শাহছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেব শিশুকালে একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। রোগের চিকিৎসা চলিল। কিন্তু দিন দিন রোগ বৃদ্ধি ছাড়া আরোগ্য দেখা গেল না। অকস্মাৎ একদিন ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। শিরা বসিয়া গেল। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তিনি আর ইহজগতে নাই। কান্নাকাটির রোল পড়িল। কেহ কেহ দৌড়িয়া হজরতের হুজরা শরীফে যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। হজরত তশরিফ নিয়া দেখিলেন, তিনি মৃত। তখন হজরত কি আর নীরব থাকিতে পারেন। তিনি তো হজরতের ভাবি খলিফা! তাঁহারই একমাত্র উত্তরাধিকারী। এক্ষেত্রে কি তিনি তাঁহার গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত না করিয়া পারেন! তবুও তিনি খোলাখুলি ক্ষমতা জাহির করিতে নারাজ। তাঁহার নিরাবরণীয় বেলায়েতি শক্তির উপর আবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। একটি অছিলা ঠিক করিলেন। লোকের চক্ষে উহাই দেখাইবেন। বলিয়া উঠিলেন, "কে আছ" একটি জলপূর্ণ কলসী উঠানে নিক্ষেপ কর।" তাহাই করা হইল। কলসী ভাঙ্গার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক নয়ন দৃষ্টিতে তদীয় নয়ন পুত্তলি পৌত্রের পানে রহমত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলসী ভাঙ্গা শব্দ ও হজরতের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। এখন আর তাঁহার মুমুর্ষ অবস্থা নাই। রোগ যেন সারিয়া গেল। তিনি নব জীবন লাভ করিলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার দাদী আম্মা হজরত ছাহেবানী প্রায় বলিতেন, "তুমি তো জয়নাল আবেদীন। তোমাকে তো হজরত কারবালা প্রান্তরের মৃত্যু কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন"।

হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে গরুর দুগ্ধ তিক্তস্বাদে রূপায়িত

হজরতের প্রতিবেশী মোহাম্মদ ওয়াশীল নামক এক ব্যক্তি একটি ভাজা অর্থাৎ বন্ধ্যা গরু খরিদ করে। লোকটি খোদার দরবারে প্রার্থনা জানায় যে, যদি তাহার গরুটী প্রসব করে, প্রথম দিনের সমস্ত দুধ হজরতের জন্য নিয়া যাইবে। কিছুদিন পরে আল্লাহ্‌র রহমতে গরুটি গর্ভবতী হইল। এবং সময়ে একটি বাচ্চা প্রসব করে। দুগ্ধ দোহন করিয়া সে খাইবার জন্য ঘরে রাখিয়া দেয়। অনেক দিনের কথা হওয়ায় নিয়তের কথা তাহার স্মরণে ছিলনা।

রাত্রে সে মেহমান লইয়া খাইতে বসিল। খাওয়ার পর দুধ আনা হইল। দুধ মুখে দিয়া দেখিল, সে এত তিক্ত যে খাওয়া অসম্ভব। কেহই দুধ খাইতে পারিলনা। মনে করিল দুধে কিছু পড়িয়াছে। দুধ তিক্ত হওয়ার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। অনুসন্ধানে জানিল দুধে কিছু পড়েও নাই। গরুর দুধ তিক্ত হইতে জীবনে শুনেও নাই। কি অস্বাভাবিক ব্যাপার। হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল যে প্রথম দিনের দুগ্ধ হজরতের জন্য আনিবার নিয়ত করিয়াছিল। অতএব পরদিন দুগ্ধ লইয়া সে হজরতের দরবারে আসিল। দুধ হজরতের সামনে রাখিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "প্রথম দিনের দুগ্ধই আমাকে দেওয়ার কথা, ইহা তুমি লইয়া যাও। ছেলেমেয়ে লইয়া খাইও।" তখন মোহাম্মদ ওয়াশীল মিঞা হজরতের খেদমতে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। বলিল, "হুজুর আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। দুগ্ধ ভাল হওয়ার জন্য দোয়া চাই।" তখন হজরত দুগ্ধ গ্রহণ করিলেন। পরদিন হইতে দেখা গেল গাভীর দুগ্ধ স্বাভাবিক হইয়াছে। আর কোন দোষ বা তিক্ততা নাই। সকলে ব্যাপার বুঝিতে পারিল। অলি উল্লাদের কোন কাজে অবহেলা বা গাফেলতি করা অন্যায়।

হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে বন্যজন্তুর কবল হইতে ইক্ষুখেত রক্ষা

এক ব্যক্তি সাদা আঁখের খেত করিত। প্রতি বৎসর বন্য শৃগাল তাহার খেত নষ্ট করিত। কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া সে নিয়ত করিল যে এবার আল্লাহ্ যদি তাহার খেত নিরাপদে রাখে তবে সে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত ছাহেব কেবলার জন্য একগাইট ইক্ষু ও এক কলসী ইক্ষুগুড় হাদিয়া নিবে।

আল্লাহ্ তা'লার অসীম কৃপা। এই বৎসর তাহার খেত অক্ষত অবস্থায় রহিল। বৎসরান্তে ইক্ষু চিবাইয়া সে মনে করিল, "এতগুলি নিব কেন! অল্প করিয়া নিয়া যাই।" অতএব তাহার খেয়াল মতো দুইখানা ইক্ষু ও দুইসের মিঠা লইয়া হজরতের দরবারে আসিল।

ইহা দেখিয়া হজরত অতিশয় রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন, আমি সারাবৎসর তোমার খেত পাহাড়া দিয়া শৃগাল তাড়াইয়া হয়রান হইতেছি; আর তুমি একগাইট ইক্ষু ও এক কলসী মিঠা দিতে কুণ্ঠিত? যাও আমি কৃপণ লোকের দ্রব্য খাইনা। নিয়া যাও এই বলিয়া দ্রব্যগুলি সহ তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

লোকটি পুনরায় নিয়তমত দ্রব্য লইয়া হজরতের খেদমতে আসিল। অনেক ক্ষমা চাওয়া ও কাতর মিনতির পরও হজরত আর উহা গ্রহণ করিলেন না। ইহার পর বৎসরও লোকটি আবার নিয়ত করিল। কিন্তু আর তাহার নিয়ত ফলে নাই।

ধান্য খেত হেফাজতে হজরতের প্রভাব

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত এনায়েত পুর নিবাসী ছৈয়দ ওহাব উল্লাহ্ ছাহেব বলেন, তাহাদের গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ ধূপি এক বৎসর তাহাদের পাহাড়ী জমিতে ধান্য বপন করিয়াছিল। সেই এলাকায় প্রতি বৎসর বন্যাবরাহ ও বানর দ্বারা ফসল নষ্ট হইত। কেহ ধান্য আনিতে পারিতনা। প্রাণকৃষ্ণ

নিয়ত করিল, আল্লাহ্ যদি তাহার ধান্য নিরাপদে বাড়ীতে আনিতে দেয় তবে সে প্রতি বৎসর ফকীর মৌলানা ছাহেবের জন্য কিছু কিছু চাউল দিবে। খোদার ফজলে সেই বৎসর তাহার ধান্য সম্পূর্ণ নিরাপদে রহিল। কোন জানোয়ারই তাহার ধারে কাছে আসিল না। সে নিরাপদে ধান্য বাড়ীতে আনিল। এবং একমন চাউল তৈয়ার করিয়া হজরতের দরবারে আনিল। এইরূপ প্রতি বৎসর ধান্য নিরাপদে আনিয়া হজরতের দরবারে চাউল দিত। ইহা দেখিয়া অন্যান্য কৃষকগণও নিয়ত করিতে লাগিল। ইহাতে তাহারা বুঝিতে পারিল, বনের হিংস্র পশু পক্ষী পর্য্যন্ত হজরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এবং হজরতের চরণে অনুগত।

হজরতের পবিত্র জুতা মোবারকের ধূলার বদৌলতে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়

হজরত মৌলানা কাঞ্চনপুরী ছাহেবের মামু ছাহেব কঠিন কলিজা কামড়ী রোগে ভুগিতেছিলেন। অনেক চিকিৎসার পরও কোন ফল না হওয়ায় হজরতের দরবারে দোয়ার জন্য আসিবেন মনস্থ করিয়াছেন; এমন সময় ডাক্তার সামসুজ্জমান তাঁহাকে একটি ঔষধ লিখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া মির্জাপুরী মৌলানা ছৈয়দ মছিউল্লাহ্ ছাহেবের পুত্র মৌলবী ফজলুল বারী ছাহেব তাহাকে বলিলেন যে, এক নিয়তে হজরতের জুতা মোবারকের ধূলা মালিশ করিলে তাহার কামড়ী রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। তাহার অত্যন্ত বিশ্বাস হইল। তিনি দরবার শরীফ আসিয়া হজরত কেবলা কাবার জুতা মোবারক হইতে কিছু মাটি নিয়া দরদের জায়গায় মালিশ করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্র রহমতে এবং হজরতের অলৌকিক প্রভাবে তাহার কামড়ী রোগ চিরতরে নির্মূল হইয়া যায়। তিনি বলেন, তাহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত এই কামড়ী রোগ আর আক্রমণ করে নাই।

এইরূপ হজরতের জুতা মোবারকের মাধ্যমে ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া শতশত লোক রোগারোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ আছে।

“আয়নায়ে বারী”

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
কাঠালের অর্ধাংশ রাখিয়া বাকী অংশ ফেরত দানে কশ্‌ফ শক্তির পরিচয়

ইছাপুরী জনাব মৌলানা আবদুচ্ছালাম ছাহেব বলেন, একদিন তাহার জেঠা মুন্সি আবদুল আজিজ ছাহেব নিয়ত করিলেন, “এয়া আল্লাহ্! আমার এই কাঠাল গাছে যদি কাঠাল ফলে, সবচেয়ে বড় ফলটি মাইজভাণ্ডারী ফকীর মৌলবী ছাহেবকে হাদিয়া দিব।” কয়েক বৎসর যাবত তাহার এই কাঠাল গাছে কোন ফলই ফলিতেছিলনা। খোদার মহিমায় সেই বৎসর উক্ত গাছে যথেষ্ট পরিমাণ ফল ফলিল।

তিনি যখন বড় কাঠালটি কাটিয়া হজরতের জন্য নিতে প্রস্তুত হইলেন তখন তাহার স্ত্রী বলিলেন, ফকীর মৌলবী ছাহেব কি এতবড় কাঠাল সবটা খাইতে পারিবেন! অর্ধেক কাঠাল নিলেও তো চলে। ইহাতে তাহার জেঠা আবদুল আজিজ ছাহেব তাহার জেঠাই ছাহেবার উপর অতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে তিরস্কার করিলেন।

অতঃপর তিনি কাঠালটা লইয়া হজরতের দরবারে পৌঁছিলেন। হজরতের সামনে কাঠালটি রাখা হইল। হজরত তাহাকে বলিলেন “মুন্সি ছাহেব! ফকীর ছাহেব কি এতবড় কাঠাল খাইতে পারেন। আপনি অর্ধেক কাঠাল রাখিয়া বাকী অর্ধেক আপনার বিবি ছাহেবানীর জন্য বাড়ীতে নিয়া যান।” ইহা বলিয়া হজরত নিজ হাতে ছুরি দিয়া কাঠালটিকে দুই ভাগ করিলেন। এবং অর্ধেক রাখিয়া বাকী অর্ধেক তাহাকে ফেরত দিলেন। হজরত মানুষের অন্তরের কথার পর্যন্ত খবর রাখিতেন। কোন প্রকারের নিয়তে বেশকম কিছু হইলে তাহা গ্রহণ করিতেন না। এবং কেহ মনে কষ্ট আনিয়া কিছু তাঁহাকে

দিলে তাহা তিনি ফেরত দিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট কিছু হাদিয়া আনিতে হইলে অতি পবিত্র ও খালেছ নিয়তে আনিতে হইত।

হজরতের প্রভাবে দোয়াতের মাধ্যমে জীবিকার্জন

নানুপুর নিবাসী জনাব মৌলবী আবদুল লতিফ ছাহেব অনেক বৎসর দরবার শরীফ–হজরত ছাহেবের পুত্র জনাব মৌলবী শাহ্ ছৈয়দ ফয়েজুল হক ছাহেবকে পড়াইতেন। বিদায়কালে তিনি হজরতের খেদমতে আরজ করিলেন, "হুজুর আমি গরীব ও মাজুর মানুষ। এতদিন হুজুরের দরবারে শাহজাদাকে পড়াইয়াছি। বর্তমানে আমি বাড়ী যাইতেছি। আমি কোন কাজকর্ম করিতে পারিনা। হুজুর দয়া করিয়া সম্মানের সহিত জীবিকার্জন করিতে পারি মত কোন উপায় আমাকে করিয়া দেন।" হজরত ছাহেব তাহার প্রার্থনা কবুল করিলেন। তাহাকে একটি দোয়াত দান করিয়া বলিলেন, "আপনি এই দোয়াতটি নিয়া ঘরে বসিয়া থাকুন। দোয়াতের কালি শুকাইতে দিবেন না আল্লাহ্ তা'লা আপনার রিজিক ঘরেই মিলাইয়া দিবেন।" মৌলবী ছাহেব হজরত প্রদত্ত দোয়াতটি লইয়া বাড়ীতে গেলেন। এবং উহা লইয়া হজরতের আদেশ মত বসিয়া রহিলেন। এর পর দেখা গেল প্রত্যহ তাহার বাড়ীতে তাবিজের জন্য লোকজন আসিতে লাগিল। তিনি উক্ত দোয়াতের কালি দিয়া তাবিজ লিখিয়া দিতেন। হজরতের কালামে ও প্রদত্ত দোয়াতে এমনই খোদাদাদ রহস্য নিহিত ছিল যে, এই দোয়াতের দ্বারা তিনি যাহাই লিখিতেন, অবশ্যই সুফল ফলিত। প্রতিদিন তাহার যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা আয় হইতে লাগিল। এই দোয়াতের অছিলায় তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অতি সুখে সম্মান ও সুনামের সহিত স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার পর এই দোয়াতটি এখনও তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট বিদ্যমান আছে।

টাকার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার ও কর্জ হইতে মুক্তি দান

চট্টগ্রাম হাজিরখিল গ্রামের আবদুল হালিম চৌধুরীর পুত্র আহমদ মিঞা চৌধুরী বলেন, "আমার বয়স যখন ৯/১০ বৎসর তখন একদিন আমার পিতার সহিত আমি দরবার শরীফ হজরতের খেদমতে আসি। আমরা আসিতে হজরতের জন্য একসের গরুর দুধ সঙ্গে আনি। আমি ও আমার বাবা হজরতের কদমবুচি করিয়া দুধগুলি তাঁহার সামনে পেশ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছেলেটি কার"। বাবা নিজের ছেলে বলিয়া পরিচয় দিলেন। হজরত ছাহেব আমাকে বলিলেন, "তোমার পেট খুব বড়। তুমি সাত গ্লাস সরবত পিও।" এই বলিয়া আমাদের আনিত দুধ দ্বারা সরবত তৈয়ার করিয়া একগ্লাস নিজে পান করিলেন এবং আমাকে সাত গ্লাস সরবত পান করাইলেন। উপস্থিত আরো দশ বারোজন লোক ছিল। তাহাদের প্রত্যেককে একগ্লাস করিয়া সরবত পান করাইলেন। ইহার পরও দেখি যে আমাদের আনিত দুধ দ্বারা প্রায় বিশ গ্লাস সরবত তৈয়ার করার পরও দুধ যেন পূর্ব পরিমান মত জমা রহিয়াছে।
তৎপর হজরত নিজ হাতে পঁচিশটি টাকা লইয়া বলিলেন, "তোমার পেট বড় ভারী তুমি টাকা গুলি খাও। আমি টাকা গুলি হাতে লইতে চাহিলাম। তিনি আমার হাতে নাদিয়া টাকা গুলি আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এবং বলিলেন, "চলিয়া যাও। তুমি আমার গোলাম।"
বিদায়ের পর আমার মনে নানা প্রকার প্রশ্ন জাগিতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যকলাপ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সবই আমার কাছে বিপরীত মনে হইল। আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি নিয়তে এখানে আসিয়াছেন। আমাকে কেন এইরূপ বলিলেন। বাবা উত্তরে বলিলেন যে বর্তমানে তিনি অনেক টাকা কর্জদার হইয়াছেন।
আমরা বাড়ীতে গেলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে আমার বাবার রোজগার হইতে লাগিল। এমন কি একবৎসরের মধ্যে আমার বাবা সমস্ত কর্জ পরিশোধ করিয়া স্বচ্ছল হইয়া গেলেন।

তখন আমার বুঝে আসিল, হজরত কেন আমাকে টাকা মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি হয়তঃ ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে বিনা চেষ্টায় আমাদের উপার্জন হইবে। বাস্তবিকই আমার বাবাকে লোকে ডাকিয়া নানা অছিলায় টাকা দিতেন। ইহা একমাত্র হজরতের দোয়া ও আধ্যাত্মিক শক্তিতেই হইয়াছিল।

উকিল বাবুর প্রেরিত কলা রাখিয়া দুগ্ধ ফেরত

ফটিকছড়ি থানা নাম অতি সুন্দর, মাইজভাণ্ডার গ্রাম এক তাহার ভিতর।
শুভক্ষণে শুভযোগে দয়া করি আল্লাহ্, সেই দেশে জন্মাইল শাহ্ আহমদুল্লাহ্।।
সুপণ্ডিত আরবীতে মুখস্ত কোরান, ফকীর মৌলবী বলি বিস্তর সম্মান।
বাল্যাবধি স্বধর্ম্মতে ছিলেন নিষ্ঠাবান, করিতেন জগতের সতত কল্যাণ।।
নিরপেক্ষ লোক তিনি প্রসিদ্ধ ফকীর, মনুষ্য কুলেতে হন সকলের পীর।
মানবের উপকার করিবার তরে, সতত প্রস্তুত ছিলেন প্রফুল্ল অন্তরে।।
নানা জিলা হতে লোক আসিয়া তথায়, ইচ্ছামত কার্য্যলভে তাঁহার কৃপায়।
দেশদেশান্তরে আছে তাঁহার বড় নাম, সর্ব্বলোক ঘোষে যশঃ কীর্তি অনিবার।।
লোকের মনের কথা জানিতেন তিনি, নানা প্রকার গুণ ছিল অতি বড় জ্ঞানী।
ভোগ লিপ্সা নাহি ছিল তাঁহার অন্তরে, খেতে দিতেন অতিথীরে নানা উপচারে।।
শিষ্য সাগরিদ আছে তার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, কার্য্যসিদ্ধি হয় সবার তাঁর নাম নিলে।
ফটিকছড়ির নববাবু উকিল সরকার, জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠ ভাই হয় সম্পর্কে আমার।।
কার্যোপলক্ষে আমি সেই বাসায় ছিনু, ফকিরের গুণ দেখি আশ্চর্য হইনু।
উকিলবাবুর এক গাভী প্রসবিল, বহুদুগ্ধ গাভী হইতে পাইতে লাগিল।।
ভাগ্যক্রমে সেই সময় বাসাতে তাহার, পাকিল কাবুলি কলা অতি চমৎকার।
তাহা দেখি নববাবু ভক্তির সহিতে, দুগ্ধ কলা দিতে চাইলেন ফকীর বাড়ীতে।।
কহিল মনের কথা কেরাণীর ঠাই, অদ্যকার দুগ্ধ সব তথা দিতে চাই।
কেরাণী শুনিয়া তাহা মনে মনে ভাবে, তিন সের দুগ্ধ নাহি ফকীর খাইবে।।
জনৈক বাহক দিয়া কলা দুই কান্দি, একসের দুগ্ধ দিল ভাণ্ড মুখ বান্ধি।
ফকীরের কাছে গিয়া বাহক কহিল, উকিল সরকার বাবু দ্রব্য পাঠাইল।।
"এত দুধ নাহি খায়" ফকির কহিয়া, কলা রাখি দুগ্ধ সব দিলেন ফিরাইয়া।
বাহক ফেরত আসি করে নিবেদন, দুগ্ধ সব ফকীর না করিল গ্রহণ।।

বলিলেন, ফকির এত দুগ্ধ নাহি খায়, বুঝিতে না পারি তার কিবা অভিপ্রায়।
তদন্ত করিয়া জানি কেরাণীর কথা, পরদিন পাঠাইল সবদুধ তথা।।
ফকীর সন্তুষ্ট হইয়া রাখে সেই দুগ্ধ, চক্ষে তাঁহার গুণ দেখি হইলাম মুগ্ধ।।

– রচিত –
মোক্তার অনুকুল চন্দ্র বিশ্বাস – চট্টগ্রাম কোর্ট।

হজরতের নির্দেশে বিস্ময়কর উন্নতি

একদা রাউজান থানার গচ্ছিকুল নিবাসী হজরতের এক ভক্ত ওয়ালী মস্তান ছাহেব, অত্যন্ত অভাব অনটনে ছিলেন। তাহার বহুটাকা কর্জ হইয়া গিয়াছিল। তিনি একদিন নিরুপায় হইয়া হজরতের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, "হুজুর আমি একজন হুজুরের গোলাম। খুব অভাব অনটনে আছি। অনেক টাকা-কর্জ হইয়াছে। আমার এমন জায়গা জমি নাই যাহাতে কর্জশোধ করিয়া দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারি। আমাকে এই অনটনের আজাব হইতে রক্ষা করার আদেশ হয়। না হইলে আমার ইজ্জত রক্ষা হইতেছে না"।
হজরত উত্তর করিলেন, "হিজরত কর"।
ওয়ালী মস্তান হজরতের আদেশ মত গচ্ছিকুল ত্যাগ করিয়া রাঙ্গামাটি হিজরত করিলেন। তথায় তাহার নানা প্রকার উপার্জন হইতে লাগিল। লোকজন তাহাকে খুব ভক্তি করিত। ইহাতে ক্রমে তাহার অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গেল। তাহার বিস্তর জায়গা জমি ও টাকা পয়সা জমিয়া গেল। বর্তমানে মস্তান ছাহেবের ছেলে হাজি ইমামুদ্দিন ছাহেব সেখানকার বাসিন্দা হিসাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি একজন ধনীলোক বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত। সেখানে তাহার পিতা ওয়ালী মস্তানের মাজার আছে। তাহার মাজারের উপর পাকা দালান নির্মান করা হইয়াছে। এইরূপে হজরত তাহাকে হিজরত করাইয়া, তাঁহার শুভদৃষ্টি দ্বারা ধনী ও সুপরিচিত করাইলেন!

সুদখোরের পয়সা নিক্ষেপান্তে দেহে প্রভাব বিস্তার ও রহস্যময় কেরামত প্রদর্শন

নোয়াখালী জেলার রৌসন আলী নামক এক সুদখোর একদিন হজরতের খেদমতে আসিল। সে হজরতের সামনে আট আনা পয়সা দিল। তাহার প্রতি হজরতের দৃষ্টি পড়িতেই হজরত জালাল হইয়া উঠিলেন। এবং পয়সা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। সে পয়সাগুলি আবার আনিয়া হজরতের সামনে দিল। হজরত পয়সাগুলি পুনরায় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। সে আবার যাইয়া পয়সাগুলি কুড়াইয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর আট আনা পয়সা আপনার কাছে কিছুই নহে বটে–কিন্তু আমার কাছে মূল্যবান। আপনি ছাড়া আমার গোনাহ্ মাফ করাইতে পারে–এমন আর কেহ নাই মনে করিয়াই আপনার খেদমতে আসিয়াছি।" ইহা বলিয়া আবার পয়সাগুলি হজরতের সামনে রাখিল। হজরত এবারও পয়সাগুলি সজোরে বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। সে আবার উহা কুড়াইয়া আনিল। এবং বলিতে লাগিল "আমার গোনাহ্ মাফ না হওয়া পর্যন্ত আমি যাইব না। আমার গোনাহ্ মাফ করাইতেই হইবে।" তৎপর হজরত যেন তাহার প্রতি সহৃদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার হাতে একখানা বাতাসা দিলেন। এবং বলিলেন, "মসজিদের পুকুরে গোসল করিয়া ইহা খাইয়া ফেল।" সে হজরতের আদেশে মসজিদের পুকুরে গোসল করিয়া উহা খাইতেই তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল। সে পাগলামী করিতে করিতে লোকজনকে মারিতে লাগিল হজরতের কাছে নালিশ করিলে হজরত তাহাকে বাঁধিয়া রাখার আদেশ দেন। বাঁধা অবস্থায় ঘরে সে পায়খানা প্রস্রাব করাতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুনরায় সে অশান্তির সৃষ্টি করায় কুলাল পাড়ার লোকেরা তাহাকে পুকুরে ফেলিয়া এমন ভীষণভাবে প্রহার করে যে তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাকে হজরতের সামনে আনা হয়। হজরত তাহার হাতে একখানা মিঠাই দিয়া খাইতে আদেশ দেন। সে মিঠাই খানা খাইতেই তাহার পাগলামী ভাবের পরিবর্তন হইয়া শান্তভাব ফিরিয়া আসে। এবং সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর হইতে সে হারাম ব্যবসা

ছাড়িয়া দীনদার মত্তকী ও খোদায়ী প্রেম প্রেরণায় দিন কাটায়। এমন করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে সুদখোরকে সংশোধন করিয়া দীনদার আশেক করিয়া লইলেন ও হারাম কার্য্য ত্যাগ করাইলেন।

হজরতের অলৌকিক প্রভাবে বৃষ্টি বারি বরিষণ

এক বৎসর চাষের মৌসুমে ভাদ্রমাসে বৃষ্টিপাত একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সমস্ত দেশ খালবিল শুকাইয়া গ্রীষ্ম কালের রূপ ধারণ করে। পানির অভাবে চাষ বন্ধ থাকে। রৌদ্রের প্রখরতায় ধান্য চারা সমূহ মরিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। কৃষকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। চারিদিকে–দাওয়াত, খতম কোরান ও নানা প্রকারে আল্লাহ্‌র দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা শুরু হয়। কিন্তু কিছুতেই বৃষ্টিপাত হইলনা। সেই সময় সহর কতুব নজির শাহ্ মিঞা যিনি হজরতের একজন অন্যতম ভক্ত ছিলেন, তিনি দরবার শরীফ আসিয়া হজরতের দরবারে বৃষ্টির জন্য ফরিয়াদী হন। তিনি দুই দিন না খাইয়া – দায়েরা শরীফে পড়িয়া থাকেন। ইহার পর শেষ রাত্রে উঠিয়া তিনি বকাবকি আরম্ভ করেন। “লোকে ধান চাউল না পাইলে খোদার জন্য কোথা হইতে দিবে? খোদা কি দেখিতেছে না” এই সমস্ত বলিতে বলিতে–তিনি এদিক ওদিক পায়চারী করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইল। হজরত ছাহেব কেবলা; খাদেম মৌলবী আহমদ ছফা ছাহেবকে বলিলেন, “মিঞা! আমি নাজির হাট যাইব। আমার কাপড় আন।” মৌলবী ছাহেব তাঁহার জামা কাপড় আনিয়া দিলেন। হজরত একখানা ঢিলা তহবন্দ, একটি কোর্তা ও হল্‌দে রঙ্গের একখানা আবা গায়ে পরিয়া বাড়ীর দক্ষিণ দিক দিয়া বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে খাদেমগণ ও অন্যান্য হাজতী, মকছুদি অনেক লোক তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল।

বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মরাখালটি পার হইয়া বিলে উঠিতেই একজন লোক আসিয়া হজরতকে ছালাম জানাইলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, “মিঞা, তোমার বাড়ী কোথায়?” লোকটি উত্তর করিল, “হুজুর

খন্দকিয়া।” ইহাতে হজরত জালাল হইয়া লোকটাকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মিঞা খন্দকে বেঙই থাকে। তুমি খন্দকে থাক কেমনে?”
লোকটি কাতরভাবে বলিলেন, “হুজুর আমার গ্রামের নাম খন্দকিয়া।” হজরত ভীষণ জালাল হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া লোকটিকে দু তিনটি আঘাত করিলেন। পরে দক্ষিণ দিকে হাটিতে লাগিলেন। রহম আলী নামক খাদেম হজরতের ছাতি ধরিয়া পিছনে পিছনে যাইতেছিলেন।
কিছুদূর যাইয়া হজরতকে বলিলেন, “হুজুর। নাজির হাট যাইতে হইলে পশ্চিম দিকে যাইতে হইবে।” হজরত তিরস্কার করিয়া তাহাকে তাড়াইলে তিনি দূরে সরিয়া গেলেন। তখন রৌদ্রের প্রখর তেজ। হজরতের গায়ে সূর্য্যের কিরণ পড়িতেছে। হজরত সূর্য্যের প্রতি তাকাইয়া তিরস্কার করিতে করিতে পথ চলিতেছেন। সামনে বাঁশের সেতু দেখিয়া আরো অধিক জালাল ও রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন।
এমন সময় রাউজান নিবাসী ডাক্তার আবদুল হামিদ ছাহেব একজাম সরবত লইয়া, হজরতের সামনে পেশ করিলেন। হজরত সরবতগুলি একচামিচ করিয়া সকলকে বাটিয়া দিতে নির্দেশ করিলেন। সেই সময় হজরতের চতুষ্পার্শে ৫০/৬০ জন লোক জমায়েত হইয়া গিয়াছে। সকলকে একচামিচ করিয়া সরবত দেওয়া হইল।
হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কি পরিমাণ আছে?” তিনি বলিলেন “হুজুর আরো অনেক আছে।” আদেশ দিলেন, “তুমি এক চামিচ খাও, আমাকে এক চামিচ দাও”। তাহা করা হইলে, আবার বলিলেন, “তুমি আরো এক চামিচ খাও।” তৎপর মাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এক চামিচ এই হারামজাদীর ‘গুপ্ত স্থানের’ ফাটলের মধ্যে দাও।” তিনি আরো এক চামিচ খাইলেন এবং এক চামিচ মাটিতে ঢালিয়া দিলেন। তৎপর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কি আছে?” উত্তর করিলেন ‘হুজুর, এখনও আরো কিছু আছে।” বলিলেন, “হারাম জাদীকে আরো তিন চামিচ দাও।” মাটিতে আরো তিন চামিচ ঢালিয়া দেওয়া হইল। হজরত আবার বলিলেন,

আর কি আছে? আরো কিছু আছে বলাতে হজরত জালালী হালতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জিয়া বলিলেন, "সব তাহার "ফোরজের" মধ্যে ঢালিয়া দাও।" সব মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া হইল।

অতঃপর হজরত দ্রুত বাড়ী রওনা হইলে অন্যান্যরাও তাহাদের নিজ নিজ পথে চলিয়া যায়।

খোদার কি অসীম করুণা! হঠাৎ দক্ষিণ দিক হইতে একখানা মেঘ আসিয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়া গেল। সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী পৌঁছিল।

প্রথমে কিছু বৃষ্টি হইয়া একটুখানী থামিল। তারপর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অনেকক্ষ পর্যন্ত রহিল। পুনঃ কিছুক্ষণ থামিয়া এমনভাবে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল যে, লোকজন পর্য্যন্ত বাহির হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিনের বৃষ্টিতে সমস্ত নদীনালা খালবিল ভরিয়া গেল। মাঠঘাট জলে ডুবিয়া রহিল। আবদুল হামিদ ছাহেব বলেন, পরদিন হুজুর আমাকে বাড়ী যাইতে আদেশ দিলেন। আমি অতি কষ্টে বৃষ্টির জল ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে পৌছিলাম।

হজরত কেবলার বেলায়েতী প্রভাবে ষ্টিমার রক্ষা ও মহামারী নিবারণ

জনৈক মৌলবী ছাহেব বলেন, আমি বহু প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। কোন ব্যবসাতেই সফলকাম হইতে না পারিয়া দোয়ার জন্য এক দিন কিছু বাতাসা হাদিয়া লইয়া হজরতের খেদমতে রওনা হইলাম। দরবার শরীফ পৌঁছিতেই দেখিতে পাইলাম–হজরত ছাহেব মসজিদের দক্ষিণের রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। আমিও পিছনে পিছনে চলিলাম। তিনি মাঠের মধ্যে যাইয়াই একটি মাটির ঢিলা লইয়া জমীনের ফাটলে রাখিয়া নিজ পাদুকা দিয়া উহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া জমিনের ফাটল বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি একটি মাটির ঢিলা লইয়া বলিলাম, হুজুর! আমি বন্ধ করিয়া দিব কি? তখন হজরত আমার প্রতি মুখ

ফিরাইয়া বলিলেন, "মিঞা, দেখিতেছনা, দুইটি বলিষ্ঠ ভইস ঠেলাঠেলি করিয়া উপর দিকে উঠিতেছে। আমি তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম।"

তৎপর হজরত যাইয়া বিনাজুড়ি খালের ধারে বসিলেন। চারিদিক হইতে হাদিয়া লইয়া আগন্তুকগণ তথায় আসিতে লাগিল। বহুলোক জমা হইয়া গেল। সকলে হজরতের জন্য আনিত দ্রব্যাদি সামনে পেশ করিতে লাগিল। আমিও আমার বাতাসাগুলি হজরতের সামনে দিলাম। হজরত পাঁচখানা বাতাসা আমাকে দিয়া বলিলেন, "মিঞা! চলিয়া যাও। বাড়ীতে সকলকে খাইতে দিও। এবং নিজেও খাইও। সহসা চলিয়া যাও। আগুন জ্বলিতেছে।" আমি বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম আমাদের পাড়ায় কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। দুইজন লোক মারা গিয়াছে। আরো চারি পাঁচজন লোক আক্রান্ত অবস্থায় আছে। আমি তাড়াতাড়ি তবার্‌রোকগুলি বাড়িস্থ সকলকে বণ্টন করিয়া দিলাম। সামান্য নিজেও খাইলাম।

কলেরায় পাড়ার অনেক লোক মারা গেল। প্রায় সকলেই আক্রান্ত হইল। খোদার কৃপায় আমাদের বাড়ীতে যাহারা এই তবার্‌রোক খাইয়াছিল, তাহারা সকলেই নিরাপদে রহিল।

কিছুদিন পরে আমি পুনরায় মাইজভাণ্ডার শরীফ যাই। সেই দিন আরো একজন ব্যবসায়ী লোক হজরতের দরবারে সওগাত হাদিয়া লইয়া উপস্থিত হন। তিনি দরবারে, লোকের নিকট প্রকাশ করেন যে, কিছুদিন পূর্বে তিনি ছোট একখানা ষ্টিমারে করিয়া কিছু সওদা লইয়া আরাকান হইতে আসিতেছিলেন। পথে সমুদ্রে তাহার ষ্টিমারখানা বিপদে পতিত হয় এবং ষ্টিমারে ছিদ্র হইয়া যায়। তখন ষ্টিমারে প্রবলবেগে পানি উঠিতে থাকে। তিনি নিরুপায় হইয়া নিয়ত করিলেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি তাহাকে জানেমালে নিরাপদে রক্ষা করেন তিনি বাড়ী যাইয়া মালগুলি বিক্রয় করিয়া মাইজভাণ্ডারী হজরত ছাহেব কেবলার জন্য হাদিয়া লইয়া দরবার শরীফ যাইবেন। ষ্টিমার কর্মচারীগণ তখন ছিদ্র বন্ধ করিতে প্রাণপন চেষ্টা করিতেছে। ষ্টিমার তখন প্রায় ঘাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ

কোথা হইতে কি যেন হইয়া গেল। ষ্টিমারের পানি উঠা বন্ধ হইল। ষ্টিমার ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। খোদার অপার রহমতে এবং হজরতের দয়ায় তাহার মালপত্র রক্ষা পাইল। তিনি তাই-তাহার নিয়ত মতে দরবারে পাকে হাজির হইয়াছেন।

লোকটির বর্ণনামতে দেখিলাম,-তাহাদের ষ্টিমার দুর্ঘটনার তারিখ এবং আমি যেইদিন হজরতের দরবারে বাতাসা লইয়া আসিয়াছিলাম এবং হজরত ছাহেব মাটির ঢিলা দিয়া জমির ফাটল বন্ধ করিয়াছিলেন তাহা একই তারিখ ও একই সময়। হজরতের পবিত্র কালাম, "আগুন জ্বলিতেছে সহসা বাড়ী যাও" তাহার মর্ম আমি বাড়ীতে গিয়াই বুঝিয়াছিলাম কিন্তু তাহার ঢিলা দিয়া ফাটল বন্ধের তাৎপর্য্য উপরিউক্ত ঘটনা বর্ণনার পর বুঝিতে পারিলাম।

কিছুদিন পর আমি গাছের ব্যবসায় আরম্ভ করি। হজরতের দোয়ায় তাহাতে বিশেষভাবে লাভবান হই। বর্তমানে চট্টগ্রাম ষ্ট্রাণ্ডরোডে আমার যেই হোটেলটি আছে তাহা হজরত ছাহেবেরই দান।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হজরতের বেলায়েতী প্রভাবে মৃত্যুকালে আজরাইল ফেরত ও ষাট বৎসর আয়ু বৃদ্ধি

হজরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) ছাহেবের দরগাহ শরীফের খাদেম শাহ মনিরুল্লাহ্ ছাহেব হজরতের মুরিদ ও অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, কোন এক সময় তাহার প্রতিবেশী আবদুল কাদের ছাহেব এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসা করা হইল কোন প্রকার আরোগ্য লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার কবিরাজগণ আশা ত্যাগ করেন। ইহাতে তিনি এবং তাহার আত্মীয়স্বজন আল্লাহ্ তা'লার মেহেরবানী ও তাহার আউলিয়াদের শরনাপন্ন হন। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাহার গোনাহ্ মাফের জন্য নানা প্রকার দান খয়রাত ও সিন্নি ছদকা আদায় করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি মৌং মনিরুল্লাহ্ ছাহেবকে ডাকাইয়া তাহার বাড়ীতে নিলেন এবং কাঁদিয়া বলিলেন, হজরত বোস্তামী (রঃ) এর মাজারে যেন তাহার জন্য দোয়া করেন। তিনি বলিলেন যে, তাহার জীবন বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে তাহার মৃত্যুভয় হইতে তাহার পাপের ভয়ই তাহাকে বেশী পীড়া দিতেছে।

মৌং ছাহেব তাহাকে বলিলেন, "ভাই সময় থাকিতে পরকালের ভাবনা করেননাই, অসময়ে উপায় খুজিয়াই বা কি করিবেন। এখন একমাত্র কামেল পীরের নিকট আত্মসমর্পন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমি দেখিতেছিনা।" আবদুল কাদের ছাহেব তাহার নিকট কামেল পীরের সন্ধান জানিতে চাহিলেন। মৌলবী ছাহেব বলিলেন, "বর্তমান সময় মহাশক্তিবান, স্মরণের সঙ্গে স্মরণকারী ভক্তকে উদ্ধার করিতে পারে এবং তাহাকে

পাপমুক্ত করাইয়া পলকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে পারে, এমন দয়াল অলি উল্লাহ্ বর্তমানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ছাড়া অন্য কেহ আছে বলিয়া তো আমি মনে করি না। আপনার ভক্তি বিশ্বাস হইলে আপনি মনে মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও আন্তরিকতার সহিত আত্মসমর্পন করিয়া তাঁহার উছিলায় আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে পারেন। আমার বিশ্বাস আপনাকে আল্লাহ্ অতি সত্ত্বর কৃপা করিবেন।"

হজরত ছাহেবের নাম শুনিয়া তাহার মনপ্রাণ যেন গলিয়া গেল। মৃত্যুমুখির হতাশ হৃদয়ে যেন এক নূতন আশার জাগরণ হইল। তিনি সর্বান্তঃকরণে হজরতের প্রতি নিজকে সমর্পন ও রুজু করিলেন। এবং জীবনে বাঁচিয়া শক্তি পাইলে তাঁহার খেদমতে আত্মবিক্রয় করিবেন নিয়ত করিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার কি অভাবনীয় খেলা। গাউছে পাকের কি অসীম দয়া! বলিতে না বলিতে সেই মূহুর্তেই মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিল। তাহার ভীষণ "ছাকরাত" আরম্ভ হইল তাড়াতাড়ী তাহাকে উত্তর শিরানা করা হইল। আত্মীয়স্বজনগণ মৃত্যুকালিন অনুষ্ঠানাদি করিতে লাগিলেন।

প্রায় ঘণ্টাকাল ছাকরাতের পর হঠাৎ আল্লাহের মহিমা যেন আকাশ হইতে নামিয়া আসিল। ধীরে ধীরে তাহার ছাকরাত লাঘব হইতে শুরু হইল। কিছুক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাসে তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন এবং করুণ কাতর স্বরে মহান খোদাতালার শোকরিয়া আদায়ে আলহামদু লিল্লাহ্ আলহামদু লিল্লাহ্ বলিয়া উঠিলেন।

তখন মৌলবী ছাহেব তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! কেমন বোধ হইতেছে, আপনি এমন করিলেন কেন?

কাদের ছাহেব প্রায় সুস্থ লোকের মত নরম অথচ আবেগময় স্বরে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, "ভাই ছাহেব আমি আপনার উপদেশ মত হজরত ছাহেবের উছিলায় আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাহিয়া মনে মনে তাঁহার স্মরনাপন্ন হইতেই যেন তন্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই অবস্থায় দেখিতে পাই যে, একজন ভীষনাকৃতির মানব উলঙ্গ কৃপান হস্তে দৌড়িয়া আসিয়া আমার

বুকের উপর চাপিয়া বসিল। এবং আমাকে জবেহ করিতে উদ্যত হইল। তখন আমার এমন ভীষন ভয় ও কষ্ট হইতেছিল যে, যাহা আমি ভাষায় বলিতে পারিনা। ঠিক সেই সময় একজন বৃদ্ধলোক বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া আসিয়া ঘাতকের হাত হইতে ভীষণ অস্ত্রখানা ছিনাইয়া লইলেন। এবং ধাক্কা দিয়া আমার বক্ষ হইতে নামাইয়া দিলেন। উক্ত ভীষণাকৃতি লোকটা তখন দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। আমি এই মহা কষ্ট ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতেই দেখিতে পাই যে ঐ বৃদ্ধ মহাপুরুষটি হজরত ছাহেব কেবলাই। তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আর চিন্তা করিওনা, আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ মাফ করিয়াছেন। এবং তোমার আরো ষাট বৎসর আয়ু বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তোমার বাবা ইন্তেকাল করিয়া যাইবেন। তুমি আরোগ্য লাভ করিয়া ওয়াদামত আমার সাথে দেখা করিও। আমি তোমার জন্য জেয়াফতের খানা রাখিয়াছি।" এই কথা বলিয়া আমি কিছু বলার পূর্বেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমার তন্দ্রা ও অস্থিরতা দূরীভূত হইল। তাই আল্লাহের প্রশংসা করিতে করিতে চক্ষু উন্মিলন করিলাম। এখন আমার মনে হইতেছে আমি প্রায় সুস্থ। আমার সর্বাঙ্গ যেন অতি হালকা অনুভূত হইতেছে।"

তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। এক সপ্তাহ পর ঠিকই তাহার পিতা ইন্তেকাল করিলেন। এক মাস পর কাদের ছাহেব সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আমার সঙ্গে দরবার শরীফ আসিয়া হজরতের নিকট বায়াত গ্রহণ করিলেন। এবং হজরতের জেয়াফতের খানারূপী ফয়েজ অর্জন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে হজরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় স্মরণকারীকে আজরাইল হইতে ছিনাইয়া লইয়া আরো ষাট বৎসর আয়ু বাড়াইয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার দোস্তদের প্রতি কি ক্ষমতাই অর্পন করিয়াছেন। তাহা তিনিই জানেন। তাই হাদিছে বলেন, অলিরা আল্লাহ্রই ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁহারা যাহা করেন, তাহা আল্লাহ্ই করিয়া থাকেন।

হজরতের বেলায়েতী ক্ষমতায় আজরাইল হইতে রক্ষা ও মৃত্যু–সময় পরিবর্তন

মাইজভাণ্ডার নিবাসী মুন্সি ইজ্জত উল্লাহ্ ছাহেবের পুত্র মৌলবী আবদুল গণি ছাহেব হজরত কেবলার একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবত শারীরিক অসুখে ভুগিয়া অতিশয় কাতর হইয়া যান। অভাবের দায়ে তিনি কোন ভাল ঔষধও ব্যবহার করিতে পারেন নাই। একদিন হঠাৎ তিনি বেহুস ও শয্যাশয়ী হইয়া পড়েন। তাহার অন্তিম লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে উত্তর শিরানায় কলমা পড়িয়া পানি দিতে থাকে। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আজরাইল কদাকার ভীষণ আকৃতিতে একখানা অসি হাতে তাহার বুকে বসিয়া, গলায় অসি চালাইতে উদ্যত। এমনি সময় হঠাৎ গাউছুল আজম হজরত ছাহেব হাজির। তাহার অসি ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখনই ফিরিয়া যাও। আমি তাহাকে এক সপ্তাহের সময় দিলাম। তাহার সাথে আমার দরকারী কাজ আছে।" তখন আজরাইল হজরতকে কিছু বলিতে চাহিলে, তিনি অতিশয় নারাজ ও জালাল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এখনই যাও। তোমার খোদাকে আমার কথা বলিও। আমি সময় দিয়াছি।" তখন আজরাইল চলিয়া গেল। তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

এই ঘটনার তিনদিন পর কাঞ্চনপুরী মৌলানা আবদুল গনি সাহেব হজরতের খেদমতে আসিয়াছিলেন। উক্ত মৌলবী ছাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি এই ঘটনা বলিবার মত মনের মানুষ পাইতেছিলেন না। এমন সময় কাঞ্চনপুরী মৌলানা ছাহেব আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া নিলেন এবং অতি কষ্টে বিস্তারিত ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন। মৌলানা ছাহেব হজরতের এই অপূর্ব লীলা ও ক্ষমতার কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। ইহার চারিদিন পর উক্ত মৌলবী ছাহেব মারা জান।

এই ঘটনা মৌলানা কাঞ্চনপুরী ছাহেব তাঁহার 'আয়না-ই বারী' নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুকালে হজরতের দর্শনদানে ছাকরাতি কষ্ট লাঘব ও ঈমান রক্ষা

নানুপুর নিবাসী মুন্সি নেছার আহামদ ছাহেব হজরতের একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালিন লক্ষল উপস্থিত হইলে, তাহার আত্মীয় স্বজনগণ একজন মৌলবী ডাকিয়া মৃত্যুসময়ে তওবা করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি তখন পীরভাই মৌলানা আবদুচ্ছালাম ইছাপুরি ছাড়া কাহারো নিকট তওবা করিবেন না বলিয়া প্রকাশ করেন। মৌলানা আবদুচ্ছালাম ছাহেবকে তালাসে পাওয়া না যাওয়ায় অন্য মৌলবী আনিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "আমার পীর হজরত ছাহেব, বাবাজান কেবলা ও ছোট মৌলানা আমিনুল হক ছাহেব আমার সামনে উপস্থিত আছেন। আমাকে তাঁহারা তল্‌কিন করাইতেছেন।" ইহা বলিতেই একটু মৃদু হাসিয়া তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে কোন প্রকার কষ্টই হয় নাই। বরং কথা বলিতে বলিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে দর্শনদানে ঈমান রক্ষা

মৌলবী মীর আহমদ ছাহেব বলেন, "আমার চাচা মৌলবী আবদুল হাকিম ছাহেব হজরতের মুরিদ ছিলেন। তিনি একশত এক বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। এন্তেকালের সময় তিনি বার বার হজরত কেবলাকে কদমবুচি করিতে উদ্যত হন। এবং বলেন "আমার হজরত তশরিফ আনিয়াছেন কলেমা স্মরণ করাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন, "না আমি এক ছাড়া দ্বিতীয় জানি না। না আমি দুই বলিতে পারিনা, ইহা আমার পীরের ছবক।" ইহা বলিয়া কলেমা সাহাদত পড়িতে পড়িতে কোন প্রকার ছাকরাত ছাড়া তিনি ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে হজরতের দর্শন দান

রাউজান নয়াপাড়া নিবাসী ডাঃ ফজলুল করিম বর্ণনা করেন–
“আমার পিতা হেকিম নুরজ্জমান ছাহেবের ওফাতকাল নিকটবর্তী হইলে, স্থানীয় একজন মৌলবী ছাহেব তাহাকে বলেন, “আপনার সময় বোধ হয় অতি সন্নিকট। আপনার তওবা করা উচিত। আমার বাবাজান উত্তর করিলেন, “আমার মুর্শিদে কামেল হজরত ছাহেব কেবলা সদাসর্বদা আমার সামনে উপস্থিত আছেন। যাহা কিছু দরকার হয় তিনিই করিবেন। আমার তওবার আর দরকার নাই। আপনারা জুমার নামায শেষ করিয়া সহসা চলিয়া আসিবেন।”
আমরা সকলে নামায পড়িয়া আসিলাম। ৭ই রমজান শুক্রবার জুমার নামাযের পর আমার বাবাজান কলেমা পড়িতে পড়িতে নশ্বর জগত ত্যাগ করিয়া জান্নাতবাসী হইলেন।

(আল্লাহ্ তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন)

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

খাদ্যের মধ্যে হজরতের প্রভাব

আজিমনগর নিবাসী ফয়জুর রহমানের পুত্র আলী আহমদ, অনেক বৎসর ভাণ্ডারখানায় মেহমান খাওয়ান ও মোছাফেরদের খেদমতে খাদেম ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, অনেক সময় নির্দিষ্ট মোছাফের ও মেহমানদের খানা তৈয়ার হওয়ার পর হঠাৎ বহুলোক আসিয়া পড়িত। তখন হজরত সমীপে আরজ করিলে, তিনি খাদ্যদ্রব্যাদি তাঁহার সম্মুখে নিতে আদেশ করিতেন। তাঁহার সামনে নেওয়া হইলে তিনি একটু একটু পরিদর্শন পূর্বক বলিতেন, "ইহাই যথেষ্ট হইবে। বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া রীতিমত দিতে থাক।" তাঁহার আদেশমত দিতে দিতে পরে দেখা যাইত খানা আরো দুই একজনের পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইত। একবারের বেশী দুইবার খানা দিতে চাহিলে কেহই লইতে রাজি হইত না। তাহারা প্রথমবারেই তৃপ্ত হইয়া যাইত।

একদিন রাত্রে হজরতের মোছাফের খানায় ১৬ জন লোকের খানা তৈয়ার করা হয়। এমন সময় মিরশ্বরাই নিবাসী ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ছাহেব অনেক রাত্রে ২৪/২৫ জন লোক নিয়া উপস্থিত হন। তখন পূর্বোক্ত আলী আহমদ খাদেম হুজুরের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, "হুজুর এখন উপায় কি? মাত্র ১৬ জন মেহমানের খানা তৈয়ার করিয়াছি। রাত্রও অধিক হইয়াছে। ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ছাহেব প্রায় ২৪/২৫ জন লোক লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

হজরত বলিলেন, "খাদ্য সামগ্রী কি পরিমাণ আছে? সব আনিয়া আমাকে দেখাও।" সমস্ত খাদ্য সামগ্রী হজরতের সামনে আনা হইল। হজরত প্রত্যেকটি পাত্রই ঢাকনী উঠাইয়া নাড়িয়া দেখিলেন। এবং বলিলেন,

"মিঞা! ইহাই সকলের জন্য আল্লার ফজলে কাফি হইবে। তুমি বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া দিতে থাক।"
অতঃপর খাদেম আলী আহমদ ১৬ জনের খাদ্য ৪০ জনকে পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন। পরে দেখা গেল, আরো প্রায় ২/৩ জনের খানা ভাণ্ডে রহিয়া গিয়াছে।

হজরতের প্রভাবে অল্পখাদ্যে তৃপ্তি

নোয়াখালী জিলার বল্লভপুর নিবাসী আবদুস সকুর ছাহেব বলেন, আমি একদিন ফেনী কোর্টের পেস্কার মৌং মকবুল আহমদের সহিত হজরতের দরবারে আসি। হুজুর হইতে বিদায়ান্তে মোছাফের খানায় বহুলোকের সাথে আহার করিতে বসি। পরিবেশনকারী খাদেম প্রত্যেক মেহমানকেই বড় তিন চামিচ করিয়া প্রথমবার খানা দিয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া মুন্সি ছাহেব পেস্কার ছাহেবকে বলিলেন; এই খানায় কি হইবে? পেস্কার ছাহেব তাহাকে বলিলেন, চুপ থাক! এই মোবারক দরবারের কেরামত ও বরকত অন্যরূপ। যাহা দিবে তাহাতেই তৃপ্তি পাওয়া যায়। মুন্সি ছাহেব কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পরিবেশনকারি খাদেমের অলক্ষ্যে দুই চামিচ খানা লইয়া বাসনে চাপিয়া রাখিলেন। তৎপর খাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক লোককেই খানা যাচনা করা হইল। কেহই আর দ্বিতীয়বার খানা লইল না। উক্ত খানায় প্রত্যেকেই তৃপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু উক্ত মুন্সি ছাহেবের বাসনে প্রায় দুই চামিচ পরিমাণ খানা রহিয়া গিয়াছে। দেখিয়া পেস্কার ছাহেব তাহাকে তবার্‌রোকী খানা সব খাইয়া ফেলিতে বলিলেন। মুন্সি ছাহেব বলিলেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, পারিতেছেন না। বমি আসিতে চায়। তাহার ভাত কেন রহিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধানে জানা গেল যে, মুন্সি ছাহেব খাদেমের অগোচরে দুই চামিচ নিজে লইয়া ছিলেন। তখন সকলেই হজরতের মঞ্জুরী খানায়, তাঁহার কেরামত বুঝিতে পারিল।

হজরতের প্রভাবে অল্পদ্রব্য অসংখ্য লোকের মধ্যে বণ্টন

একদিন হজরতের খেদমতে কোন একব্যক্তি কিছু লিচু লইয়া হাজির হন। সেই সময় হজরত নিতান্ত জজবাতী অবস্থায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত অবস্থায় আসিয়া সুমধুর স্বরে কোরান তেলাওয়াত করিতে লাগিলেন। শাহ্‌জাদা ফয়জুল হক ছাহেব তখন অবসর হইয়া হজরতের সামনে লিচুগুলি পেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হুজুর! এই লোকটি লিচুগুলি আপনার জন্য আনিয়াছেন। হজরত, নিজহস্তে লিচুগুলি লইয়া সকলকে একটি একটি করিয়া বণ্টন করিয়া দিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে অল্প লিচু আছে কিন্তু তখনও অনেক লোক রহিয়াছে। হজরত তখন লিচুগুলি নিজ হাতের মুঠায় লইলেন। এবং একটি একটি করিয়া সবাইকে দেওয়ার পর দেখা গেল যে হজরতের হাতে আরো একটি লিচু অবশিষ্ট রহিয়াছে। সেই লিচুটি তিনি নিজে খাইলেন। উপস্থিত লোকেরা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া পারিলেন না। হাতের মুঠায় ৫/৬টির বেশী লিচু লওয়া যায়না; অথচ হজরত একমুঠি লিচু ১৫/২০ জনকে দিয়াও একটি লিচু নিজ হাতে রাখিয়াছিলেন। সকলে বুঝিল ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কেরামত।

হজরতের প্রভাবে ব্যবসায়ে অপ্রত্যাশিত সুযোগ অর্জন

মোহরা জান আলী চৌধুরী বাড়ীর কালামিঞা চৌধুরী ছাহেব বলেন, আমি কোন এক সময়ে নানারূপ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া একেবারে খালী হাত ও দেনাগ্রস্থ হইয়া পড়ি। রুজি রোজগারের কোন সুপন্থা স্থির করিতে না পারিয়া একপ্রকার নিরুপায় হইয়াই, হজরতের দরবারে আশ্রয় লইতে আসি। আমি যখন তাঁহার খেদমতে আসি দেখিতে পাই যে তিনি বাড়ী হইতে উত্তর দিকে যাইতেছেন। এমন সময় আমি তাঁহাকে কদমবুচি করিয়া আরজ করিলাম, হুজুর! আমি বর্তমানে আর্থিক অনটনে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছি। আপনার দোয়া চাই। হজরত যথারীতি নাম পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও উত্তরে নাম বলিয়া পরিচয় দিলাম। হজরত সামনে কয়েক কদম হাঁটিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া

বলিলেন, "এখন সবেকদর, কি চাও?" আমি বলিলাম, হুজুর! আর্থিক কষ্ট হইতে মুক্তি চাই।
তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, "যাও মিঞা! হাজিদের খেদমত কর। তোমার কষ্ট চলিয়া যাইবে। চলিয়া যাও।"
হজরত বিদায় দিলেন। পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম কিভাবে হাজিদের খেদমত করিব। আমার কাছে তো টাকা পয়সা কিছুই নাই। বাড়ীতে আসিয়া প্রায় ৪/৫ দিন পরে, এক সময় চট্টগ্রাম সহরে সদরঘাটে বেড়াইতে যাই। তথায় জেটিতে আমার সাথে ম্যাকানীন ম্যাকাঞ্জি কোম্পানীর ম্যানেজার ছাহেবের সহিত দেখা হয়। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, চৌধুরী ছাহেব, এই বৎসর চট্টগ্রামে হাজিদের ক্যাম্প করার হুকুম হইয়াছে। আপনি আমাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারেন কি? আমি বলিলাম, কি সাহায্য আমি করিতে পারি আপনাকে জনাব? আপনি আমার কোম্পানীর অধিনে থাকিয়া হাজিদের রসদ সরবরাহ করিবেন। আমি কোম্পানীর নিকট হইতে আপনাকে অগ্রিম টাকা লইয়া দিতে পারিব।
তখন হজরত ছাহেবের আদেশের কথা আমার মনে পড়িল। আমি তখনই রাজী হইয়া গেলাম। তিনি আমাকে টাকা পয়সার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি সুচারুরূপে রসদ সরবরাহ করিতে লাগিলাম। হজরতের আদেশের বরকতে এবং আল্লাহ্ তা'লার মেহেরবাণীতে আমার প্রচুর উপার্জন হইয়া অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া যায়। সেই হইতে আমি হজরতের ভক্ত হইয়া পড়িলাম। প্রতি বৎসরই তাঁহার খেদমতে নজর নেয়াজ হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইতেছি।

হজরতের আদেশে হিজরত করিয়া অপূর্ব অর্থশালী

রাউজান থানার অধিনে মগদাইর মৌজার আবদুল করিম ছাহেব ছোটকাল হইতে হজরতের দরবারে খেদমতে ছিলেন। তাহার বয়স যখন ১৫/১৬ বৎসর হয় তখন তাহার মনে সংসার করিতে বাসনা জন্মে। একদিন হজরত সমীপে তাহার বাসনা প্রকাশ করিয়া বিদায় চাহিল।

হজরত কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলিয়া উঠিলেন, “আবদুল করিম! তোম হিজরত করো।” আবদুল করিম তখন বুঝিল হজরত তাহাকে জন্মভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করিতে নির্দেশ দিতেছেন। আবদুল করিম আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল। অতঃপর বাড়ী যাওয়ার কয়েকদিন পরে বার্মা চলিয়া যায়। সেখানে চাঁদা নামক সহরে বসবাস আরম্ভ করে। সে সেখানে ফেরী ব্যবসা করিয়া বেশ উন্নতি করে। ক্রমে আবদুল করিম ব্যবসায় বাড়াইয়া সুনাম অর্জন করে। বর্তমানে উক্ত আবদুল করিম একজন ধনপতি। তাহার ধনসম্পদ হজরতের কেরামত প্রভাবে ও অপূর্ব্ব দয়ায় প্রাপ্ত।

নানুপুর নিবাসী ছৈয়দ আজিজুল হক ছাহেব বলেন, ১৬/১৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন ছুটি উপলক্ষে আকিয়াব পোষ্ট অফিস হইতে বাড়ী আসিতেছিলাম, পথে ষ্টিমারে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সাথে উঠি। তথায় উক্ত ধনকুবের আবদুল করিম সওদাগরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।

পথে আলাপ প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় দিয়া আমাকে তাহার সম্পূর্ণ কাহিনী বলিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন “হায় আমি কি ভুল করিয়াছি। যদি আমি চাইতাম তিনি আমাকে আবদাল বানাইয়া দিতেন।” ইহা বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

হজরতের আদেশে রেয়াজ উদ্দিন উকিলের ভূ-সম্পত্তি খরিদ ও রেয়াজউদ্দিন বাজারের পত্তন

মরহুম মৌলবী রেয়াজুদ্দিন আহমদ উকিল ছাহেব একদিন হজরতের খেদমতে দোয়া প্রার্থী হইলেন।

হজরত তাঁহাকে হুকুম করিলেন “যোগিনীর যায়গা খরিদ কর। তাহাতে তোমার আর্থিক অনটন চলিয়া যাইবে।” বাড়ী আসিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন যোগিনীর যায়গা তিনি খরিদ করিবেন। টাকা পয়সাও এমন নাই। কয়েকদিন পর এক যোগিনী আসিয়া তাহার কাছে বর্তমান রেয়াজুদ্দিন বাজার যেখানে অবস্থিত, সেই যায়গাটি বিক্রয় করিতে চাহিল।

উকিল ছাহেব বিনা দিধায় হজরতের আদেশ মত উক্ত জঙ্গলাকীর্ণ যায়গাটি অতি অল্পমূল্যে যোগিনী হইতে খরিদ করিয়া লইলেন। কিছুদিন পর রেলওয়ে কোম্পানী আসিয়া উক্ত যায়গার দক্ষিণ পার্শ্বে রেলওয়ে ষ্টেশন করার মানসে জরিপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি হজরতের কালাম পাকের প্রতি অতি আস্থাবান হইলেন। দিন দিন যায়গার গুরুত্ব বাড়ীতে লাগিল। তিনি সেই স্থানে বাজার পত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন। ক্রমে চকবাজার মোহছনিয়া মাদ্রাসার পাহাড় হইতে চট্টগ্রাম কোর্টও বর্ত্তমান কাছাড়ী পাহাড়ে আসিয়া পড়ে। কাজেই তাহার বাজার অতিশয় চালু ও উন্নতিশীল হইয়া গেল। ক্রমান্বয়ে তাহার অবস্থার অপ্রত্যাশিত উন্নতি হইতে লাগিল।

উক্ত রেয়াজুদ্দিন উকিল ছাহেব চট্টগ্রাম কোর্টের মোক্তার মৌলবী আবদুল গণি ছাহেবকে এই ঘটনাটি আলাপ প্রসঙ্গে বলেন। তিনি আরো বলেন, হজরত ছাহেব একজন অতি দূরদর্শী ও অন্তর্চক্ষু বিশিষ্ট অতুলনীয় অলি, যাঁহার অসীম দয়া ও দোয়ায় আমার অবস্থার এই উন্নতি। তাঁহার বদৌলতে জঙ্গলাকীর্ণ যায়গা খরিদ করিয়া সোনার খনি পাইয়াছি। আমি ইহা তাঁহার আশ্চর্য কেরামত বলিয়া মনে করি। তিনি চাহিলে অঘাটকে ঘাট, অমানুষকে মানুষ করিতে পারেন। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনিও তাঁহার খেদমতে যাইয়া দেখুন। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাঁহার দোয়ায় একটি উপায় করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ আপনার মোক্তারীতে প্রসার করিয়া দিবেন।

অতঃপর তিনি দরবার শরীফ হজরতের আশ্রয় গ্রহণে তাহার উন্নতি কামনা করেন। তিনিই এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে তিনি কালে তাহার ব্যবসায় খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। বহুবার ফৌজদারী বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাহার নিজ ইউনিয়নের বহু বৎসরাধিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হজরতের বাক্যসিদ্ধি ও কশ্‌ফ
কেরামতে নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি

শাহনগর নিবাসী জমিদার হাজি মখলছুর রহমান ছাহেব বলেন, "আমার ১৮/২০ বৎসর বয়সকালে আমার পিতা ছাহেব একটি দুধের গাভী খরিদ করেন। একদা গাভীটি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়ায় দোয়ার জন্য আমার পিতা ছাহেবের আদেশ মত হজরত ছাহেবের খেদমতে আসিলাম। তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেই তিনি বলিলেন, "মিঞা তোমার বাড়ীর উত্তর দিকে তালাস কর। গরু পাইবে। আমি দোয়া করিতেছি।" তাঁহার নির্দেশমত বাড়ীর উত্তর দিকে তালাস করিয়া গরুটি পাইলাম। আমার পিতা ছাহেব হারানো গরুটি পাইয়া অতিশয় খুশী হইলেন। এবং একদিন দুধ লইয়া তাঁহার দরবারে পাঠাইলেন। আমি দুধ হজরতের সামনে রাখিয়া বলিলাম–হুজুর! আপনার দোয়ায় আমাদের গরুটি পাওয়া গিয়াছে। আমার বাবা এই দুধগুলি লইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি রেঙ্গুন যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার শারিরীক ও আর্থিক উন্নতির জন্য বাবা দোয়া করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

হজরত আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা দোয়া করিতেছি" ইহা বলিয়া আমাকে আদেশ দিলেন "তেজারত করিও। তবে একটি কাজ করিওনা।" (সেই কাজটি যে কি তিনি প্রকাশ না করায় এখানে প্রকাশ করিতে পারিলামনা) বাড়ী আসিয়া কিছুদিন পর রেঙ্গুন চলিয়া গেলাম। হজরতের নির্দেশমত ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। হজরতের নির্দেশমত নিষিদ্ধ কাজটি কখনও করি নাই। তাঁহার বাক্যে আল্লাহ্ তা'লা কি অসীম কেরামতি ও সাফল্য রাখিয়াছেন তাহা তিনি আর আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্‌র রহমতে ও হজরতের দোয়ার বরকতে আমি বর্তমানে বহু টাকার মালিক।

মুর্খের প্রতি কোরান পাঠের আদেশে অদ্ভুত কেরামত

নোয়াখালীর হারিপুর নিবাসী নজমুদ্দিন আহমদ ছাহেব বলেন, তিনি একদিন হজরতের সম্মুখে হাজির হইলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা কোরান তেলাওয়াত করিও।" তাহাতে তিনি আরজ করলেন, "হুজুর! আমি কোরান শিক্ষা করি নাই।" হজরত বলিলেন, "কোরান শরীফ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ কর। তুমি শিখিয়াছ।" তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি কোরান শরীফ খুলিলেন। তাহার মনে হইল, তিনি কোরান পাঠ শিক্ষা করিয়াছেন। তারপর বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন, তিনি খুব সুন্দর কোরান পাঠ করিতে পারেন। সেই অবধি নিত্য তিনি কোরান পাঠ করিতেন। কোরান পাঠ না করিয়া শান্তি পাইতেন না।

বৃদ্ধাবস্থায় একদিন তিনি কোরান পাঠ করিতে না পারায় তাহার সর্ব্বশরীরে এক ভীষণ জ্বালাপোড়া অনুভব করেন। তারপর দিন তাড়াতাড়ি কোরান পাঠে মন দেন। তাহার মরণকাল পর্য্যন্ত তিনি চশমা ছাড়া কোরান শরীফ পাঠ করিতেন। হজরত কোরান পাঠ অতি ভালবাসিতেন। মৌলবী ছৈয়দ মিঞাকে কোরান পাঠে আদেশ দেওয়ার পর হইতে তিনি কোরান পড়িতে অজ্দ করিতে করিতে বেহুশ হইয়া যাইতেন। লতিফ সিকদার নিবাসী শাহ মৌলানা জমিরউদ্দিন ছাহেবকে হুকুম দেওয়ার পর তিনি কোরান পাঠকালে দেখিতে পাইতেন, হজরত তাহার সামনে বসিয়া কোরান পাঠ শুনিতেছেন। এইরূপ আরো বহু ঘটনা আছে।

হজরতের বাক্যে আশ্চর্য রহস্য ও কেরামত

মন্দাকিনী নিবাসী আলী মিঞা চৌধুরীর পুত্র মাষ্টার ফজলুর রহমান বলেন, আমি কোন চাকুরী না পাইয়া একদিন ফরহাদাবাদ নিবাসী ছুফী চান্দ মিঞা ছাহেবকে দুঃখের কথা জানাইলাম। তিনি আমাকে হজরতের দরবারে দোয়া প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাহার কথা মত কয়েকবার

হজরতের দরবারে আসিলাম। একদিন তিনি আমাকে দুইটি রুটি হাতে দিয়া বলিলেন, "মিঞা। তুমি হিসাব নিকাশের কাজে থাকিও। যেখানে যাও আল্লাহ্কে ভয় করিও।" এবং খাদেমকে বলিলেন, "নাজির হাটের পোষ্ট মাষ্টারকে দুইখানা কাবাব তবার্রোক দাও।" হুজুরের নির্দেশ মত খাদেম সাহেব আমাকে দুইখানা কাবাব দিল। আমার প্রতি নির্দেশ দিলেন "রুটিগুলি কাবাব দিয়া খাইয়া চলিয়া যাও।" আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু হজরতের কালামের কোন রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক বৎসর পর নাজির হাটে পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদার কি মহিমা আমিই তথায় প্রথম পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হইলাম। এই সময় আমি একবার এয়াছিন নগর বেড়াইতে যাই। তথায় একটি খারাপ সুন্দরী স্ত্রীলোকের ফেরবে পড়িয়া পাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। তখন হঠাৎ হজরতের পাকবাণী ও তাঁহার চেহারা মোবারক আমার সামনে আসে। অতএব আমি খোদার ভয় মনে আনিলাম। এবং সারারাত বাত্তি জ্বালাইয়া স্ত্রীলোকটির সহিত কথাবার্তায় রাত পোহাইয়া সকালে বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

হজরতের বাক্য সিদ্ধি ও দোয়ার ফল

মাইজভাণ্ডার নিবাসী জনাব ফয়েজ আহমদ বর্ণনা করেন, "ছোটকালে আমার পিতা ছাহেব পড়ার তাকিদে একদিন আমাকে তাড়াইলে আমি হজরতের ঘরে ঢুকিয়া পড়ি। আমার পিতা ছাহেব পিছে পিছে আসিয়া পড়িলে হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তাহাকে তাড়াইতেছেন কেন? বাবা উত্তর করিলেন, " সে লেখাপড়া করেনা। খোন্দকারের ছেলে না পড়িলে কি ভাবে জীবন কাটাইবে! সেতো আর হালচাষ করিতে পারিবে না।" হজরত উত্তর করিলেন, "আমার মিঞা ফয়েজুল হকের মোছাহেব। তাহার পড়াশুনা লাগিবে না।" পড়িবেও না। হালচাষও করিবে না। সে ভাল খাইয়া, সুন্দর কাপড় পরিয়া চলিয়া যাইবে। আপনি চলিয়া যান।"

হজরত ছাহেবানী একদিন হজরত ছাহেবকে বলিলেন, "ফয়েজ আহমদ ফয়জুল হক মিঞাকে কলিকাতা যাইবার পরামর্শ দিতেছে। আপনি তাহাকে

নিষেধ করুন।” হজরত উত্তর করিলেন, “ফয়েজ আহমদের কলিকাতা আমার আন্দর বাড়ী। আর মিঞার কলিকাতা চট্টগ্রাম সহর। আপনার সে বিষয়ে চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।”

ফয়েজ আহমদ বলেন, “আমি বার বার চেষ্টা করিয়াও কলিকাতা যাইতে পারি নাই। বরং তাঁহার ওফাতের পর রেঙ্গুন যাওয়ার জন্য কলিকাতা হইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে, আমার টিকেটের টাকাগুলি হারান যায়। তখন তাঁহার অখণ্ডনীয় বাণীর কথা আমার স্মরণ হয় এবং বাড়ী ফিরিয়া আসি।

প্রকাশ মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত ফয়েজ আহমদ খাওয়া পরায় এবং আর্থিক কোন বিষয়ে কষ্ট পায় নাই। বরং মৃত্যুকালে তদীয় কন্যা ও জামাতা তোফায়েল আহমদকে নগদ প্রায় এক হাজার টাকা দিয়া যান।

মানব অন্তরে হজরতের আশ্চর্য্য প্রভাব

মাষ্টার ফজলুর রহমান বলেন, তিনি প্রথমবার দরবার শরীফ আসিতে আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তি তাহাকে কয়েকটি কমলা দিয়া বলেন, আমি বারটি কমলা হজরতের জন্য রাখিয়াছিলাম। আমার নিয়তি বারটি কমলা হইতে কয়েকটি কে খাইয়া ফেলিয়াছে। এই কমলাগুলি হজরতের খেদমতে দিবেন। তিনি কমলাগুলি আনিয়া হজরতের সামনে রাখিতেই, হজরত একটি কমলা হাতে লইয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিলেন, “ভাই আমার পড়ার সময় এক বাড়ীতে জায়গির ছিলাম। বাড়ীওয়ালা ফকিরের নামে বারটি কমলা নিয়ত করিয়াছিল। ছাত্রেরা খাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা চুরি করে নাই। আল্লার নামে খাইয়া ফেলিয়াছে। কারণ ফকিরের নামে নিয়ত করিলে আল্লাহ্ উহা পাহারা দেয়। আল্লাহ্কে পাহারা দিতে বাধ্য করে বলিয়াই, ইহা কেতাব মতে নাজায়েজ বলা হয়। কিন্তু লোকে বুঝে না; এবং নিয়ত করে। খোদার নিয়তের হইলে যে কেহ খাইতে পারে। আবদুর রহমানকে বলিও।”

মাষ্টার ফজলুর রহমান শুনিয়া অবাক হইলেন যে, আবদুর রহমান তাহাকে কমলা সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন, তাহা হজরত বলিয়া দিতেছেন।

বোধ হয় তাহার নিয়তে কোন প্রকার দোষ আছে। না হয়, আল্লাহ্ নিশ্চয় পাহারা দিতেন, এবং ফকিরের নিয়তি কমলা খাইতে পারিত না অতঃপর তিনি বাড়ীতে যাইয়া আবদুর রহমানকে সমস্তই বলিলেন।

হজরতের কার্য্যে অন্তর্যামীর নিদর্শন

আবদুল্লাহ্পুর নিবাসী ডাক্তার বাবু রসিকচন্দ্র শীল বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়িবার সময় আমার মা চারি আনা পয়সা আমার কপালে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন এই পয়সাগুলি দিয়া একসের বাতাসা একদরে কিনিয়া ফকীর মৌলবী ছাহেবের জন্য নিয়া যাইও। তাঁহার সামনে দিয়া তোমাকে দোয়া করিতে বলিও। ডাক্তার বাবু বলেন, মাতার নির্দ্দেশমত একসের বাতাসা লইয়া আমি দরবারে আসিলাম এবং তাঁহার সামনে দিয়া বলিলাম, হুজুর মা এই বাতাসাগুলি আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমাকে দোয়া করিতে বলিয়াছেন। তখন তিনি ধ্যানরত অবস্থায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর একজন খাদেম বলিলেন, হুজুর! একজন হিন্দুছেলে আপনার জন্য কিছু বাতাসা হাদিয়া আনিয়াছেন। হজরত চক্ষু উন্মিলন করিয়া বাতাসার প্রতি একদৃষ্টে চাহিলেন। এবং বাতাসাগুলি বণ্টন করিয়া দিতে আদেশ দিলেন।
লোকটি বাতাসা বিলি করিতে লাগিল। অনেক লোক। বিলি করিতে করিতে প্রায় ২০/২৫ হাত দূরে চলিয়া গেলে আমার মনে আসিল বোধ হয় আমাকে দিবে না। ইহা খেয়াল করার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত ডাকিয়া বলিলেন; "এই ছেলেটিকেও দাও"।
আমাকে দেওয়ার পর বাতাসা শেষ হইল। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, আমাকে তো দোয়া করিলেন না। তখন হঠাৎ তিনি হাত উঠাইয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিলাম তিনি মানুষের অন্তর্য্যামী।

হজরতের অন্তর্চক্ষু ক্ষমতার অলৌকিক পরিচয়

কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ ছরতা গ্রাম নিবাসী হাজি রহমত আলী ছাহেবের পুত্র জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ কণ্ট্রাকটার ছাহেব বর্ণনা করেন যে, ত্রিপুরা (কুমিল্লা) নিবাসী দারোগা বাড়ীর মৌলবী রেয়াজ উদ্দিন আহামদ ছাহেব গাজী পুরী শাহ্ ছাহেবের মুরীদ ছিলেন। তিনি শাহ্ ছাহেবের মুখে শুনিয়াছেন মাইজভাণ্ডারী পীর মৌলানা শাহ্ ছৈয়দ জনাব আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) ছাহেব অত্যন্ত উচ্চস্তরের আউলিয়া ছিলেন। শাহ্ ছাহেব বলেন, "আমি একদা তাঁহার খেদমতে যাওয়ার সময় পথে একজন লোক আমাকে তিনটি খোরমা দিয়া বলেন যে, তাহার এই হাদিয়া যেন আমি হজরত ছাহেব কেবলার খেদমতে পৌঁছাইয়া দিই। আমি অতি যত্নের সহিত খোরমা তিনটি কাপড়ের পকেটে রাখিয়া ঐ কাপড় গাটুরীর মধ্যে হেফাজতে রাখিলাম। দরবার শরীফ আসিয়া বিদায় হওয়ার সময়, হজরত ছাহেব কেবলা আমার প্রতি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "আমারটি আমায় দিয়া যান।" আমি মনে মনে ভয় পাইলাম। কি ব্যাপার! আমি তাঁহার খেদমতে ফয়েজ ও দোয়া অর্জনের জন্য আসিলাম; আর তিনি বিদায় কালে আমার নিকট কি চাহিতেছেন। কি দ্রব্যই বা দিতে নির্দেশ দিতেছেন।

হঠাৎ আমার খোরমা চালানীর কথা মনে পড়িল। তখন তাড়াতাড়ি গাটুরী খুলিয়া গচ্ছিত খোরমা গুলি হজরতের খেদমতে পেশ করিলাম। এবং লজ্জিত ও কৃতজ্ঞ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তিনি তো নিতান্ত দয়াবান সর্বসজাগ আউলিয়া। আমার পীরের কালাম সত্য। যদি এই আমানত চালানী না দিয়া যাইতাম, বেয়াদবী তো হইতোই; তদুপরি বুজর্গানে দীনের আমানতী হাদিয়া অনাদায়ের দায়ে দুঃখকষ্টও ভোগ করিতে হইত। অতএব হুসিয়ারের সহিত অতি যত্নে যথাস্থানে তাহাদের হাদিয়া পৌঁছান উচিত। ইহার মত দায়িত্ব কম আছে।

অলৌকিক প্রভাবে একজনকে পানি পড়া দানে অপরের রোগ মুক্তি

আবদুল্লাহ্ পুর নিবাসী ডাক্তার রসিক বাবু বলেন– তাহার ছোট ভাই বাল্যকালে নানা প্রকার রোগ ভোগ করিতেছিল। কোন চিকিৎসায় আরোগ্য না হওয়ায় তাহার মা তাহার ছোট ভাইয়ের কপালে চারি আনা পয়সা স্পর্শ করাইলেন, এবং সেইদিনের তাহাদের গরুর দুধ দোহন করিয়া চারি আনা পয়সাসহ তাহার চাচাকে মাইজভাণ্ডারে হজরতের খেদমতে আশীর্বাদের জন্য পাঠাইয়া দেন, এবং বলিয়া দেন যে, তাহার আরোগ্য কামনা করিয়া যেন কিছু জল পড়া লইয়া আসেন।

তাহার চাচা আদেশ মত হজরতের খেদমতে দুগ্ধ ও পয়সা পেশ করিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের আরোগ্য কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। হজরত তাহার হাদিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিছু জল "দম" করিয়া তাহাকে জোড় করিয়া পান করাইয়া দিলেন। এবং তাহার চাচার পেটের উপর হাত ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, তাহার ছেলের পেটের অসুখ ভাল হইয়া যাইবে। খোদার কি মহিমা! তাঁহার আধ্যাত্মিক কেরামত কত সবল। আমার চাচা বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব হইতেই আমার ভাই যেন ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে যাইতে লাগিলেন। ইহার কয়েক দিনের মধ্যে আমার ছোট ভাই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। এইভাবে হজরত একজনকে পানি খাওয়াইয়া অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলেন।

পরীক্ষকের উপর হজরতের প্রভাব বিস্তারে অদ্ভুত কেরামত

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দ গ্রামের হিঙ্গুলা গ্রাম নিবাসী আহমদ দায়েম চৌধুরীর পুত্র আবুল হোসাইন চৌধুরী ছাহেব ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় অত্যন্ত খারাপ করেন, এবং পাশের আশায় নিরাশ হইয়া হজরতের দরবারে দোয়া প্রার্থী হন। তিনি বলেন, "আমি দরবার শরীফে হাজির

হইয়া হজরতের কদমবুচি করিয়া আরজ করিলাম, হুজুর! আমি পরীক্ষায় সুবিধা করিতে পারি নাই। অঙ্কে মাত্র দশ নম্বরের উত্তর লিখিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ও তত ভাল করিতে পারি নাই। আমি গরীব ছাত্র। এইবার পাশ করিতে না পারিলে আর পড়িতে পারিবনা। এখন হুজুরের দোয়া ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নাই। হজরত আমাকে নাম, পিতার নাম বাড়ীর কথা তিনবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও যথারীতি উত্তর দিলাম। হজরত কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিত অবস্থায় চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিয়া উঠিলেন, "মিঞা, খোদা তোমাকে সব বিষয় পাশ করাইয়া দিয়াছে। ভয় নাই। চলিয়া যাও।"

ইহা শ্রবণে খুবই আনন্দিত হইলাম। তাঁহাকে কদমবুচি করিয়া বিদায় হইলাম। কিন্তু মনে শান্তি কিছুতেই আসেনা। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। দেখিলাম, আমি আল্লাহ্‌র রহমতে ও হজরতের দোয়ার বদৌলতে পাশ করিয়াছি। আমার পরীক্ষা পাশ তাঁহার দোয়া ও অসাধারণ কেরামত ছাড়া আর কিছুই নহে।

হজরতের অসাধারণ ক্ষমতা হাকিমের অন্তরে প্রবেশ ও মোকদ্দমার রায় প্রদান

হজরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (রাঃ) এর খাদেম মৌলবী মনিরুল্লাহ্ ছাহেব হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর একজন ভক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশী একজন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক। তাহার সহিত জমি লইয়া বিরোধ সৃষ্টি করেন। তিনি ধনেজনে ও কৌশলে প্রতিপক্ষের সমকক্ষ নন। তাই কিছুতেই তাহার সঙ্গে প্রতিযোগীতায় আটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

তিনি নিরুপায় হইয়া হজরতের খেদমতে আর্জি পেশ করিলেন। "হুজুর! আমিতো আর পারিতেছিনা। আমার জমিগুলি জোর দখল করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার কবল হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাই। আপনি দোয়া

করিয়া আমার উপায় করিয়া দেন।” হজরত তাহাকে বলিলেন, “তুমি আদালতে আর্জি কর। তোমার জমি পাইয়া যাইবে।”

তিনি হজরতের আদেশমতে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিলেন। খোদার এমনই মহিমা, বিপক্ষের সমূদয় সাক্ষ্য তাহার অনুকূলে আসিয়া গেল। তিনি মোকদ্দমায় জয় লাভ করিয়া জমি ডিক্রি পাইলেন। কিছুদিন পর তিনি দরবারে আসিতে শুনিতে পাইলেন, বিপক্ষদল আপিল দায়ের করিতেছে। ইহাতে মৌলবী ছাহেব অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। কারণ বিপক্ষদল টাকার জোড়ে বড় বড় উকিল নিযুক্ত করিবে। অথচ তাহার কাছে টাকা নাই। তিনি কি করিয়া ভাল উকিল নিযুক্ত করিবেন। সুতরাং এবারও তিনি হজরতের খেদমতে সমস্ত ঘটনা আরজ করিয়া জানাইলেন।

হজরত আকদাছ বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক; বিপক্ষদল বড় বড় উকিল নিযুক্ত করিলে আমি ব্যারিষ্টার হইয়া বিচারকের অন্তরে প্রবেশ করিব। কিছুদিন পর মোকদ্দমার তারিখ পড়িল। তাহারা প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ উকিল নিযুক্ত করিল। আর তিনি টাকার দায়ে একজন সাধারণ উকিল নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। বিপক্ষের উকিলগণ সারাদিন ছওয়াল জওয়াব ও আইন নজির পেশ করিতে লাগিলেন। আর মৌলবী ছাহেবের উকিল নিরবে বসিয়া রহিলেন। ইহাতে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন নিশ্চয় তাহার উকিল বিপক্ষের দ্বারা বশীভূত হইয়াছেন। না হয় তো একটি কথাও না বলার কারণ কি? তিনি হতাশ হইয়া তাহার এক অফিসার বন্ধুকে গিয়া তাহা বলিয়া আসিলেন। বন্ধুটি উকিল ছাহেবকে চুপ করিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উকিল ছাহেব উত্তর করিলেন যে, বিপক্ষের জওয়াব এবং আমার যাহা বলার ছিল, হাকিম স্বয়ং নিজে তাহা বলিতেছেন। সুতরাং আমার বলিবার কি আছে। হাকিম তো আমার বলার অপেক্ষা করেন না। তাইতো তাহারা নানা নজিরে হাকিমকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

তখন হজরতের পবিত্রবাণী, “আমি ব্যারিষ্টার হইয়া হাকিমের অন্তরে প্রবেশ করিব” মৌলবী ছাহেবের অন্তরে বার বার আলোড়ন করিতে লাগিলেন।

এবং উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি এই বার আশ্বস্ত হইলেন।

অতঃপর বিচারক রায় প্রকাশ করিলেন। নীম্ন আদালতের রায়ই বহাল রহিল। তিনি সমুদয়ের খরচ সহ ডিক্রি পাইয়া মোকদ্দমায় জয় লাভ করিলেন। হজরতের এই অসাধারণ বাক্য রহস্য ও আশ্চর্য কেরামত দেখিয়া তিনি আরো ভক্তিভরে ও প্রেমউন্মাদনায় ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য দরবারে হাজির হইলেন। এবং হজরতের সমীপে সুসংবাদ পেশ করিলেন।

হজরতের আশ্চর্য্য কেরামতে বগলের নিচে কাবা শরীফে মছল্লি প্রবেশ করিতে দেখান

চট্টগ্রাম হাজির খিল নিবাসী আবদুল হালিম চৌধুরী ছাহেবের পুত্র আহমদ মিঞা চৌধুরী ছাহেব বলেন–

"একদিন আমি দরবার শরীফ হজরত কেবলার খেদমতে হাজির হই। সেই সময় আমার বয়স ১৬ কি ১৭ বৎসর। রোজ শুক্রবার ছিল। আমরা বাবাজান কেবলা হজরত মৌলানা শাহছুফি কুতবে জমান ছৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) এর এমামতিতে জুমার নামায সমাপন করি। নামায শেষ হইলে হজরত কেবলা মসজিদে হাজির হইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি নামায পড়িয়া ফেলিয়াছ! বাবাজান কেবলা উত্তর করিলেন, "ওয়াক্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা নামায পড়িয়া লইয়াছি" হজরত তখন জালাল হইয়া বাবাজান কেবলাকে বলিলেন, 'তুমি আমার বগলের নীচে দিয়া কাবা শরীফ দেখতো! এই বলিয়া তিনি হাত উপরের দিকে উঠাইলেন। বাবাজান কেবলাও আদেশ পালনে হজরতের বগলের নীচ দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। আমি তাঁহার পাশে দাড়ানো ছিলাম বলিয়া দেখিবার সুযোগ আমিও পাইলাম।

আমরা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, বহুদূরে একখানা বড় মসজিদ ও কাবা শরীফের হেরেম শরীফ দেখা যাইতেছে। তখন তথায় মছল্লিরা অজু করিয়া

নামায পড়িতে প্রবেশ করিতেছেন। তৎপর তিনি হাত নামাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখিয়াছ? দেখিয়াছ?" বলিতে বলিতে তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলাম। এই ঘটনা দর্শনে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

হজরত খিজির (আঃ) এর সঙ্গে হজরতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

একদিন রমজান মাসে সেহেরীর সময়, হজরত ছাহেবানী হজরত ছাহেবকে বলিলেন, "ফকীরে ফকীরে শুনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে; কৈ আপনি তো আমাকে এখনও কোনদিন খিজির (আঃ) কে দেখাইতে পারিলেন না।" ইহাতে হজরত হাসিয়া উঠিলেন। এবং তাঁহাকে বলিলেন "সত্যই কি আপনি খিজির (আঃ) কে দেখিতে চাহেন!" ইহা বলিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন। হজরত ছাহেবানী সেহেরী খাইয়া কুলি ফেলিবার জন্য দরজা খুলিতেই দেখিতে পাইলেন, একজন সৌম্যমূর্তি শুভ্রবসন পরিহিত লোক বাহিরে, আঙ্গিনায় দাড়াইয়া আছেন। তিনি দরজা বন্ধ করিয়া হজরত ছাহেবকে বলিলেন, এই লোকটি কে? বাহির বাড়ীতে যাইতে বলুন। এখানে আমাদের অসুবিধা হইতেছে। হজরত উত্তর করিলেন, "আপনি যাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তো আসিয়াছেন।" হজরত ছাহেবানী ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইলেন। এবং তাঁহার সহিত হজরতের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

৫৯ মঘির প্রলয়ঙ্করী ঝড় তুফানের ভবিষ্যৎ বাণী

একদিন হজরতের প্রতিবেশী ভক্ত খায়েজ আহমদ ছাহেব হজরত আকদাছের নিকট সহরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাড়াইলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা। গাছের পাতাগুলি পক্ষীর মত উড়িতেছে। তুমি সহরে যাইওনা।"

হজরত যখন এই কথা বলিতেছেন, তখন আকাশে মেঘের লেশ মাত্রও ছিলনা। প্রকৃতি বেশ স্বাভাবিক ও শান্ত অবস্থায় ছিল। ঝড় তুফানের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছিল না। খায়েজ আহমদ আর সহরে গেলেন না। সন্ধ্যায় অকস্মাৎ আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পৃথিবী যেন অন্ধকার হইয়া উঠিল।

মুহুর্মুহু বজ্রের ভীষণ গর্জনে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিকদিগন্ত কাঁপাইয়া প্রবল ঝড় তুফান ও মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হইল। চারিদিকে অস্বাভাবিক শীলা ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষন হইতে লাগিল। সাগর জল উত্থিত হইয়া সাগর, উপকুলবর্তী দেশসমূহ নিমগ্ন করিয়া দিল।

সর্ব্বজনবিদিত এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ই ৫৯ মঘির তুফান নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

বিনা ঔষধে হস্ত পচা ও ক্ষতনালী আরোগ্য ও হজরতের বাক্যে আশ্চর্য্য কেরামত

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ছাদেক নগর নিবাসী ফয়জুল হক ফকির ছোটকালে দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া ডান হাতের উপরিভাগের হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। নানা প্রকার ঔষধে ভাল না হইয়া উহা পাকিয়া পচা ধরে ও পাঁচটি নালী হইয়া পূজ পড়িতে থাকে। সমস্ত শরীর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাহাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তথায় হস্ত কাটিয়া ফেলা ছাড়া অন্য চিকিৎসা না পাওয়ায় তাহার পিতা ছাহেব হস্ত কাটিতে রাজী হইলেন না। তিনি ছেলে ফয়েজুল হককে হজরতের সকাশে নিয়া আসেন এবং কাঁদিয়া হজরতের খেদমতে আরজ করেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "কাটিতে হইবে না ভাল হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া ফয়জুল হকের পচা হাতের উপর তাহার হাত ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজ হাতে তাহাকে এক টুকরা পাকানো গোস্ত তবার্‌রোক খাওয়াইয়া দিয়া বিদায় দিলেন। ইহার পর হইতে তাহার হাতের পচা ও পানি পড়া বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে হস্তনালী

শুকাইয়া ধীরে ধীরে আরোগ্য হইয়া যায়। উক্ত ফয়জুল হক ফকির হজরতের বিশেষ আশেক হিসাবে বর্তমানেও বাঁচিয়া আছেন। তাহাকে হজরত সম্বন্ধে বা মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উক্ত হাতকে দেখাইয়া হজরতের বেলায়েতের উপর আস্থা ও ভক্তির নিদর্শন খাড়া করেন। তাহার উক্ত হাত এখনও অপর হাত হইতে একটু বেঁটে কিন্তু সমভাবে সবল। তিনি উভয় হাতে সমান কাজ কর্ম করিতে পারেন। হজরতের এইরূপ অসংখ্য ও আসাধারণ ঘটনাবলী রহিয়াছে যাহা গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধির কারণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিখিলাম না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হজরতের আচার আলাপন ও ভাব ভঙ্গি

(ক) গান বাদ্য ও ছেমায় হজরতের সম্মতি

চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি থানার, পাইন্দং নিবাসী মরহুম মৌলানা সাদুল্লাহ্ ছাহেবের পুত্র মোহাম্মদ এসহাক ছাহেব হজরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় সময় হজরতের খেদমতে আসিতেন। কোন কোন সময় হজরত তাহাকে আদেশ দিতেন, "মামু ছাহেব, বাঁশের ঘরে বাস করিয়া" গানটি গাও তো।" তখন তিনি দোজানু হইয়া হজরতের সামনে বসিয়া নিজ হাটুর উপর দুই হাতে তাল বাজাইয়া গাহিতে থাকিতেন ঃ–

ওহে জগ মহাঠক কেন কর দিলদারী
বাঁশের ঘরে বাস করিয়ে পাকাইনু চুল দাড়ী "ইত্যাদি–

(গুরুদাস রচিত)

প্রসিদ্ধ গায়ক গুরুদাস হজরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি হজরতের সামনে বসিয়া খঞ্জুনী বাজাইয়া বৈরাগী সুরে হজরতকে গান শুনাইতেন। হজরত উহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। তিনি গুরুদাস ফকির নামে পরিচিত, (সমাধি বারবকুণ্ড)। বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গিত বিশারদ আফতাবুদ্দিন ও সুর বিশারদ আলাউদ্দিন প্রভৃতি হজরতের সামনে হাজির হইয়া বাঁশী ও এস্রাজ সমেত হজরতকে সঙ্গিত শুনাইতেন।

ইহা ছাড়া হজরতের মুরিদ শিষ্য পটিয়া থানার অন্তর্গত আহলা মৌজার কাজী মৌলবী আছদ আলী, গোবিন্দ খিল মৌজার শাহ্ আমিরুজ্জমান, কাঞ্চনপুর নিবাসী মৌলানা আবদুল হাদি ছাহেবানের মধ্যেও কেহ কেহ

হজরতের খেদমতে গান গজল, নাতিয়া শুনাইতে অনুমতি চাহিলে, তিনি অনুমতি দিতেন এবং শ্রবণ করিতেন।
প্রায় সময় দেখা যাইত, গান বাজনার ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীগণ তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে গান বাজনা শুনাইতেন।

(খ) পাহাড়ীয়া চাকমা জুমিয়া প্রভৃতি জাতীর প্রতি হজরতের ব্যবহার

পার্বত্য চট্টগ্রামের চেঙ্গির অধিবাসী একজন চাকমা ভক্তকে হজরত বলিয়াছিলেন, "তুমি এতদূর পাহাড় পর্বত অতিক্রমে কষ্ট করিয়া আমার জন্য এসব দুধ কলা কেন আনিয়াছ!" চাকমাটি উত্তরে হজরতকে বলিয়াছিল, "তুই খোদামুহা মানুষ বলিয়া তোর জন্য আনি। তুর জন্য না আনিলে, আর কার জন্য আনিব।" হজরত হাসিতে হাসিতে তাহার হাদিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন। এবং খাদেমকে আদেশ দিলেন যেন তাহাকে যত্নের সহিত আহারাদি করান হয়।
এইরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য চাকমা, মগ, কুকি, পাকুজ টিপরা প্রভৃতি তাঁহার খেদমতে আসিতেন। বর্তমানেও তাঁহার পবিত্র রওজা শরীফে পাহাড়ী ভক্তগণ আসিয়া তাহাদের মানতি আদায় করে।

মজহাবী মাহফিলে হজরতের অদ্ভুত উপস্থিতি

(ক) জনাব মোনসেফ ছৈয়দ আমির উদ্দিন ছাহেবের জানাজায় হজরত

নানুপুর নিবাসী জনাব ছৈয়দ আমির উদ্দিন মোনসেফ ছাহেব ওফাত গ্রহণ করিলে জানাজার নামাযের সময় হঠাৎ হজরত ছাহেব কেবলা উপস্থিত হইয়া এমামতিতে দাড়াইলেন। নামাযের সময় তিনি প্রতি তকবীরেই হাত উঠাইয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত মৌলানা মৌলবী ছাহেবগণ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং হাত উঠানো মছায়েলায় তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। হজরত তাহাদিগকে উত্তর দিলেন, হামতো দুনিয়ায়ে দনিছে

হাত উঠায়া। মিল্লতছে হাত নেহী উঠায়া।” অর্থাৎ মিথ্যা দুনিয়া হইতে হাত উঠাইয়াছি। ধর্ম বা মিল্লত হইতে নহে।” তখন সকলেই চুপ হইয়া রহিলেন।

(খ) জনাব হায়দার আলী গোমস্তা ছাহেবের জানাজায় হজরত

চট্টগ্রাম নানুপুর নিবাসী ডাক্তার আবদুল মন্নান ছাহেব বর্ণনা করেন, “আমাদের নানুপুর গ্রামের জনাব হায়দার আলী গোমস্তা ছাহেব মৃত্যুকালে অছিয়ত করাইয়া যান যে, তাহার জানাজা যেন হজরত ছাহেব কেবলার দ্বারা পড়ান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত ছাহেবকে ডাকিতে আসা কালিন পথে প্রেরিত লোকটির সহিত হজরতের দেখা হয়। হজরত একটি লাঠি হাতে গোমস্তা ছাহেবের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন। লোকটি হজরতকে বলিতে না বলিতে হজরত বলিতে লাগিলেন, “হাঁ মিঞা তিনি যখন তাহার দাড়ি দিয়া হেরেম শরীফ ঝাড়ু দিতেছিলেন, তখন আমার সঙ্গে তাহার জায়নামায পড়াইবার ওয়াদা হয়। আমি উহা পালন করিতে যাইতেছি।” হজরত যাইয়া যথারীতি অজুগোছল সমাধা করাইয়া নামায শেষ করিলেন এবং বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।

(গ) ছুফী মমতাজ আলীর জানাজায় হজরত

আজিম নগর নিবাসী ছুফী মমতাজ আলী হজরতের মুরিদ ছিলেন। তাঁহার ওফাতের পর জানাজার নামাযের জন্য হজরতের নিকট লোক পাঠাইলেন। রাস্তার মধ্যে হজরতের সঙ্গে উক্ত লোকের সাক্ষাৎ হয়। হজরত তাহাকে বলিলেন, “মিঞা; আমি আসিতেছি”। হজরত যাইয়াই জায়নামাজে দাড়াইলেন। নামাযান্তে তাহার মাথায় নির্দেশ দিয়া পাগড়ী বাঁধাইয়া দিলেন।

হজরতের মজহাবী মছায়েলার উত্তর দান

(ক) গায়েব প্রকাশ (খ) সেজদা (গ) ফিত্‌রা

(ক) গায়েব প্রকাশঃ

ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা আবদুল জলিল ছাহেব, একদিন হজরতের খেদমতে গায়েব বলার মছায়েল জানিতে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

হুজুর! গায়েব্ বলা প্রকাশ করা কি জায়েজ আছে? হজরত উত্তর করিলেন, "যবকুন কাহা ছব হোগেয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়?"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা, যখন হয়ে যাও বলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গেই সব হইয়া গিয়াছে। তখন আর অদৃশ্য কোথায় রহিল?

(খ) সেজদাঃ

তিনি আবার জানিতে চাহিলেন, হুজুর! সেজদায়ে "তাহীয়ার" ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

হজরত উত্তর করিলেন, "পাঁচ আদমী কে লিয়ে সেজদায়ে তাহীয়া হ্যায়। কাজিখান ফতোয়া দেখো।

অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঁচ জনকে সেজদায়ে তাহীয়া করা জায়েজ আছে। মা, বাপ, পীর, ওস্তাদ এবং সুবিচারক বাদশা।

হজরতের খলিফা ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা আমিনুল হক ছাহেব, "তোহফাতুল আখিয়ার" নামক কেতাবে উহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। উহাতে হজরতের অনুমোদন ও দস্তখত আছে। তিনি নিজে রেওয়াজ বা দেখাদেখী প্রথাকে পছন্দ করিতেন না। বলিতেন "আচ্ছালামু আলায়কুম কহো"।

(গ) ফিত্‌রার মছায়েলার উত্তরঃ

একদিন প্রতিবেশীগণ হজরতের নিকট ফিত্‌রার মছায়েলা জানিতে চাহিলেন। তাহারা বলিলেন, হুজুর! কেউ বলে আটা দিতে কেউ বলে গেউ দিতে, আমরা এখন কোন পথ ধরিব! হুজুরের রায় জানিতে চাই।

হজরত উত্তর করিলেন, মিঞা! যেই দেশে যেই খাদ্য প্রধান, তাহাতেই ফিত্‌রা দেওয়া যাইতে পারে। তোমাদের প্রধান খাদ্য চাউল। তোমরা চাউল দিলেই ফিত্‌রা আদায় হইয়া যাইবে।

বাহাছ মোনাজেরা

এক সময় আজিম নগর নিবাসী মাষ্টার ফয়েজউল্লাহ ছাহেবের বাড়ীতে মৌলানা মহিউদ্দিন নামক একব্যক্তিকে মাইজভাণ্ডারী তরিকামতে হালকা জিকির, ছেমা ও সেজদায়ে তাহীয়া সম্বন্ধে মাইজভাণ্ডারী ভক্তগণের বিরুদ্ধে ওয়ায়েজ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়।

হজরতের মধ্যম ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র ও অন্যতম খলিফা জনাব মৌলানা ছৈয়দ আমিনুল হক (প্রকাশ ছোট মওলানা) ছাহেব আজিম নগর নিবাসী মুন্সি ছৈয়দ আফাজুদ্দিন ছাহেবের পুত্র হজরত ছাহেবানীর সহোদর ভ্রাতা ও হজরতের ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা আবদুল মজিদ মিঞাকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া আরজ করিলেন,

হুজুর! আমরা বহু আলেম দরবারে পাকের শিষ্য ভক্তদের মধ্যে বর্তমান আছি। মহিষখালীর মৌলানা আকামুদ্দিন ছাহেব, রাঙ্গুনীয়ার মৌলানা খলিলুর রহমান ছাহেব, বাঁশখালীর মৌলানা মোহছেন ছাহেব, সুন্দরপুরের মৌলানা আমিনুল্লাহ ছাহেব, কাঞ্চনপুরি মৌলানা আবদুল গণি (আয়নায়ে বারী প্রণেতা) ছাহেব, মৌং আবদুচ্ছালাম, মৌং আবদুল হাদি, ফরহাদাবাদী মৌলানা আমিনুল হক ছাহেব এবং হাফেজ কারী মৌলানা মোহাদ্দেছ ছৈয়দ তোফাজ্জল হোছাইন ছাহেব এবং আরো অনেক বিখ্যাত আলেমগণ উপস্থিত আছেন। খোদার ফজলে আমাদের কাছে সমস্ত মছায়েলার কেতাবাদী ও প্রমানাদি মৌজুদ আছে। আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই মোনাজেরায় সুদক্ষ। হুজুরের অনুমতি পাইলে আমরা মৌলানা মহিউদ্দিনের সাথে বাহাছ মোনাজেরা করিতে ইচ্ছা করি।

হজরত আদেশ করিলেন, "তিনি মুছবী তরিকার লোক, খিজিরী কাজ কারবার তিনি কি বুঝিবেন? তোমরা ফাছাদ ও বাহাছ করিওনা। আপন হালতে থাকিয়া যাও। তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।" তখন

মৌলানা আমিনুল হক ছাহেবের (হজরতের ভ্রাতুস্পুত্র) আদেশে আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীতে ছেমা সহ জজবার মজলিশ করা হয়।

তাহারা ছেমার জজবা মজলিশ করাকালে যাহারা আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতে লাগিল; ছেমার শব্দ কানে আসিতেই তাহাদের জজবা ও সমস্ত শরীর আলোড়ন হইতে লাগিল। সকলেই ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল হিন্দুরা বলাবলী করিতে লাগিল, এই রাস্তা দিয়া যাইওনা। এই বাড়ীতে মক্কা চালান দিয়াছে। কেহ স্থির থাকিতে পারিবেনা। ফলে দেখা গেল মৌলানা মহিউদ্দিনের মজলিস জমিল না, উক্ত মজলিস হইতে প্রায় সকলেই জজবা হালত ও বেখোদ অবস্থায় এই হালকা ও ছেমার মজলিসে যোগদান করিতে লাগিল।

ফাতেহাখানি মছায়েলায় হজরতের উত্তর

বিভিন্ন মৌলানা ছাহেবদের বিভিন্ন মতামত দেখিয়া মহল্লার লোকগণ একদিন হজরতের খেদমতে ফাতেহা ছওয়াব রছায়ী সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, মিঞা! আমার মাতা ছাহেবানী ঘর দরজা পরিষ্কার করিয়া লিপ দিতেন। এবং ফাতেহা পড়াইয়া ইছালে ছওয়াব করিতেন। মুরব্বিগণের প্রতি ছওয়াব পৌঁছাইতেন। ইহা ভাল।

শরিয়ত পালনে হজরত

হজরত ছাহেবের একমাত্র পৌত্র (নাতী) জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেব বলেন–

হজরত আকদাছ নিত্য নামাযে পাঞ্জেগানা আদায় করিতেন এবং অতি বেশী নফল নামায, কোরান শরীফ তেলাওয়াত, রোজা পালন ও মোশাহিদা মোরাকাবাতে রত থাকিতেন বলিয়া শুনিয়াছি।

তাঁহার শেষ সময়ে আমি বয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়ার পর একদিন তাঁহার পিছনে একতেদা করিয়া ঈদের নামায পড়িয়াছি। তিনি নামাযে "ছুন্নতামান কাদ্ আরছালনা কাবলাকা মিররাছুলেনা" আয়াত প্রথম রাকাতে পাঠ

করিয়াছিলেন। এবং মৌলানা আমিনুল হক ছাহেব, (তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র) হজরত কেবলার আদেশমত "খোতবা" পাঠ করিয়াছিলেন। অন্য সময় জাহেরা নামায পড়িতে আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেক ঘটনায় ও অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাকে মদিনা শরীফ নামায পড়িতে ও ছায়ের অবস্থায় সাক্ষাৎ পাইতেন। তিনি অনেকের বিপদ মুক্ত ও উপকার করিতেন।

তাঁহার ওফাতের কিছুদিন পূর্বে ঈদের নামাযে মৌলবী রহিমউল্লাহ্ ছাহেব তাঁহার আদেশমত খোতবা পাঠ ও এমামতি করিয়াছিলেন হজরত একখানা জায়নামাযে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু একতেদা করিতে দেখি নাই। ইহাছাড়াও তাঁহাকে আমি কোন দিন কেয়াম কউদ, রুকু সেজদার আরকান পালনে দেখি নাই। শেষ সময়ে রোজা পালনেও তেমন কোন আগ্রহ দেখি নাই। কোন কোন সময় রোজা পালন করিয়া এফতার করিতে দেখিয়াছি। এবং কোন কোন সময় রমজান মাসে দিনের বেলায় সরবত পান করিতেও করাইতে দেখিয়াছি।

হেদায়েত আলী ও মুনসিকদারের বাড়ীর আবদুর রহমান মিঞাকে রমজান মাসে সরবত পান করাইতে দেখিয়াছি। তখন প্রতিবেশী ছায়াদ উদ্দিন ছাহেব বলিয়াছিলেন – আবদুর রহমানের রোজাটি খলল হইয়া গেল। ইহা শ্রবণে হজরত বলিয়া উঠিলেন, "আমার ছেলেরা সব সময়ে রোজা রাখে"। আবার কোন কোন সময় হজরতকে একেবারে কিছু না খাইয়াও থাকিতে দেখিয়াছি।

পারিবারিক "মোয়ামেলাতে" হজরতের আপোষ ভাব

একদা এক ব্যক্তি হজরতের খেদমতে নালিশ করিল যে, তাহার ভ্রাতা জুলুম করিয়া তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। হজরত তাহাকে তাহার ভ্রাতার সহিত আপোষ মিমাংসা করিয়া লওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। লোকটি তখন বলিল যে তাহার ভাই আপোষ মানেনা। হজরত আবার বলিলেন, সে হারামজাদা, তাহাকে কিছু বেশী দিয়া আপোষ কর। এইরূপ ঘটনাতে প্রায় লোককে তিনি আপোষ মিমাংসার আদেশ দিতেন।

অতিব্যয় অত্যানন্দ ও সংসার ধর্মে অনাসক্তি

হজরতের দরবারে কেহ সাদীর কথা বলিলে, তিনি বলিতেন, নবি করিম (দঃ) দুনিয়াকে "দারুল হোজন" বলিয়াছেন। আর তুমি বল সাদী। তিনি জালাল হইয়া যাইতেন। কিন্তু খাদেমা বা বাবুর্চি আনিবার কথা বলিলে তিনি যথারীতি নাম জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অনুমতি প্রদান করিতেন।

হজরত কেবলা তাঁহার একমাত্র পুত্র মৌং ছৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেবকে বিবাহ করাইবার পর হজরত ছাহেবানী, বসতবাড়ীটি প্রসস্ত ও সুন্দর করিবার জন্য হজরত সমীপে বার বার অনুমতি চাহিলেন, তিনি উত্তর দিতেন "ভাই! দুনিয়া "দ্বারুল রেহালত" পান্থশালা। এখানে অতসুন্দর ও বেশী প্রশস্ত ঘরের দরকার কি? দুই দিন বিশ্রাম করার দরকার মাত্র। তাঁহার নিকট আনিত অগনিত হাদিয়া ও টাকা পয়সা তিনি অকাতরে লোকজনের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। কোন প্রকার সঞ্চয় বা জমা করিতে দিতেন না।

হজরতের পরদুঃখ কাতরতা

কোন ছেলেমেয়ে কাঁদিলে বা দুঃখ পাইলে হজরত ব্যস্ত হইয়া যাইতেন। যেই পর্যন্ত তাহাদিগকে শান্ত করা না হইত সেই পর্যন্ত তিনি নিজে শান্ত হইতেন না বরং বিচলিত থাকিতেন।

যে কোন গরীব দুঃখী তাঁহার নিকট কাপড় চোপড় চাওয়ার বা ঘর মেরামতের নাম করিয়া কিছু চাহিলে তিনি অকাতরে সম্মুখে যাহা পাইতেন, দান করিয়া দিতেন। খাদেম ছেলেগণকে তিনি রাত্রে বিছানায় যাইয়া দেখিতেন, তাহাদের মাথায় বালিশ বা গায়ে কাপড় আছে কিনা? না থাকিলে নিজে ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। অনেক সময় নিজের কাপড় ও শাল চাদর তাহাদের গায়ে দিয়া দিতেন।

দূরে ভিন্নস্থানে বিপদে বা কোন দুঃখে পড়িয়া তাঁহাকে কেহ স্মরণ করিলে বা সাহায্য চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাত বিপদ বারণ ও দুঃখ হরণ করিতেন। টাকা পয়সার দরকার হইলে তাহার দরকার অনুযায়ী যথাসময়ে গায়েবী সাহায্য করিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিতেন।

মির্জাপুর নিবাসী মৌলানা ছৈয়দ মছিউল্লাহ্ ছাহেব বর্ণনা করেন, 'আমি এক শীত রাত্রে তাহাজ্জদের নামায পড়িতে উঠিয়া অত্যন্ত শীত অনুভব করিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম, আমার বেহাই হজরত ছাহেব কেবলার নিকট সংবাদ পাঠাইলে নিশ্চয় তিনি আমার জন্য শীতবস্ত্র পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার কাছে আনিত অনেক শাল ও মূল্যবান কাপড়াদি আছে। আমার আর খরিদ বা তৈয়ার না করাইলেও চলিবে।

ঘটনাক্রমে সেই রাত্রে হজরত গাজির হাটে মুনসিকদার বাড়ীর তদীয়ভক্ত আবদুর রহমান মিঞার দোকানে অবস্থান করিতেছিলেন। শেষ রাত্রে হঠাৎ তিনি আবদুর রহমান মিঞাকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, "আবদুর রহমান মিঞা! একখানা বালাপোষ তৈয়ার করিয়া রাখ।" তিনি সকালে উঠিয়া দরজী ডাকিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বালাপোষ তৈয়ার করাইয়া হজরত সমীপে হাজির করিলেন। হজরত উহার সমস্ত খরচ আদায় করিয়া দিলেন। হাদিয়া রূপে লোকের আনিত দুইখানা শাল সহ উক্ত বালাপোষ খানা সন্ধ্যায় মির্জাপুর তাঁহার বেহাই জনাব মৌলানা ছৈয়দ মছিউল্লাহ্ ছাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। হজরত তাঁহাকে "মোস্তফা" বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন, মৌলানা মছিউল্লাহ্ ছাহেব বলেন,

'সন্ধ্যায় আমি হজরতের পাঠানো বালাপোষ ও শাল কাপড় দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইলাম। কারণ গত রাত্রে যাহা আমি মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলাম তাহা কাহারো নিকট ব্যক্ত করি নাই। অথচ হজরত আমার জন্য ঐ কাপড়ই পাঠাইয়াছেন, যাহা আমি পাইতে মনে মনে আশা পোষণ করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তিনি পর দুঃখে দুঃখী ও অন্তর্যামী।

এইরূপ মুফতী মৌলানা ফয়েজ উল্লাহ্ ছাহেব বক্তপুরি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা বক্তপুরি মৌলানা হামিদ উল্লাহ্ ছাহেবের পুত্র মৌলানা এজাবত উল্লাহ্ ছাহেব, খাজনার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কারণ তাহার গুমান মর্দন এলাকার তরফ মহাল বাকী খাজনার দায়ে নিলামে উঠিয়াছিল। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, হজরতের কাছে চাহিলে নিশ্চয় ইহার সমাধান হইবে। তিনি হজরতের

নিকট আসিবেন স্থির করিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একজন লোক মারফত হজরত কেবলা তাঁহার নিকট কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। তিনি টাকা গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, যত টাকা তাহার প্রয়োজন, ঠিক তত টাকাই হজরত তাহার জন্য পাঠাইয়াছেন।

ইহাতে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। এবং খোদার দরবারে হজরতের উপকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। এইরূপ অসংখ্য ঘটনা আছে; যাহাতে বিপদের সময় ভক্তজনের বিপদবারন ও দুঃখ হরণ হইয়াছে।

সকলের প্রতি হজরতের দয়ার্দ্রভাব ও শিষ্টাচারিতা

হজরত সকলের প্রতি যথাযথ সম্মানসূচক ব্যবহার করিতেন। কাহারো প্রতি কোন দিন রুষ্ট ব্যবহার করিতেন না। ছোটদের প্রতি তিনি মামু ছাহেব, মিঞা, দাদা, ভাই ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। বয়স্ক ও বড়দের প্রতি জনাব দাদা ছাহেব, ইত্যাদি শব্দে সম্মান দেখাইতেন। নিতান্ত দুরাচার লোক হইলেও তাহাকে তিনি অতি আদর ও সম্মান করিতেন। ইহাতে তাহাদের নীতি ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়া যাইত। হজরত তাঁহার সমসাময়িক আলেম ফাজেলদিগকে অতিশয় সম্মান করিতেন এবং সর্ব্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব রাখিতেন। এমন কি সময়ে সময়ে হজরতের জন্য আনিত সওগাত সমূহ হইতে তাহাদের জন্য সওগাত ও ছালাম পাঠাইতে দেখা যাইত।

বিলাসী পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধানে হজরতের অসম্মতি

হজরত নারীদের জেওর বা অলঙ্কার এবং তাবিজ ইত্যাদি পরিধান পছন্দ করিতেন না। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি আদেশ দিয়া এই সমস্ত খোলাইয়া ফেলিতেন। নাক কান ছেদন করিতে দেখিলেও তিনি সমবেত লোকজনকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। এবং এই সমস্তকে “মনহুছির জহর” বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন।

“হজরতের ধর্ম নিরপেক্ষতা”

(ক) বৌদ্ধ ধনন্‌জয়কে স্বধর্মে রাখিয়া দীক্ষা

জনাব শাহ্ ছুফি মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব বর্ণনা করেন– “আমি রোজ সকালে হজরতের সহিত চা পানে অভ্যস্ত ছিলাম। তিনি আমাকে ছাড়া একা চা নাস্তা খাইতেন না। একদিন সকালে নাস্তার সময় নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধনন্‌জয় নামক একব্যক্তি আসিয়া হজরতের নিকট ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি হজরতের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। হজরত তাহাকে সম্মতি না দেওয়ায় তাহার মনস্কাম পুরনার্থে আমাকে তাহার জন্য হজরতের নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ জানান। আমি হজরতের নিকট তাহার আর্জি ও বাসনা পেশ করি। ইহাতে হজরত ধননজয়কে তালাস করিলেন। ধনন্‌জয়, “হুজুর দাস হাজির আছি” বলিয়া হজরতের সামনে করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন।

তখন হজরত তাহাকে বলিলেন, “মিঞা! তুমি তোমার ধর্মে থাক। আমি তোমাকে মুছলমান করিলাম।” ইহার পরও তিনি বসিয়া রহিলেন। হজরতের খাদেম মৌলবী আহমদ ছফা কাঞ্চননগরি ছাহেব তাহাকে পিছন হইতে ইসারা করিয়া ডাকিয়া নিলেন। এবং বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাকে হাকিকতে মুছলমান করা হইয়াছে।

ইহার পর হইতে তিনি প্রায় সময় হজরতের হুজরায় তাঁহার ছোহবতে সময় অতিবাহিত করিতেন। হজরতের ওফাতের পর বাবাজান কেবলার হুজরাতে প্রায় রাত কাটাইয়া দিতেন। তাহার স্ত্রী আমাকে একদা বলেন যে, তাহার মৃত্যুর পরও তাহাকে স্বশরীরে বিচরণ করিতে অনেকে দেখিয়াছে। তাহার নির্দেশক্রমে তাহার মৃতদেহ চিতায় অগ্নিদাহ না করিয়া সমাহিত করা হয়। এইরূপ বহু হিন্দুভক্তকে চিতাগ্নিতে জ্বালাইতে অক্ষম হওয়ার পরে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমান পাওয়া যায়।

(খ) হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ চৌধুরীকে স্ব-ধর্মে দীক্ষা ও উপদেশ দান

হজরতের সর্বপ্রথম খলিফা অলিয়ে কামেল মৌলানা শাহ্ ছুফি অছিয়র রহমান ফারুকী (রঃ) এর সুযোগ্য সন্তান শাহজাদা মৌলবী খায়েরুল বশর মিঞা ছাহেব বলেন– ডাক্তার মৌলবী আবদুল মজিদ ও ডাক্তার মৌং আবদুল মালেক তাঁহারা উভয়েই হজরতের মুরিদ ছিলেন। তাহারা বলিয়াছেন, কধুরখীল মৌজার শ্রীকান্ত চৌধুরী বাড়ীর হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ বাবু ইছলাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া সস্ত্রীক একদা হজরত সমীপে হাজির হইয়া মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, "হুজুর আমি নিঃসন্তান। হুজুরের মেহেরবানীতে যদি আমার ছেলেমেয়ে হয় এবং আমাকে ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

তখন হজরত তাহাকে উত্তর করিলেন, "তোমাকে 'আজলে' (অর্থাৎ বাস্তবে) মুছলমান করিয়াছি। নিজের হাতে পাকাইয়া খাইও। পরের হাতের পাক খাইওনা। আমাকে নিরীক্ষণ কর। আমি বারমাস রোজা রাখি। তুমিও রোজা রাখিও। দেখ! মাদার গাছে ফুল হয়, ফল হয় কি?"

ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার সন্তান হইবেনা। আনুষ্ঠানিক ভাবে মুছলমান হওয়ারও তাহার প্রয়োজন নাই। রোজা নামাযের উদ্দেশ্য মতে পাপ বিরত থাকিয়া নিজের বিচার বুদ্ধিকে সামনে রাখিয়া চলাই প্রকৃত "ইছলাম।" এই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। হজরত তাহাকে উহার প্রতিই নির্দেশ দিতেছেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

‘হজরতের শান ও বেলায়েত মর্য্যাদার পরিচয়’

হজরতের দেহের অলৌকিক অবস্থা

ছুফী জিয়াউল হোছাইন ছাহেব বর্ণনা করেন, একবার তিনি হজরত কেবলার সহিত তাঁহার বাড়ীর পশ্চিম দিকের লোহার খালের পশ্চিম দিক হইতে বাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন। খালে পানি ও কার্দ্দম দেখিয়া হজরত পা মোবারক হইতে জুতা খুলিতে উদ্যত হইলেন। তখন জিয়াউল হোছাইন বলিলেন, হুজুর আপনি জুতা খুলিবেন না। আমি কোলে করিয়া আপনাকে খাল পার করাইয়া দিব। ইহাতে হজরত বলিলেন, আপনি আমাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবেন না। জিয়াউল হোছাইন বলিলেন, কেন হুজুর আমি তো আরো কতবার আপনাকে খাল পার করাইয়াছি। হজরত বলিলেন, “না মিঞা অদ্য পারিবেননা।” তবুও জিয়াউল হোছাইন তাঁহাকে কোলে করিয়া খাল পার করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি তাঁহাকে মাটি হইতে উঠাইতেও পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাহার চক্ষু হইতে রক্ত বাহির হওয়ার উপক্রম হইল। তবুও পারিলেননা। তাহার মনে হইল যেন হজরতের পা মোবারক মাটির সহিত লাগিয়া রহিয়াছে। ব্যাপার তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেক সময় দেখা যাইত হজরত বিছানায় শুইয়া আছেন। অথচ দেখিয়া মনে হইত যেন একখানা কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার পবিত্র দেহ মোবারকে এক প্রকার দারুচিনি গাছের খোসবু ছিল। যেই রাস্তায় তিনি চলিতেন সেই রাস্তায় বহুক্ষন পরেও পরিচিত কেউ গমন করিলে অনুভব করিতে পারিত যে হজরত এই পথে তশরিফ নিয়াছেন। তাঁহাকে একই সময়ে বহুস্থানে এমন কি মক্কা মদিনায় পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হইত।

সময় মত আবশ্যকীয় সওগাত

হজরত বা হজরতের পারিবারিক আবশ্যকীয় কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে তাহা খোদার মেহেরবানীতে সময় মতো আসিয়া পৌঁছিত। প্রয়োজনের অধিক দ্রব্যাদি তিনি বিলাইয়া দিতেন।

হজরতের পৌত্রের প্রতি অবর্ণনীয় অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন

হজরত আকদাছের বর্তমান মর্যাদাশীল তাঁহারই খেলাফত অর্পিত একমাত্র পৌত্র শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেবের প্রতি হজরতের যে প্রীতি ও অগাধ ভালবাসা ছিল, ইহার নিদর্শন স্বরূপ একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

হজরত ছাহেব কেবলা সবসময় তাঁহাকে সঙ্গে নিয়াই পান আহার করিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন দিনই তিনি আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না।

একদা তিনি তাঁহার আম্মাজানের সহিত তাঁহার নানাজান মির্জাপুর নিবাসী বড় মৌলবী ছৈয়দ মছিহুল্লাহ্ শাহ্ ছাহেবের বাড়ীতে বেড়াইতে যান। এবং তথায় তিনি একদিন অবস্থান করেন। পরদিন সকালে খাদেম রহম আলীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনা হয়। তিনি বাড়ীতে আসিয়া জানিতে পারিলেন, হজরত তিনি যাওয়া পর্যন্ত কোন আহার্য্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকট খাবার নেওয়া হইলে তিনি দাদা ময়না ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইনকে তালাস করিতেন। তিনি নানা-বাড়ীতে গিয়াছেন শুনিলে বলিতেন; খানা নিয়া যাও। দাদা ময়না আসিলে এক সাথে বসিয়া খাইব।

হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব বলেন, এই ঘটনার পর হইতে আমার আর কোথাও যাওয়া হইত না। বরং তাঁহার সাথে সাথেই থাকিতে হইত। এমন কি আমার বাল্যকালিন খেলাধূলা পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে যাইয়া করা হইত না। তিনি দায়েরা শরীফে তাঁহার বিছানায় বসিলে আমাকেও ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে বিছানায় বসাইতেন।

(হজরতের) পৌত্রের সানে
রহস্যপূর্ণ ভবিষ্যতবাণী
(ক) নবাব হোচ্ছামুল হায়দারের নায়েব আজিজ মিঞার প্রতি হজরতের পৌত্রের সানে বাণী

একদা কুমিল্লার নবাব হোচ্ছামুল হায়দার তাহার নায়েব চিওড়া নিবাসী আজিজ মিঞাকে বহু হাদিয়া উপঢৌকন সহ হজরতের খেদমতে পাঠান। আজিজ মিঞা দরবার শরীফ উপস্থিত হইয়া হজরতের খেদমতে আরজ করিলেন, "হুজুর নবাব হোচ্ছামুল হায়দার আপনার খেদমতে এই হাদিয়াগুলি পাঠাইয়াছেন।" সেই সময় হজরত জালালী অবস্থায় ছিলেন। নায়েব ছাহেবের আরজ শ্রবণ মাত্র হজরত অত্যন্ত জালাল হইয়া উঠিলেন। মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন সাহেব বলেন "এই সময় আমি হজরতের সামনে উপবিষ্ট ছিলাম।" আজিজ মিঞার কথা শেষ হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নবাব হামারা দেলা ময়না হ্যায়। ফের আওর কোওন নবাব হ্যায়?"

(খ) এইরূপ বাঁশখালী নিবাসী সুলতান আহামদ নামক এক ব্যক্তি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হন। হজরত তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "হুজুর আমার নাম সুলতান আহমদ।" হজরত 'সুলতান' শব্দ শুনিতেই বলিয়া উঠিলেন, "তোম কোওন সুলতান হ্যায়? সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়।"

“হজরতের গাউছিয়ত স্বীকৃতি”

হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব বলেন, শৈশবে একদা আমি খেলার ছলে বাড়ীর আঙ্গিনায় গান করিতেছিলাম–

গাউছে মাইজভাণ্ডার, মোজহে সরবত পেলাদো।
তেক্ষেগিয়ে দেলকো মেরে, আজ ভোজা দো।
আবছরে লাহুত হোতোম, মালেকে মলকুত
ইন ছবকা তামাসা মোজহে, আয় মাওলা দেখাদো।
ইত্যাদি– (মৌলানা হাদী রচিত)

এই সময় হজরত ছাহেব কেবলা আন্দরবাড়ীতে গদীশরীফে বসিয়া ছিলেন। আমার গান শুনিতে পাইয়া খাদেমকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, “দুধের সরবত বানাও”। তারপর আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি লজ্জিত হইয়া হজরতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। হজরত আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,–

“দাদা ময়না সরবত খাইবেন?”

হজরতের সামনে একজাম দুধের সরবত দেওয়া হইল। প্রথমে তিনি নিজে কিছু সরবত গ্রহণ করিলেন। বাকী সরবত একবার তিনি পান করেন, কিছু আমাকে পান করান। বাকী সরবত অন্যান্যদের বিলাইয়া দেওয়া হয়।

“হজরতের উত্তরাধিকারী খলিফা নির্ণয় ও গদী অর্পন”

হজরতের পার্থিব নশ্বর জীবনের প্রায় শেষ সময় দেখা দিলে তাঁহার হস্ত ও পা মোবারকে এক প্রকার শোথ ও আমাশার ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এমন সময় একদিন আমি তাঁহার সহিত বাহির দায়েরা শরীফে বসা ছিলাম। সেই দিন শুক্রবার ছিল। জুমার নামায শেষ করিয়া মুছল্লিগণ পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে ভক্তি ও কদমবুচি জানাইতে হাজির হইল। হজরত ছাহেব কেবলা পূর্বমুখি উপবিষ্ট আছেন। আমার বড় ভাই ছৈয়দ মীর হাছান ছাহেব আগন্তুক হাজতিগণকে হজরতের খেদমতে আনিয়া সাক্ষাৎ করার কাজে রত আছেন। ঘরে বাইরে অসংখ্য লোকের ভীড়।

মহল্লার ছরদার মরহুম সায়াদ উদ্দিন ও তাহার ভ্রাতা আছাবউদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলেই হজরতের শেষ কালিন লক্ষণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। আছহাব উদ্দিন ছাহেব হজরতের খেদমতে অতি কাতর ভাবে আরজ করিলেন, "হুজুর আপনার তবিয়ত ও শরীর দিন দিন কমজোর হইয়া যাইতেছে। কোন সময় আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া আপনার স্বস্থানে চলিয়া যান, তারতো কোন ঠিক নাই; হুজুর স্বয়ং থাকিতে হুজুরের বড় নাতী ছৈয়দ মীর হাছানকে গদীতে বসাইয়া গেলে আমাদের জন্য ভাল হইত। আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েগণ, হুজুরের ভক্ত অনুরক্ত আগন্তুকগণ আসিয়া হুজুরের গদ্দীশরীফে সান্ত্বনা পাইতে এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতাম"।

হজরত আকদাছ তাহাদের প্রতি উত্তর করিলেন, "মীর হাছান মিঞা নাবালেগ, আমার "দেলাময়না" বালেগ। দেলাময়নাই আমার গদীতে বসিবেন।" ছৈয়দ মীর হাছান মিঞা বয়সে বড়, অথচ হজরত বলিতেছেন নাবালেগ; উপস্থিত জনগণ তাঁহার এই বিপরীত বাক্য রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। হজরতের পরলোক গমনের তেতাল্লিশদিন পর যখন মীর হাছান মিঞাও জান্নাতবাসী হন তখন সকলে হজরতের পবিত্র কালামের রহস্য বুঝিতে পারিল।

হজরতের পৌত্রের মর্যাদা নির্দেশে তাঁহার নবী অবয়বতার পরিচিতি

একদিন হজরতের ভ্রাতুস্পুত্র ছৈয়দ মুহাম্মদ হাসেম ছাহেব ভোরবেলায় ছৈয়দ মীর হাছান ছাহেবকে নিদ্রা হইতে একটু কর্কশ ভাষায় ডাকিয়া উঠাইতে শুনিয়া হজরত বলিলেন, "মিঞা রছুলুল্লাহর (দঃ) দুইজন নাতী হাছনাইনকে চিন না? (হজরত হাছান ও হোছাইন) আদবের মোকাম। আদব করিও" সেইদিন হইতে সকলেই তাঁহাদের প্রতি হাছনাইনের সমান আদব ও সম্মান করিতেন।

হজরত কেবলার উপরোক্ত কালাম এই ইঙ্গিত বহন করিতেছে যে "হাকিকতান" বাস্তবে হজরত, নবীর ও তাঁহার পৌত্রদ্বয় হজরত হাছান হোছাইনের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি।

হজরতের নিজ ভ্রাতুস্পুত্র বাবাজান কেবলার প্রতি ফয়েজ বর্ষণ ও খেলাফত স্বীকৃতি

হজরতের ভ্রাতুস্পুত্র গাউছুল আজম বিল বিরাসত মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) ছাহেব (প্রকাশ বাবাজান কেবলা) হজরতের প্রতি পতঙ্গতুল্য আশেক ছিলেন। হজরতও তাঁহাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতির নজরে দেখিতেন। একদিন জনাব বাবাজান কেবলা হজরত ছাহেবের কদম শরীফ দুইখানাকে দুই হাতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, হজরত কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়াইতে পারিলেন না।
অতঃপর তিনি জজবার হালতে তন্ময় অবস্থায় তাঁহাকে চেয়ারের হাতল দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহার করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত বদন মোবারক রক্তাক্ত করিয়া দিলেন। এবং মাথার চুলমোবারক ধরিয়া মূখমণ্ডলকে উপর দিকে ফিরাইয়া সুন্দর চেহারার প্রতি জজবাতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বলিতে লাগিলেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি।
হজরত মৌলানা শাহ্ ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেব বলেন, এমতাবস্থায় আমার দাদী আম্মা হজরত ছাহেবানী ও আমার মাতা এবং জেঠাই শাশুরী ছাহেবানী উপস্থিত হইয়া অতি কৌশলে স্বজোরে বাবাজান কেবলার হাত দুইখানা হজরতের কদম শরীফ হইতে ছিনাইয়া লইলেন। এবং তৈলদিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া হজরত ছাহেবানী বলিতে লাগিলেন; আপনি এখন কি কাজ করিলেন? এমন সুন্দর চাঁদের মত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে এইভাবে প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করা কি আপনার উচিত হইয়াছে? তাহার মাতাপিতা কি বলিবেন!

হজরত ছাহেব তখন বিশেষ শান্তভাবে বলিলেন, ভাই তাহা ঠিকই তাহাকে আমার একটি চক্ষু দিয়া দিয়াছি। সে শেষ পর্যন্ত আমার দুইটি চক্ষুই চায়। তাহাকে আমার দুইটি চক্ষুই দিয়া ফেলিলে আমি চলিব কি করিয়া। তখন হজরত ছাহেবানী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদারই মারপেঁচ।

তারপর বাবাজান কেবলাকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা আপনি যখন তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না সামনে আসিলে আপনার প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করেন এবং তিনিও প্রহার করেন এমতাবস্থায় আপনি কিছুদিন বাহিরে ছায়েরে চলিয়া যান। যখন আপনাকে দেওয়ার সময় হইবে, তখন হজরত আপনাকে তালাস করিয়াই যাহা দেওয়ার দিয়া দিবেন। তাঁহার হায়াত ও কাজ আরো বাকী আছে। আপনি কি এই সময়ে তাঁহাকে বিদায় দিতে চান? আওলীয়াদের কাজ শেষ হইলে তাঁহারা আর ক্ষণকালও এখানে থাকেন না। তাঁহার কালামে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই সময় আপনি কিছুদিন দূরে থাকা নিতান্ত দরকার।

হজরত ছাহেবানীর এই আদেশে বাবাজান কেবলা ছায়েরে বাহির হইয়া যান।

হজরতের হাকিকত রহস্যময় জজবাতি কালামে স্বমর্য্যাদা নির্দেশ ও উপদেশাবলী

হজরত ছাহেব কেবলা ভাব বিভোর তন্ময় অবস্থার পর, শান্ত প্রকৃতিতে যে সমস্ত জজবাতি রহস্যপূর্ণ কালাম করিতেন, তাহা সঙ্কলিত হওয়ার পূর্বে সাধারণ জ্ঞানের অতীত ছিল। তত্ত্বজ্ঞানীরা কিছু কিছু বুঝিলেও সম্পূর্ণ বুঝা বিশেষ দায় হইয়া পড়িত।

হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব বলেন "একদিন আমি হজরতের পাশে উপবিষ্ট আছি। পার্শ্বস্থ কুলাল পাড়ার হারিচান্দ নামক এক ভক্ত হজরতের খেদমতে আসিতেই হজরত তাহার প্রতি চটীয়া জালাল হইয়া যান। হজরত বলিতে লাগিলেন, "আমি একদিন

আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেবের সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম রছুল করিম (দঃ) এর "ছদর" মোবারক (ছিনা) এক অসীম দরিয়া। আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিলাম। পরে দেখি, দরজাতে রক্ষিত আমার দারুচিনি গাছের লাঠিটা হারিচান্দ চুরি করিয়া তাহার নিজের চাকের কাঠি বানাইয়াছে"। প্রকাশ থাকে যে কুম্ভকারের মাটির পাত্র তৈয়ার করিতে ছাঁচ দেওয়ার জন্য যে কাঠি ব্যবহার করে উহাকে চাকের কাঠি বলে। তিনি এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, লোকে সুযোগ পাইয়া দুনিয়ার কাজে হাজত মকছুদ পূরনেই শুধু তাঁহার দৈহিক অবস্থা ও বেলায়েতী শক্তিকে ব্যবহার করিতেছে।

কোন কোন সময় হজরত জজবপূর্ণ অবস্থার পর বলিতেন, "আমার চার কুরছি আছে, চার এমাম আছে, বারটি বোরজ বা ছেতারা, বার খানী কাছারী আছে।" সময়ে সময়ে হিসাব করিয়া উহাদের নামও বলিতেন। যাহা নবীকরিম (দঃ) এর সাদৃশ্যতার প্রতীক। সময়ান্তর ব্যক্তি বিশেষকে গালি দিতেন ও হস্তযষ্টি দিয়া প্রহারও করিতেন। সময়ে বলিতেন, "নবী করিম (দঃ) কে পাছ দো টুপী থে, এক হামারে ছেরপর দিয়া, দোছরে হামারা ভাই পীরানে পীর ছাহেব কা ছেরপর দিয়া"।

একদা তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ছৈয়দ আবদুল হামিদ ছাহেব তাঁহার খেদমতে আরজ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা আপনি এতবড় আলেম হইয়া জজবার হালতে এইরূপ গালিগালাজ ও বকাবকী করেন কেন?"

তখন হজরত তাহাকে বলিয়াছিলেন, "ভাই আবদুল হামিদ, তোমার স্ত্রী যখন ভাত পাক করে, তুমি কি তাহা দেখিয়াছ! পাতিলের মুখে ঢাকনি থাকে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তবে তোমার চিন্তা করা উচিত। সামান্য অগ্নিতাপে পাতিলের ছাকনী উত্তপ্ত হইয়া অসহ্যে উছলিয়া পড়ে।

অথচ খোদার অফুরন্ত অবর্ণনীয় দাউ দাউ আকারে প্রজ্জলিত প্রেমাগ্নি মানবদেহে যখন উত্তাপ বিস্তার করে, এলেমের ঢাকনী তখন কি করিতে পারে? আহমদ উল্লাহ্র কাছে খোদা প্রদত্ত এলেম আছে বলিয়াই তো এতদূর বরদাস্ত করিয়া আসিতেছে। তুমি একবার আমার চাদরের নীচে আসিয়া দেখ। আছমান জমিন আর্শ, কুরছি, লোহ, কলম, বেহেশ্ত দোজখ তোমাকে এক পলকে দেখাইয়া আনি। তবে তুমি বুঝিতে পারিবে। আমি কেন এইরূপ করি!

ছৈয়দ আবদুল হামিদ ছাহেব ভাবিলেন, না জানি তাঁহার চাদরে দাখিল হইলে আমার অবস্থা আবার কেমন হয়। আমার অবস্থা বিরূপ হইলে এই সংসার পরিচালনা করিবে কে। এই ভয়ে তিনি হজরতের সম্মুখ হইতে দ্রুত সরিয়া গেলেন।

হজরত খোদাসক্ত ও পবিত্র সরলতাপূর্ণ মানুষকে বেশী ভালবাসিতেন। তাই তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "আমার নিকট কি লইয়া আসিয়াছ। একখানা ঘইস্যা ডাল্‌স্‌ বা পাটিপাতার ফুল নিয়াও আসিতে পার নাই!"

তিনি সময়ে নির্দেশ দিতেন "ফেরেশ্‌তা কালেব বনে যাও।" অর্থাৎ ফেরেস্তার মত পরীস্কার পবিত্রতায় আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত থাক। "কবুতরের মত বাছিয়া খাও" অর্থাৎ হারাম পরিত্যাগ কর। সন্তান সন্ততি লইয়া সুমধুর স্বরে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও প্রশংসা গীতিতে নিমগ্ন থাক। যেমন কবুতর বলে "আকয়াবুন মরফুয়াতুন ও আকওয়াবুন মউজুয়াতুন"। কোন কোন সময় কাহারো প্রতি আদেশ করিতেন, "কুনজাস্কের মত (চালচড়া পাখী) নিজ হুজরায় বসিয়া আল্লাহ্‌র নাম জপ কর" কাহাকে বলিতেন, "কোরান শরীফ তেলাওয়াত কর"। আবার কাহারো প্রতি "আইয়ামে বীজ (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখাদির রোজা) রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন। কারো কারো প্রতি ছালাতে তস্‌বিহ্‌ ও তাহাজ্জদ নামায পড়িতে বলিতেন।

তাঁহার প্রথমাবস্থা ছাড়া শেষ অবস্থায়ও তিনি নামায রোজা পাত্রভেদে হজ্ব জাকাত বা আরকানে শরিয়ত পালনে নির্দেশ ও তাঁহার বেলায়েতী কৌশলে উহাকে কার্যকরী করাইতে দেখা যাইত। এবং নানা প্রকার নফল পদ্ধতীতে পাপ বিরত ও প্রেম প্রেরণা বর্ধক পূণ্যময় কার্য্যে মনোনিবেশ ও উৎসাহিত করিয়া থাকিতেন। তিনি আচারে আলাপনে, ভাবভঙ্গিতে মানবকে পার্থিব ও অপার্থিব অপচয় অনর্থক কার্য্য হইতে দূরে সরাইয়া সার্থকতা ও সফলতার প্রতি অনুধাবিত করিতেন। সময়ে তাঁহাকে বাহ্যিক শরিয়তি নির্দেশের বিপরীত হকিকত শরিয়তে রহস্যযুক্ত কার্য্যেরতও দেখা যাইত। কোন কোন সময় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি দিবারাত্র আহার করিতেন না। সপ্তাহ বা পক্ষকাল পর্যন্ত তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে দেখা যাইত।

দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিতে নবীর অবয়ব দৃশ্য

হজরত কেবলা সর্বাঙ্গিন আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে নবী করিম (দঃ) এর অবয়ব ছিলেন। তাঁহার শারিরীক গঠন ও নবী মোস্তফার (দঃ) শারিরীক গঠনের মধ্যে কেবল মাত্র মোহরে নবুয়তের পার্থক্য ছিল। এবং নামের মধ্যে তাঁহার মোহাম্মদ নামে নামীয় ছিলেন না বটে কিন্তু মোহাম্মদ ও আহমদ নামের সমস্ত প্রকৃতি ও গুনাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠ মোবারকের বাজুর নীচে কতেক যায়গায় ঘনিভূত লাল তীল প্রায় পরিদৃষ্ট হইত। কাওলী অর্থাৎ আলাপ আলাপনে তিনি নবী করিম (দঃ) এর মত মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার মৃদু আলাপে মানব হৃদয়কে মোহিনী যাদু অপেক্ষাও অধিকতর আকর্ষণ করিত। তিনি ছোটবড় সকলের প্রতি যথাযথ সুমিষ্ট ও সম্মান সূচক ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পবিত্র বাক্যালাপে সদা সর্বদা খোদায়ী প্রেম ও অনুগ্রহকনা বর্ষিত হইত। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্টি তো দূরের কথা তুষ্ট হয় নাই বলিয়া এমন কোন নজির ও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। প্রত্যেকে মনে করিত হজরত আমাকেই বেশী ভালবাসেন। "ফেয়লী ও আমলী" অর্থাৎ কার্য্যতর, খোদায়ী প্রেম প্রেরণায় ও ধ্যান ধারণায়, গুরুভক্তি ও পরোপকারিতায় এবং রেয়াজত সাধনায় বাহ্যিক প্রচারকার্য্য ছাড়া আছরারী রহস্যময় দিক দিয়া নবী করিম (দঃ) এর পূর্ণ সাদৃশ ও কার্য্য বিজরিত ছিলেন। তিনিই কলেমা তৈয়ব "লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ্" আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাণী সনাতন ইছলামী মূল মন্ত্রের সারবস্তু ছিলেন। এবং মানব জাতীকে উহার উচ্চাসনে পৌঁছাইতেও উক্ত মকামে পৌঁছিবার সঠিক ও সহজতর পথ নির্দেশে বদ্ধপরিকর ও দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। উক্ত মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য স্থানের প্রতি তিনি মানবকে অনুধাবিত করিতেন।

ছেফাতি বা গুণাবলীর দিক দিয়া তিনি জাহেরী উম্মি নিরক্ষর না হইলেও পরম আল্লাহ্ তা'লার প্রেম প্রেরণায় ও তাঁহার তৌহিদ তত্ত্বে এমন বিভোর ছিলেন, যাহাতে পার্থিব জগতের প্রকাশ্য অক্ষর শিক্ষা, পার্থিব কৌশল ও জীবিকা নির্বাহক বুদ্ধি তাঁহাকে কোন প্রকার সহায়তা করিতে সফলকাম হয়

নাই। বরং তাঁহার খোদা প্রদত্ত তৌহিদ রহস্যপূর্ণ জ্ঞানের সামনে পরাজিত ও হার মানিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে জাহেরী জ্ঞানের স্বভাব হইতে তিনি চিরমুক্ত ও পার্থিব ব্যাপারে উম্মিই ছিলেন।

তিনি নবী করিম (দঃ) এর বাকী সমস্ত গুণাবলীতে স্বভাবত: জন্মগতভাবে পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। যাহা তাঁহার বর্ণিত বাণীতে ও আচার ভঙ্গিতে অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রতিয়মান হয়। পূর্বে তাঁহার বর্ণিত কয়েকটি বাণীর নমুনা দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে নবী করিম (দঃ) সাদৃশ্যতার কোরান হাদিছে বর্ণিত মতে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।

চার এমাম, বার কুরছি ও বার বোরজের অধিকার লাভ করা তাঁহার অবয়ব প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাহারো প্রাপ্য নহে। নছলী বংশজাত সন্তানাদির লক্ষণেও স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়, তিনিই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) একক অদ্বিতীয় স্থলাভিসিক্ত যুগ প্রবর্তক ও সংস্কারক প্রতিনিধি ছিলেন। এবং তাঁহারই পূর্ণক্ষমতা ও গুনের আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া বিশ্বঅলি গাউছুল আজম বেশে সারা ভূবন পরিচালনা করিতেছেন। বিশ্বভুবন ব্যাপি আখেরী নবীর তৌহিদ তত্ত্ব প্রেমপূর্ণ রহস্য লীলায় মহা প্রভুর করুনা কতা “বরিষণে রহমতুল্লিল আলামিন” ভূবনবাসীর ত্রাণকর্ত্তা আখেরী অলির আসন গ্রহন করিয়াছেন। নবী করিম (দঃ) যেরূপ কোন পুত্রজাত সন্তান জীবিত রাখিয়া যান নাই, তেমনী হজরত আকদাছ ও কোন ঔরশজাত পুত্র সন্তান ছৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেব, তাঁহার ইহলোককালিন সময়ে দুইজন শিশু সন্তান, ছৈয়দ শাহমীর হাছান ও শাহ্ ছুফী ছৈয়দ মৌলানা দেলাওয়ার হোছাইনকে ভবে রাখিয়া স্বর্গবাসী হন। যাহাদের পরিচয় ও মর্যাদা নির্দেশ করিতে যাইয়া হজরতকে নিজের গোপন রহস্যময় পরিচয় দান করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে “হাছনাইনে নবী তুল্য” বলিয়া পরিচয় দিতেন। যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হজরতের নাতীদ্বয় হজরত এমাম হাছান ও হোছাইনের সাদৃশ্য বলিয়া তাঁহার পবিত্র কালামে প্রকাশ পায় এবং কার্যক্ষেত্রে ও প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হয়। হজরত আকদাছ দৈহিক মানসিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও যাবতীয় স্বাভাবিক অস্বাভাবিক গুণ ও কার্যাবলীতে নবীর পূর্ণ অবয়ব এবং প্রত্যক্ষ প্রতীক ছিলেন।

হজরতের বেলায়েত মর্যাদার দৃশ্য

হজরতের শিশুকালিন স্বভাব ও অবস্থা হইতে নির্বিকারভাবে প্রমানিত হয় যে, তিনি খোদাবাঞ্ছিত স্বভাবসিদ্ধ মাদরজাত অলি ছিলেন। জাহের বাতেন প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থে জ্ঞান অর্জনে তিনি "বিদ-দারাছাত" মোকামের শ্রেষ্ঠতম অলির পদবী লাভ করেন। পীরে কামেলের নিকট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দীক্ষায় ফয়েজ রহমত লাভ ও খোদাতা'লার তৌহিদ নিগূঢ় রহস্য জ্ঞান অর্জনে বিল বেরাছাত উত্তরাধিকারীত্ব মর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী আউলিয়ার আসনে অলঙ্কৃত হওয়ার প্রমান পাওয়া যায়। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে দুইজন শ্রেষ্ঠতম পীরে কামেলের বাঞ্ছিত মুরাদী খলিফা সাব্যস্তে গাউছিয়ত ও কুতবিয়তের সর্বোত্তম শক্তি ও মর্যাদা লাভ করেন। কঠোর রেয়াজত ও অবিশ্রান্ত প্রেমপূর্ণ সাধনা বলে আত্মশুদ্ধির পরম উন্নতস্তরে উপনীত হইয়া বিল মালামাত দরজার সর্বোপরি মালামিয়া কলন্দরীয়া ও আদর্শ অলি সাব্যস্ত হয়।

এমনিভাবে তিনি পরম করুনাময় আল্লাহ্ ও তাঁহার মাহবুবগনের বাঞ্ছিত নির্বাচিত আজলি ও আবদী অলি এবং শিক্ষা দীক্ষায় ও কঠোর সাধনায় সর্বস্তরে সমস্ত মোকামের শ্রেষ্ঠতম বিশ্বজনিন গাউছুল আজম ও কুতুবুল আকতাব খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র অদ্বিতীয় মাহবুব ও উভয় জাহানের প্রতিনিধি শেষ বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজতবা (দঃ) এর পদাঙ্ক অনুসারী "লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ্‌র" মূল রহস্য ও উদ্দেশ্য আনুগামী। এবং উক্তপথের অনুসন্ধান দাতা ও নির্দেশকারী স্বাধীন শেষ বিশ্বঅলির পদবী লাভ করেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিগত কোন গোত্রে সমাজ বা সম্প্রদায়গত অলি নহেন। জাতী ধর্ম্ম নির্বিশেষে হিংসা বিদ্বেষ সমাজ ও ধর্মীয় বাধা-বিঘ্ন পরিহারে সমস্ত ধর্মের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ এর একত্ত্বে, প্রেম প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে বিশ্বমানবকে পৌঁছাইয়া দিতে ও উক্তপথে অনুধাবিত করিতেই তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি বিশ্বজোড়া মহাসাগর রূপে বিশ্বমানবকে ভুবনব্যাপি প্রেমধারায় বহাইয়া নিয়া খোদার প্রেমে নির্জীবদেহে

প্রান সঞ্চার করিতেন। সমস্ত তৃষ্ণাতুর জ্বিন মানবকে স্মরণের সঙ্গেই প্রেমবারিতে তৃষ্ণা নিবারণ করাইয়া প্রেম ইঙ্গিতে একত্ব মহাসাগরে আহ্বান করিয়া নিতেন। তাঁহার প্রেম প্রেরণা বরিষণে মানব হৃদয়ের নফ্ছাকৃতি আবর্জনাকে পরিষ্কার পবিত্র করিয়া মহান একত্বে মিশাইয়া দিতেন। জড় প্রাণী ও রূহানী জগত তাহার চক্ষু সামনে ক্ষুদ্র সরিষা সাদৃশ ছিল। আল্লাহ্ তা'লার গুপ্ত ব্যক্ত ও ইহ-পরকালিন সমস্ত সৃষ্টি জগতে তাঁহার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি মাহবুবে "নাজনিন" "রহমতুল্লিল আলামিন" সমস্ত সৃষ্টি জগতে অনুগ্রহবারী বর্ষণকারী; সৃষ্টি সুপরিচিত পরম অদ্বিতীয় বন্ধু ছিলেন। মোমেন, মুত্তকী ছুফী, কামেল, তাইয়ারা ছাইয়ারা, ফানাফিল্লাহ্ বকাবিল্লাহ্, দর্শনে খোদা ভীতি, খোদা স্মরণ ও খোদার প্রেমবারী বর্ষণ ইত্যাদি বেলায়েতী নমুনা সমূহের সর্বোচ্চস্তরেই তাঁহার আসন ছিল।

প্রভাব বিস্তার ও ফয়েজ বরিষণের স্বরূপ

প্রভাব বিস্তার ও আলোক প্রদানে তিনি বিশ্ব-রবি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কারণ, সূর্য্য হইতে চন্দ্র আলোক আহরণ ও প্রভাবান্বিত হয় মাত্র। কিন্তু সূর্য্য সমতুল্য আলোক ও প্রভাবশালী দ্বিতীয় সূর্য্যের সৃজন হয় না। আবার সূর্য্য বিহণে চন্দ্র আলোক ও প্রভাশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু হজরত আকদাছ এমনি খোদাদাদ সূর্য্য শ্রেয় অলি ছিলেন। একটি প্রদীপ হইতে যেমন বহু প্রদীপের সৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁহার প্রেমালোকে ও প্রভাবে অসংখ্য প্রভাবশালী সূর্য্যতুল্য আউলিয়ার সৃজন ও উৎপত্তি হইয়াছে। এবং তাঁহার প্রভাব ও আলোক রশ্মিতে বহু আবর্জনা ও অপবিত্র পবিত্র হইয়া নিজ পবিত্র মহান জাতে মিশিয়া গিয়াছে।

তাঁহার প্রভাবেই ঋতু পরিবর্তন, সুখ-দুঃখ, আপদ বিপদ, পরিবর্তন পরিবর্ধন খোদার সমস্ত সৃষ্টি জগতে শৃঙ্খলা সংগঠন ও সমাধা হইয়া থাকে। যাহা খোদার চিরন্তন রীতি ও নীতি। পূর্বোল্লিখিত ঘটনাবলীতে সমগ্র জগতে তাঁহার প্রভাব অত্যোজ্বলভাবে প্রতিয়মান ও পরিলক্ষিত হয়।

হজরত চতুর্থ-প্রকার বেলায়েত ধারার-ছালেক, মজজুব, ছালেকে-মজজুব ও মজজুবে ছালেক শেষোক্ত সর্বধারা সংযোযিত জজব ও ছলুকের সংমিশ্রনে, জজব বা প্রেরণাধিক্যে উন্নীত সর্বশ্রেষ্ঠ বেলায়েতী ক্ষমতাশালী মজজুবে ছালেক পদবীধারী আউলিয়া ছিলেন। ইহাই বেলায়েতের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক প্রভাবশালী পদবী ও স্তর। অন্য স্তরের অলিগণ সাধারণতঃ এই স্তরের–অলিদের অনুগত থাকে। এই স্তরের অলিরাই পীরে ফায়াল। বাক্যালাপে শিক্ষাছাড়া নিজ নিজ প্রভাবে মুরিদকে খোদার রহস্য জ্ঞান ও একত্বে পৌঁছাইতে সর্বাধিক সক্ষম। তাই হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফয়েজ এনাকাছী–খোদার সুগন্ধিতে সদা অন্বেষণ প্রবৃত্তি জাগরণী ফয়েজ স্বভাবতই অর্পিত হইত। কোন মুত্তকী বা উপযুক্ত লোক–হজরতের সংশ্রবে হাজির হওয়া মাত্রেই তাওয়াজ্জোয়ে এলকায়ী দ্বারা তৈলপূর্ণ–প্রদীপের মত প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া যাইত। এবং এছলাহী ফয়েজ ও তাওয়াজ্জোর বদৌলতে জল সঞ্চয়ক হাউজের মত ঐশ্বরিক প্রেম প্রেরণায় পূর্ণ হইয়া সমস্ত লতিফা ও রগরেশা আলোড়িত নফছ ও লতিফা সংশোধনের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত হইত। যথাযথ–উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইলে অথবা যাহাকে তিনি ইচ্ছা করিতেন, নিজ এত্তেহাদী ফয়েজ ও তাওয়াজ্জোর বদৌলতে স্বগুনে গুনান্বিত এবং স্বআত্মার প্রভাবে স্বীয়শক্তিতে মিশাইয়া লইতেন। এই নীম্নোক্ত ফয়েজই হজরত অত্যধিক দান করিতেন। ইহাতে দ্বিতীয়বার ফয়েজ অর্জনের বিশেষ কোন প্রয়োজন হইত না। ইহাতে মুরিদ পীরের সমগুণে রূপায়িত হইয়া পূর্ণ-কামেলিয়ত অর্জনে সক্ষম হইত। যাহাকে তিনি এক নজর এত্তেহাদী দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহাকেই দোজাহানের সুলতান ও পরশমনি করিয়া দিতেন।

হজরত সাধারনতঃ নবী করিম (দঃ)'র প্রচলিত প্রথানুযায়ী নীম্ন পদ্ধতীতে ফয়েজ রহমত অর্পণ, মুরিদ ও ভক্তগণের আত্মায় নিজ আত্মার প্রভাব বিস্তারে অনুগ্রহ বর্ষন করিতেন।

জবানী আলাপ আলোচনার মারফতে। যেমন হজরত নবী (দঃ) স্ত্রীলোকদিগকে বায়াত করিতেন। হাতেহাত রাখিয়া, যাহা অধিকাংশ ছাহাবীগণ হজরত রছুল মকবুল (দঃ) এর হাতে বায়াত ও ফয়েজ গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্তি ও বিশ্বাসের মাধ্যমে, স্ব-সাক্ষাতে মুরিদ নিজ ভক্তি এতেকাদের হাত হজরতের হুকুমের হাতে রাখিয়া তাঁহার আদেশ উপদেশ পালনে। যেমন নবী করিম (দঃ) পরবর্ত্তী উম্মতে মোহাম্মদী গনের ফয়েজ ও বায়াত গ্রহণ।

হজরতের খেদমত, সংস্রব ও সাহচর্য্যতার দ্বারা। যেমন হজরত আবু বকর (রাঃ) ও হজরত ওছমান (রাঃ) এর বায়াত ও ফয়েজ গ্রহন। সাক্ষাত বিহীন। কেবলমাত্র প্রগাঢ় ভক্তি ও মহব্বতের মাধ্যমেও তিনি তাওয়াজ্জো দান করিতেন। যেমন হজরত ওয়াজকরণীর (রাঃ) বায়াত ও ফয়েজ রহমত কণা অর্জন।

কাপড় ও ব্যবহারি সামগ্রী প্রদানে। যেমন আবিসিনিয়াধিপতি নাজ্জাশীকে হজরত নবী মোস্তফা (দঃ) বায়াত ও তাওয়াজ্জো দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষেপিত খাদ্য সামগ্রী বা তবার্‌রোক প্রদানে। যেমন হজরত আলী (কঃ) এর বায়াত ও ফয়েজ রহমত অর্জন। এই তাওয়াজ্জোই বিশেষ প্রেমপূর্ণ শক্তিশালী বলিয়া প্রমানিত। এই প্রনালিতেই হজরত আকদাছ অধিকাংশ সময়ে ফয়েজ ও তাওয়াজ্জো দান করিতেন। সময় সময় নিজ ব্যবহারি হস্তের লাঠি বা নিজ হস্তের প্রহারেও তিনি ফয়েজ ও তাওয়াজ্জো দান করিতেন।

কেরামত গুরুত্ব

হজরত নিজকে আত্মগোপন রাখিতে সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। তবুও আল্লাহ্ তা'লার মুখ্য উদ্দেশ্য ও বেলায়েতী শানকে সফলকামী করিতে হইলে মানব জাতীর বিশ্বাস ভক্তি ও প্রেম প্রীতি জাগাইয়া তাহাদের সুপথে গন্তব্যস্থানে আহ্বান করা একান্তই প্রয়োজন। তাই তাহাদের বিশ্বাস ভক্তি আনয়ন হেতু নবীদের মোজেজা সম, অনেক প্রকার অলৌকিক ঘটনা ও কেরামত স্বভাবতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িত। তাহাদের সুপথে আনিতে তাহাদের আত্মায় নিজ আধ্যাত্মিক বেলায়েতি প্রভাব বা ফয়েজ রহমত ও তাওয়াজ্জো বিস্তার করিতে অনেক রকম ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সংঘটনি ও কেরামত ঘটাইয়া বসিতেন। এই সমস্ত কেরামত সাধারণতঃ খোদা তা'লারই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। অত্র কারণে হজরত নিজ স্বরূপকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিতে পারেন নাই। স্বভাবতঃ খোদার ইচ্ছাতেই এই বিশাল ভব প্রান্তরে তাঁহার পবিত্র মহান আত্মার বুজর্গী বিকাশ হইয়া পড়ে। নচেৎ খোদার উদ্দেশ্য তাঁহার একাত্বে আহ্বান লীলা বেলায়েত রহস্য ব্যর্থ হইয়া পড়িত। তাঁহার প্রভাবে এই দেশের অলিতে গলিতে মাঠে ঘাটে সর্বত্র অদ্ভুত অলৌকিক সংঘটন ও কেরামত বিকশিত ও বিদ্যমান রহিয়াছে। দেশবাসীর মুখে অন্তরে তাঁহার প্রভাবজনিত যে সমস্ত কেরামত বিজড়িত ও বিঘোষিত রহিয়াছে তাহা সাধারণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব মানবের প্রতি হজরতের অবদান

(ক) নিরপেক্ষ তৌহিদ দ্বার উদ্ঘাটন

হজরত আকদাছ বিশ্ব মানবের জন্য এমন দুর্লভ অবদান সমূহ বিদ্যমান রাখিয়া গিয়াছেন যাহার সুফল আবহমান কাল পর্যন্ত স্থায়ী ও অবিকৃত থাকিবে। নবি করিম (দঃ) এর রক্ষিত চির অবিকৃত সর্বযুগোপযোগি পবিত্র কোরান গ্রন্থ ও তাঁহার বর্ণিত পবিত্র যুগ সাপেক্ষ হাদিছাবলী এবং ভুবনময় সর্ব্ব জাতীয় ধর্মগ্রন্থ ও রীতি নীতি সমুহের মূল উদ্দেশ্য সনাতন ইছলাম-তৌহিদ-খোদাদাদ নীতি পালনে পরম দয়াময় এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিবান প্রভুর একত্ব জাতে সম্মিলন। ইহাই একমাত্র স্রষ্টা ও সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। নবীবর মোহাম্মদ মোস্তফাই (দঃ) তাঁহার আহম্মদী বেলায়েতী শক্তি বলে, ইহজগতে মানবের অবতরণের পর একমাত্র মহা প্রভুর একত্বে মিলন পথ আবিস্কার ও নির্দেশিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আহম্মদীয় বেলায়েত পদ্ধতীর প্রাধান্য মোহাম্মদীয় নবুয়ত পদ্ধতীর সমাপ্তিতে স্থিতিশীলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নবুয়ত পদ্ধতি কেবল মাত্র নাছুতী মোকামের শৃঙ্খলারক্ষার্থে, নাছুতী স্তরের মানবের জন্য বিদ্যমান ও অনুসরণীয় হইয়া থাকে।

পবিত্র কোরান হাদিছের মেরুদণ্ড ও সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য, কলেমা তৈয়বা-এর (লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ্) মূল রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন প্রণালী খোদা তা'লার রহস্যজড়িত আহম্মদী বেলায়েত পদ্ধতি, চিরন্তন সার্বজনীন ও সকলের অপরিহার্য অনুসরণীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু হজরতের পূর্ববর্তী আউলিয়াগণ ধর্মীয় বাঁধনের মধ্যস্থতায় সম্প্রদায়গতভাবে আংশিক উক্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিলেও সম্প্রদায়গত সর্বজন বিধিত হিসাবে বিশ্ব মানবের

প্রতি জাতী ধর্ম নির্বিশেষে ধর্মমত বিরোধ পরিহারে বাধাহীন মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন কেহই করেন নাই। হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীই একমাত্র উক্ত দ্বার উন্মোচক ও বাধ্য বাধকতার পরিণতি কারী। তাই তাঁহাকে "বেলায়েতে মোত্‌লাকার" (স্বাধীন বাধাহীন বেলায়েতের) অধিপতি ও খাতেমূল বেলায়েত পদবীতে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই নিরপেক্ষ অবদানই মানব জগতে আল্লাহের একত্ব আলোক ছড়াইয়া সহজতর ভাবে নির্বিঘ্ন আল্লাহের একত্বে পৌঁছাইয়া দিতেছে। ইহা সকল ধর্ম ও তরিকতের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার একমাত্র সহজতম উপায়। ইহাই যুগসাপেক্ষ খোদার তৌহিদালোক, যাহা বিশ্ব জগতকে মহাজাতে সুমধুর মিলনের একমাত্র নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন ও মুক্ত বেপরওয়া তরিকত পদ্ধতি এবং আহম্মদী বেলায়েতী শক্তির সহজসাধ্য সফলকামী স্বরূপ। হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী লোকের বাহ্যিক আচরণ ও আচার পদ্ধতিকে অধিক গুরুত্ব না দিয়া অভ্যন্তরীন ভক্তি বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে অধিক গুরুত্ব ও মূল্য দিতেন।

(খ) খোদার একত্ব পথের সন্ধানে প্রেরণা দান

খোদার একত্ব-দেশে পৌঁছিতে হইলে, আধ্যাত্মিক প্রেরণা শক্তির সহায়তা একান্তই প্রয়োজন। ইহাই বেলায়েত শক্তি অর্জনের একমাত্র অমূল্য সম্পদ। এই দুর্লভ সম্বল ও শক্তি সঞ্চয়ে সমগ্র ধর্মীয় তরিকায় ও রীতিনীতির মধ্যে রেয়াজত এবং কঠোর সাধনাই একমাত্র ভিত্তি। ছুফী পরিভাষা মতে যাহাকে নেছবতে ছকিনা বা স্থায়ী খোদা সম্পর্ক নামে অভিহিত করা হয়। যাহার অভাবে নাছুতি মোকামের পার্থিব স্বভাব প্রবণ মানব, স্রষ্টার মহান প্রভুত্ব ভুলিতে বাধ্য হয়। যাহা না হইলে খোদায়ী সৎজ্ঞান অর্জন হয় না। এই সৎজ্ঞান ও প্রেরণা শক্তির অভাবে মানব হৃদয়ে খোদার প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও ভীতি সঞ্চার হয় না। তাহারা প্রেম কাতরে ভক্তিভরে মহা প্রভুর প্রভুত্ব স্বীকার খোদায়ী নীতি সনাতন ইছলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। এই প্রেম প্রেরণা ও সজ্ঞানের অপ্রাচুর্য্য ও সল্পতার কারণে মানব, বিচার-বুদ্ধি হারাইয়া অতি বিলাস সভ্যতার অনুসারী হইয়া দিন দিন অহঙ্কারী, খোদ

মোক্তারী আত্ম চিন্তায় বিভোর ও অত্যাচারী হইয়া নিজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নেয়।

তাই হজরত বিশ্ববাসীকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে খোদায়ী প্রেম প্রেরণায় বেলায়েতী শক্তি অর্জনে, খোদার সহিত নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে, তাঁহার একত্ব পথের মহা সম্বল প্রেম প্রেরণা-হাল ও জজবা উম্মুক্তভাবে দান করিতেন। হজরত সকাশে যে কেহ উপস্থিত হইতেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা – ফয়েজ রহমত হইতে কখনও বঞ্চিত হইতেন না। এমনও দেখা যাইত তাঁহার এত্তেহাদী ফয়েজ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কশ্‌ফ ও অন্তর্চক্ষু উম্মিলিত হইত এবং খোদার গোপন রহস্য জ্ঞান অবগত হইয়া উহা ব্যক্ত করিতে থাকিতেন। তাঁহারই বদৌলতে এই দেশবাসী হাল ও জজবাতি সম্পদে ধনী। এমন কি তাঁহারই প্রভাবে সারা ভুবনবাসী মুক্তভাবে জজবাতী প্রেম প্রেরণার অধিপতি। যাহার ফলে অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে বহু শক্তিশালী আউলিয়াগণের উৎপত্তি ও বিকাশ। ইহ সর্ব্ব জাতীর জন্য নিরপেক্ষভাবে রক্ষিত তাঁহারই অপূর্ব দয়া ও অতুলনীয় অবদান।

(গ) একত্ব পথের সহায়ক নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা

অতিবিলাস মুক্ত নির্বিলাস সভ্যতা হজরতের অদ্বিতীয় দান। হজরত আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে এমন কি প্রত্যেক কাজের ভিতর দিয়া নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা দিতেন। বিলাস মানুষের মধ্যে অনর্থকতা, অপচয় অতিব্যয় আনিয়া দেয়। বিলাস বহুল সভ্যতায় জীবিকা অর্জনে মানুষ অতিচিন্তায় অত্যধিক শ্রমে আত্ম বিভোরতায় নিমগ্ন হইয়া অবিচার, জুলুম প্রতিযোগীতা প্রতিদন্দ্বীতা দলাদলী ইত্যাদিতে লিপ্ত হইয়া নিজকে ধ্বংসের কবলে ফেলিতে বাধ্য হয়। ফলে মানুষ পরিনাম পরিণতি ও খোদাপ্রেম প্রেরণা এবং বিচার বুদ্ধি ভুলিয়া বিপথ অনুগামী ও দুঃখে পতিত হয়। ইহার ফলে মানুষ নিজ খোদাদাদ স্বাধীনতা হারাইয়া অনেক সময়ে অভিশপ্ত ও অধঃপতিত হইয়া পড়ে। তাই হজরত মানব জাতীকে অতি বিলাসের স্বভাব মুক্ত করিয়া সর্ব্বছুফীসম্মত নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা দিতেন। যাহা সনাতন ইছলামী

সভ্যতা। ইহা মানবকে নিষ্প্রয়োজনীয় অতিব্যয় ও অপচয় হইতে রক্ষা করে। যাহার ফলে মানুষ অতি চিন্তা, অতি শ্রমজনিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতে রক্ষা পায়। আত্ম চিন্তায় মত্ত হইয়া লোভজনিত অবিচার অত্যাচার রূপী কাল ভুজঙ্গতুল্য স্বভাবের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজ জীবনকে সুকাজে সার্থক ও সফলকাম করিয়া তুলিতে পারে। নিজ মুক্তি চিন্তায় রত হইয়া খোদার প্রেম প্রেরণা ও সৎজ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। যাহার প্রতিফল স্বরূপ-ছবর-ধৈর্য্য অল্পে তুষ্ট, জাহুদ তাকোয়া–সুবিচারে অন্যায় বর্জন, খোদার ভয় ভীতি ও খোদার উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি গুণ মানুষের নিকট অর্জিত হয়। ইহাতে মানব নির্বিবাদ, নিভৃত স্বর্গতুল্য শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া উভয় জাহানের সঞ্চয় বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। তাই হজরত ছাহেব কেবলাকে দেখা যাইত, তিনি হাওয়ায়ী অর্থাৎ অনর্থক কাজ কর্মে অযথা সময় নষ্ট, মন ও প্রবৃত্তির বশবর্তী আচরণকে কোন কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। তিনি অপচয় বিরোধী ছিলেন। তাই রেশমী কাপড় ব্যবহার, মেয়ে লোকদের অলঙ্কার ব্যবহার ও নাক কান ছেদন মোটেই পছন্দ করিতেন না। যাহা ব্যবহার ও ভোগ না করিলে চলে, এমন কোন সামগ্রী ব্যবহারে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন। অনেক সময় তিনি মেয়েদের অলঙ্কার খোলাইয়া ফেলিতেন। অলঙ্কার ব্যবহার ও নাক কান ছেদনকে তিনি জওহর ও মনহুছী বলিয়া অভিহিত করিতেন। বর্তমান প্রচলিত বিবাহ সাদীতে অতি উৎসব ও আমোদের বশবর্তী মানবের অতিব্যয় তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই হজরতের খেদমতে কেহ সাদী শব্দে বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন। বরং তাঁহার নিকট "ইজাব কবুল" বিবাহ বন্ধনে ছুন্নতি উপায়ে বিবাহ কার্য নির্বাহের অনুমতি পাইতেন। সাধারণ ভাবে সংসার যাপনে খাদেমা ও সেবিকা নিযুক্ত করিতে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "অনাবশ্যক কার্য্যে লিপ্ত সংসার নির্বাহ নিশ্চয় নবীবর্ণিত" দারুল হোজন অর্থাৎ চিন্তাগার ও দুঃখ খনি এবং

দুনিয়াদারী। আবশ্যকীয় সম্ভব স্বল্পব্যয়ে জীবিকা নির্বাহ নিশ্চয় দীনদারী। শান্তিময় জীবন যাপন ও নির্বিলাস সভ্যতা খোদা পন্থের সহায়ক।

(ঘ) আউলিয়া বুজর্গানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

এই নির্বিলাস ছুফী সভ্যতাবাদী হাল জজবার অধিপতি অলিবুজর্গের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, আদব তাজিম, তাঁহাদের দরগাহে লোক সমাগমে তাঁহাদের অনুগ্রহকতা হাল ও প্রেরণা অর্জনে স্ব স্ব আত্মার উন্নতি সাধিতে ও ওরছ উৎসর্গ কার্য্যাদিতে এই দেশীয় জন সমাজ এত অগ্রগামী ও অভ্যস্ত ছিল না। এমন কি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও নানা প্রকার পশ্বাদি জবেহ দ্বারা আল্লাহ্ ও অলিদের প্রতি প্রেমের কোরবানী আদায় উৎসর্গ পদ্ধতি হজরত ইব্রাহীম কৃত স্মৃতি কোরবাণী ছাড়া পরিদৃষ্ট হয় নাই। বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ), অলি শিরমনি হজরত পীরানে পীর দস্তগীর (রঃ) ও খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (রঃ) এর ওরছ শরীফ পর্যন্ত বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎযাপিত হইত না। বরং সাধারণভাবে মোরগ জবাহে ও সিন্নি পাকাইয়া তাহাদের ফাতেহা খানী সমাধা হইত। তাও প্রায় মানুষের ঘরে ঘরে।

হজরত আকদাছের আত্ম বিকাশের পর তাঁহারই প্রভাবে; তাঁহারই পবিত্র দরবারে এবং পর পর প্রায় পৃথিবীর সমস্ত বুজর্গানে দীনের মাজারে ও স্থানে স্থানে নবী ও অলিদের ওরছ কার্য্য পশ্বাদি জবাহে বিপুল সমারোহে তাঁহাদের ভক্ত মুরিদান কর্তৃক সম্মিলিতভাবে উদযাপন আরম্ভ হয়। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন কোরবানী আদায়ে তাঁহাদের পবিত্র আত্মার প্রতি খোদার অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের প্রেমকতা ও ফয়েজ অর্জনে নিজ আত্মা ও সর্বাঙ্গিন উন্নতি সাধন করিতে থাকে। তাঁহারই বদৌলতে বর্তমানে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের মাজার সমুহ অত্যুজ্জ্বল ও নানা প্রকার সম্মানীত পরিচ্ছদে সজ্জিত। আর এদেশীয় বুজর্গানে দীনের ভক্তিশ্রদ্ধা উপহারে ভূষিত হইয়া আগত ভক্তদের প্রতি নিজ পবিত্র আত্মার ফয়েজ রহমত বর্ষণে রত। তাঁহার প্রভাবে এই দেশের মৃত্তিকা স্বজীব ও

মাজার অধিপতি আউলিয়াগণ নিত্যান্দে জজবাতী কার্য্যে মগ্ন হইয়া দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শুভ অশীর্বাদে উহাদের হারানো উন্নতি ও সফলতা ফিরাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রেম প্রেরণায় খোদার প্রতি অনুরাগী ও বিভোর চিত্ত প্রেমে মত্ত, হুজুরী কলবে ও হাল জজবায় বন্দেগীরত করাইয়া তাঁহার একত্ব পথে আগাইয়া দিতেছেন। এইদিকে দেশবাসী ভক্তগণ চির অমর আউলিয়াদের প্রত্যক্ষ–কেরামত ও অনুগ্রহ দর্শনে তাদের প্রতি ভক্ত ও অনুসারী হইয়া খোদায়ী করুণাবারি অর্জনে দীনদুনিয়া উভয় জাহানে সফলতা লাভ করিতেছেন। এবং দিন দিন দ্রুতগতিতে খোদার একত্বের পথে অনুধাবিত হইতেছেন। এক কথায় হজরতের প্রভাবেই এই দেশীয় মাজারস্থ আউলিয়া, দেশ ও দেশবাসী পুনঃ নবজীবন লাভ করিয়াছে। এবং দেশবাসীগণ অলিউল্লাহদের অনুসরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিকে প্রকাশ্য ফয়েজ বর্ষণে অসংখ্য আউলিয়া নিযুক্ত করিয়া মানবকে খোদা পন্থে আহ্বান করিতেছেন। অপরদিকে সমাধিস্থ আউলিয়াদের প্রতি ফয়েজ দানে সজাগ করিয়া দলে দলে তাহাদের অনুসরণে খোদার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছেন।

হজরতের সানে মৌলানা জুলফিকার আলী ছাহেবের নাতিয়া

হজরতের এই বেলায়েতী প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া চট্টগ্রাম মোহছনীয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মরহুম মৌলানা জুলফিকার আলী ছাহেব (চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল সামশুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমদ আই, ই, এস, ছাহেবের পিতা) তাঁহার সানে নিম্নলিখিত নাতিয়া লিখিয়া তাঁহার প্রেম ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা–

و انـد سـالک انیق شـر * بنـــڈار جیم غوث ضیف دم از
مزارات در * فــنزود کـہ اثــر ہے راز تـــــربتش حال صـاحب
اجـلال و رونـق
شـدش صـــفت اعظم غوث * شیدرو سـرور شـاه الله احمد
وصـال چوں

অর্থ– গাউছে মাইজভাণ্ডারীর নিশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশীয় লোকেরা খোদাপন্থি, হাল ও জজ্‌বার অধিকারী হইয়াছে। তিনি কবরস্থ হওয়ার ফলে বিভিন্ন কবরে উজ্জ্বলতা ও জালালী–দেখা দিয়াছে। আহমদুল্লাহ্‌ যিনি, তিনি সমস্ত অলিদের সর্দার, যাঁহার ছিফাত গাউছুল আজম।। ইত্যাদি ...

অশ্লীলতামুক্ত ভাবজনিত গীতি জগত

বাংলা-গীতি জগত হজরতের পূর্ব্বে খোদায়ী রসশূন্য ও নানা প্রকার অশ্লীলতা রসে পরিপূর্ণ ছিল। বাংলার প্রায় সর্ব্ব স্থানেই অশ্লীল প্রেমের পাপজনিত রঙ্গ রহস্য পূর্ণ গান বাজনার প্রচলন ছিল কামরিপু প্রবণ নাছুতী স্তরের মানব স্বভাবতঃ কৃত্রিম প্রেমের বশবর্তী হইয়া–নাট্য গান, গাজো গানে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে আমোদ প্রমোদ বিশিষ্ট বৈঠক গান, নাউট্যা পোলার নাচগান, যাত্রা পালা গান, থিয়েটার ইত্যাদি বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ফলে উহার প্রচলন ও কুফল এমত চরমে পৌঁছিয়া ছিল যে গভর্ণমেন্ট কর্তৃপক্ষের প্রবল আইনগত বাধা সত্বেও উহা নিবারণ ও গতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাঃ) এর প্রভাবে এবং তাঁহার শুভ দৃষ্টি ও ফয়েজ রহমত বরিষণের ফলে বাংলার অশ্লীল কৃত্রিম প্রেমের গীতি জগত সম্পূর্ণ উহার বিপরীত রূপ ও গতি ধারণ করিল। হজরত এদেশীয় জনগণের “মাজাফ” রুচি অনুযায়ী তাহাদের প্রিয় গান বাদ্যের ভিতর দিয়া এমত অকৃত্রিম খোদা প্রেম, রহস্যবাজীর প্রস্রবণ বহাইয়া দিলেন, এমন খোদা প্রেমিক সঙ্গীত বিশারদ গায়ক, গান, গজল নাতীয়া রচমের পত্তন করিলেন, যাহার ফলে বাংলা গীতি জগত, আল্লা, রাছুল ও আউলিয়ার প্রেমের লহরী তুলিয়া প্রেম রসে খোদা স্মরণে মত্ত হইতে বাধ্য হইল। ভক্ত প্রবৃন্ধ সুর সঙ্গীত বিশারদ আলাউদ্দিন, সঙ্গীত বিশারদ আফতাব উদ্দিন, রায়হান, ঈশান, মনমোহন, বিজয় দাস, রায় ভবন, শিষ্য প্রবর মৌলানা আবদুল হাদী, আবদুল জব্বার, আবদুল্লাহ্‌, মৌলানা বজলুল করিম, মৌলানা ছৈয়দ মছাহাবুউদ্দিন, মৌলানা আমিনুল হক হারবাঙ্গীরী, কবি আবদুল হাকিম, কবি রমেশ বাবু ইত্যাদির প্রেম

তরঙ্গ প্লাবিত গান গজল নাতীয়ার পুস্তকাদি হজরতের প্রভাবিত অবদানের অকাট্য নজির। হজরত বাংলার গান বাজনাকে নির্দোষভাবে রূপায়িত করিয়া খোদার প্রেম প্রেরণা জাগরণের রুচিপূর্ণ কৌশল ও যুগ উপযোগী জিকিরী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে সম্মতি দানে উহার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। তরিকত পন্থি খোদা প্রেমিক জন মাহফীলে পবিত্র গান গজল নাতীয়া বাদ্যসহ ব্যবহারে প্রেম জাগরিত বিভোর চিত্ত জজ্‌বা হালে হালকা জিকির ও অজদ পদ্ধতি একমাত্র গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত ছাহেব কেবলারই অবদান।

এমতভাবে হজরত, রিপুজনিত স্বভাব ও আচরণ উৎস, অন্যজ্ঞান মানবতা বিরোধী বিশ্বে প্রচলিত রীতি নীতির ধ্বংস কারী, খোদা-দাদ পদ্ধতীর পরিপন্থি এবং একত্ব ও উন্নত পথের সহায়ক বহু অবদান বিশ্ববাসীর সম্মুখে আয়না সাদৃশ্য বিদ্যমান রাখিয়াছেন। যাহা অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত মানব জগতে আদর্শ হিসাবে সুরক্ষিত ও কার্যকরী থাকিবে। যাহার সুফল আহরণে মানব খোদার নৈকট্য ও চির শান্তি ভোগে আবহমান খোদার কৃতজ্ঞতা ও যশগীতি গাহিতে থাকিবে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হজরতের ওফাত এবং আল্লাহ্ তা'লার মহাজাতে মিলন

হজরত অনাবিল করুণাবারি বর্ষণের পর খোদাতা'লার তৌহীদ তোরণ চির উন্মুক্ত করিয়া সুদীর্ঘ ৭৯ (ঊনাশি) বৎসর কাল ভবে তাঁহার আধ্যাত্মিক লীলা সমাপনে, সকল জাতীর ও সর্ব্ব ধর্মীয় মুক্তির তরণী, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অপূর্ব অদ্বিতীয় দোজাহানীয় বন্ধু, বিশ্ব দরদী-মানব কল্যাণ, জগত বাসীর অতুলনীয় আশার প্রদীপ, মাহবুবে নাজনীন উভয় জগতের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ, ভক্তদের শান্তি, পাপী তাপী দুঃখী দুস্থের একমাত্র ভরসা সহায় সম্বল ও আশ্রয়স্থল, নবীদের নয়নমনি, গুপ্ত খোদা রহস্যের ব্যক্ত খনি, সমস্ত গাউছ কুতুবদের অত্যুজ্জ্বল রবি পীর আউলিয়াদের অগ্রনায়ক শাহানশাহ্–স্বাধীন বেলায়েতের ঝাণ্ডাবর্দার নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন বাধাহীন বেলায়েতের মোহরধারী, গাউছুল আজম ও কুতবুল আকতাব শিরোমনি গাউছুল আজম হজরত শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ (কঃ) মহান পবিত্র নবীর সর্ব্ব ছেফাতের আদর্শ ও অধিকারী হইয়া শেষকালে বিশ্ববাসীর নয়ন গোচরে মহান প্রভুর মহাজাতে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন। একদা ইংরাজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, হিজরী ১৩২৩ সনে বাংলা ১৩১৩ সালে ১২৬৮ মঘী'র ১০ই মাঘ মোতাবেক ২৭শে জিল্‌কদ সোমবার দিবাগত এক পবিত্র শুভ নিভৃত মুহূর্তে নিঝুম রাত্রে একটার সময় পরম প্রিয়তম একমাত্র মাহবুব মহান আল্লাহের শুভ মিলনে বিশ্ববাসীকে ছাড়িয়া এই ধরাধাম ত্যাগে পবিত্র অমর ধামে শুভ যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহে! তাঁহার পবিত্র মহান আত্মার উপর অবিরাম আল্লাহ্ তা'লার অসীম শান্তি করুণাবারি বর্ষিত হউক!

বিধির কি বিচিত্র লীলা! পরিবর্তনশীল জগতের কি আমূল রদবদল প্রকৃতির কেমন নিষ্ঠুর লীলা! কখন জগতবাসীকে আনন্দ তরঙ্গে ভাসাইয়া দিগ্বিদিক উল্লাসিত ঢেউ তুলিয়া দেয়। আবার কখন মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে সারা বিশ্বভুবনে শোক উচ্ছ্বাসিত বহ্নি বহাইয়া নেয়। আজ কারো মুখে হাসি নাই। আনন্দের লেশ নাই। আছে শুধু আর্তনাদ, আছে মাত্র করুণ কান্নার কুহরী রোল। আকাশ শোকাতুর হইয়া যেন নিচে নামিয়া আসিল। বাতাস যেন গতি রূদ্ধ হইয়া বন্ধ রহিল। জলধি যেন অচল হইয়া কাতর হইয়া তাহার হু-হু-রব হারাইয়া বসিল। স্থূল জগত নিরাশায় নিস্তেজ হইয়া তাহার উর্বরা শক্তিহীন হইয়া গেল। শীত ঋতু বিরহ হুতাশনে তাহার বিষাদ মাখা শিশির বিন্দু বরিষণে সমগ্র জগত ভিজাইয়া দিল। বৃক্ষলতা দুঃখে হতাশ হইয়া তাদের পত্রাশ্রু নিক্ষেপে ভু-বক্ষ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলের পরিধানে শোকের পরিচ্ছদ। চোখে মুখে অপূর্ব বিষাদময় হতাশের লক্ষণ। প্রকৃতির সুশোভিত সুন্দর সজীব চেহারা যেন একেবারেই বিগড়িয়া এক বিস্ময়কর বিকট বিমর্ষ আকার ধারণ করিল দিগদিগাঞ্চলে দুঃখের ধ্বনি যেন সারা বিশ্ব প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। যেন এক অদ্ভূত মাতম ধরনীতে সমগ্র ভুবন আলোড়িত করিয়া দিল। হায়রে দুর্ভাগ্য! হায়রে ললাট! একী তোর বিধির বিধান! একী তোর অখণ্ডণীয় লিখন! আমাদের আশা-রবি প্রাণ-নিধি, নয়ন-মনি আজ বুঝি এই বিশ্ব ভুবন অন্ধকার করিয়া আমাদেরে অসহায় করিয়া চলিয়া গেলেন। হে হৃদয় সখা গাউছ ধন! হে অফুরন্ত করুণা খনি! সর্ব্বজাতী দুর্গতের আশ্রয় ভাণ্ডারী! আজ বুঝি তুমি নারাজ হইয়া চলিয়া যাইতেছ? অতি অল্প সময়ে এই বিষাদ মাখা দুঃখ-সংবাদ দেশ দেশান্তরে অলিতে গলিতে নগরে কাননে হাটে ঘাটে পবন প্রবাহের মত বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। ঘুমে চেতনে, শেষ রাত্রে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া যাইতেছে, ভাণ্ডারী আর ভবে নাই। কেহবা স্বপ্নযোগে দৈব বাণীতে শুনিতে পাইতে লাগিল, আমাদের আশা রবি আজ অস্তমিত। ভোর হইল! চারিদিকে কান্না-কাটি বলা বলি শোক ধ্বনির যেন তুফান উঠিয়া গেল। সমস্ত দেশ দেশান্তরের ভক্ত-আসক্ত অনুরক্তবৃন্দ শোক-উচ্ছ্বাসে মাতাল বেশে পতঙ্গ সম দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কত আশেক বৃন্দ শোকে কাতর বেঁহুশ

মৃতপ্রায় শায়িত রহিল, কত শত শত ভক্তকুল মনির সর্পের মত হারানো মনির শোকে প্রাণ হারাইতে উদ্যত হইল। জন-সমুদ্রে বিষাদ তরঙ্গ মালা তরঙ্গায়িত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই বিশাল শোকোদ্বেলিত অনিয়ন্ত্রিত জন সমুদ্র জমায়েতে মুরিদ ভক্ত কামেল বুজর্গানের বিপুল সমাবেশে পরদিন মঙ্গলবার দিবা শেষে আছর পাঁচটার পরে হজরত আকদছের বেহাই পীর-ভাই ও ভক্তশ্রেষ্ঠ মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ মছিহুল্লাহ্ মির্জাপুরী ছাহেবের এমামতিতে জানাজার নামায কার্য্য সমাপন হয়। মগরেবের নামাযের পূর্বে তাঁহার পবিত্র দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হয়।

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।
কোলাহল পরিহারে, নির্জনতার আসরে,
তোমারই প্রতিক্ষায় রহিয়াছে আজি তোমারই বাসরে।
—শাহ্ ছুফী মৌলানা দেলাওয়ার হোছাইন রচিত

হজরতের ওয়ারেছ

হজরত আকদছের ওফাত কালে তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না। তিনি তাঁহার একমাত্র স্ত্রী ছৈয়দা লুতফুন্নেছা ছাহেবা, কন্যা ছৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা ছাহেবা, মরহুম একমাত্র পুত্র মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ ফয়েজুল হক ফানীফিল্লাহ্ (রঃ) ছাহেবের ঔরষজাত পৌত্রদ্বয় শাহ্ ছুফী ছৈয়দ মীরহাছান ও মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেবান ও পৌত্রী ছৈয়দা ছবুরুন্নেছা বিবি ছাহেবাকে একমাত্র উত্তরাধিকারী ওয়ারেছ হিসাবে এইভবে রাখিয়া যান। এবং বিল অলায়েত আধ্যাত্মিক ওয়ারেছ হিসাবে অসংখ্য কামেল অলি আল্লাহ্ গণকে তাঁহার খলিফা বা উত্তরাধিকারী বিদ্যমান রাখিয়া এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া অমর জগতে প্রস্থান করেন। তাঁহার ওফাতের ৪৩ দিনের মধ্যে তাঁহার বড় পৌত্র শাহ্ ছুফী ছৈয়দ মীরহাছান ছাহেব তাঁহার চিরসঙ্গী ও স্বর্গবাসী হইয়া চলিয়া যান।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সমাধিস্থ অবস্থায় হজরতের অলৌকিক কেরামত ও ফয়েজ-রহমত দান

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (রঃ) ভববাসীকে ছাড়িয়া তাঁহার নুরানী স্বদেশের নির্জন নিভৃত কুটিরে আত্মগোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার রুহানী আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রেম, প্রীতি ও আকর্ষণ, পূর্বসম রহমত বরিষণ সর্বগুণে অপরিবর্ণিত ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সশরীরে তাঁহার দৈহিক দরশন, তাঁহার পবিত্র নয়নে দো-নয়ন মিলন, পবিত্র কোমল দেহের সাহচর্য্যতা ও সুবাস অর্জনই শুধু বহুদূরে দুর্লভ আবরণে পড়িয়া রহিয়াছে। তাও কেবল মাত্র সাধারণ পার্থিব স্বাভাবিক মানবের জন্য। তাহার ভক্ত ও আশেকবৃন্দ সর্বদা তাহার সম্মুখে। তাহারা কেহ বা ধ্যানের ভোরে কেহ বা মোরাকেবার আসরে আবার কেহ প্রত্যক্ষ সশরীরে সর্বত্র অবিরাম অবলোকন করিয়া যথাযথ তাঁহার অনুগ্রহ লুণ্ঠন করিতেছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের স্তর ভেদে নানা প্রকার স্বপ্ন ও এল্কা যোগে তন্দ্রায় ঘুমের ঘোরে অচেতনে তাঁহার দর্শন হেরি সময়োপযোগী আদেশ-নির্দেশ অর্জনে আহলাদে নিরাপদে জীবন যাপন করিতেছেন।

ওফাতের পরে হজরতের প্রত্যক্ষ দর্শন দান

চট্টগ্রামস্থ জাহানপুর নিবাসী মুফ্‌তী বাড়ীর মৌলভী এজাহার বিল্লাহ ছাহেবের পিতা মৌলভী অছিয়ত উল্লাহ ছাহেব হজরতকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি বর্ণনা করেন, হজরত ওফাত গ্রহনের পর একদিন আমি অতি আবেগের সহিত "হজরতকে আর ইহজগতে দেখিতে পাইবনা" এই চিন্তা করিতে করিতে অতি প্রত্যুষে অজু করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের মসজিদ পুকুরের ঘাটে গেলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটি আমগাছ তলায় হজরত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার নয়ন-দৃষ্টি হজরতের প্রতি পড়িলে আমি অবাকচিত্তে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম একি ব্যাপার। হজরত তো আমাদিগকে ছাড়িয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন একি দেখিতেছি! কোথায় হইতে আবার তিনি আসিলেন? এ তো নিতান্তই অদ্ভুত কাণ্ড! অসম্ভব দৃশ্য! না জানি আমার নাকি দৃষ্টি ভুল হইতেছে। আমি বার বার ভাল করিয়া দেখিলাম। আমার সন্দেহ স্বপ্ন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। হজরত ধীরে ধীরে আমাকে নির্দেশ দিলেন! "মিঞা" এক লোটা অজুর পানি দাও তো! আমি অতি আনন্দে পানির জন্য পুকুরে অবতরণ করিলাম। এক লোটা পানি লইয়া উপরে উঠিতেই দেখি হজরত সেখানে আর নাই। তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এদিক ওদিক আগাইয়া অনেক দেখিলাম। কিন্তু হজরতের দেখা পাইলাম না। এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ আমি হারাইয়া বসিলাম, অথচ কোন আলাপও করিলাম না। আমি অতি হতাশ, দুঃখিত ও ভীত কম্পিত অবস্থায় ঘরে ফিরিলাম। আমার বিশ্বাসের কপাট সুদৃঢ় হইল যে, অলি আল্লাহ্‌গণ সশরীরে চির অমর ও বিরাজমান। তাঁহারা যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারেন।

ভক্তিপূর্ণ আবেগের প্রতিউত্তরে হরিণ দানে ভক্তবৎসলতার নিদর্শন

নানুপুর নিবাসী শ্রীমহেশ চন্দ্র বড়ুয়া একদিন সজল নয়নে বর্ণনা করেন, হজরতের দয়া অসীম। তিনি চিরকালই আমাদের প্রতি দয়াবৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। তাঁহার দয়া বর্ণনা করিতে পারিব এমন ভাষা শক্তি কি আমাদের আছে? আমাদের প্রতি যে তাঁহার অপরিসীম দয়া অবিকৃতভাবে রহিয়াছে। তাহার অলৌকিক দৃষ্টান্ত বলিতে গেলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে।

একদিন, ফাল্গুণ মাস। বেলা প্রায় চারি পাঁচটার সময় আমি, আমার খুড়া ফেঁজারাম, দাদা রামগতি বাবু, দেবী চরণ মাঝি, আরও কয়েকজন লোকসহ আমাদের মধ্যম বড়ুয়া পাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখস্থ বড় পুকুরের পাড়ে বসিয়া বিশ্রাম ও আলাপ আলোচনা করিতেছি। পুকুরের পূর্ব দিকে উত্তর দক্ষিণ মুখী একটি রাস্তা আছে দেখিতে পাইলাম, সে রাস্তা দিয়া কয়েকজন লোক একটি বড় বলিষ্ঠ হরিণ লইয়া মাইজভাণ্ডারের দিকে আসিতেছিল। তাহারা আমাদের নিকটবর্তী হইলে তাহাদের মধ্যে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ আর কত দূর আছে? এই রাস্তায় সঠিক যাওয়া যাইবে কি? আমি উত্তর করিলাম, আর বেশী দূর নয়, ঐ যে একটি খাল ও ইটার আবা দেখা যায় সেখানেই দরবার শরীফ, এই রাস্তায় সোজা চলিয়া যান। তাহারা হরিণ নিয়া রওনা হইল।

আমাদের মধ্যে ফেঁজারাম বাবু অত্যন্ত আবেগের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "হায় রে বাবাজান মৌলানা ছাহেব। আপনি দিন দিন কত নিত্য নুতন ভাল ভাল দ্রব্যাদি, পশ্বাদি আপনার ছেলে ও ভক্তদিগকে খাওয়াইতেছেন, আমরা কি আপনার ছেলে নই? কিছুই কি আমরা পাইতে পারিনা? আমাদিগকে কি কোন কিছু খাওয়াইবেন না।" আমরা অন্যান্য গল্প গুজব করিতেছি সেও আমাদের কাছে বসা আছে। এদিকে হরিণ লইয়া তাহারা বিনাজুরি খাল পার হইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হরিণ খালে অবতরণ করিতে চায়না। তাহারা সজোরে হরিণকে খালে নামাইয়া দিল, কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! হরিণটিকে আর উঠাইতে পারিল না। অথচ খালে এমত

কোন কাদা ছিল না যাতে হরিণ উঠিতে না পারে। হরিণটি স্বইচ্ছায় প্রাণ দিল। হরিণ বাহকেরা অত্যন্ত মর্মাহত ও অবাক হইয়া গেল। হজরতের হরিণ কি করিয়া বিনা কারণে মারা যায়! তাহারা কি করিবে বিচলিত হইয়া পড়িল। অবশেষে স্থির করিল, এমত মোটাতাজা হরিণ ফেলিয়া গেলে ভাল হইবে না। হজরতের হরিণ হজরতের নামে মৃত ভক্ষণকারীকে দিলে ভাল হইবে। তাহারা উপরে উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। হঠাৎ আমাদিগকে যথাস্থানে বসা দেখিয়া দুইজন লোক আমাদের প্রতি দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল। তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত মনে বলিল, "আমরা ত হরিণ নিতে পারিলাম না। হরিণটি স্বইচ্ছায় যেন প্রাণ দিয়া দিল। আপনারা কি মৃত হরিণ খান?" হরিণটি কোথা হইতে আনা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল, হাড়বাং নিবাসী এবাদুল্লা ফকির হরিণটি মাইজভাণ্ডারী হজরতের ফাতেহার জন্য পাঠাইয়াছিল।

এই সংবাদ কর্ণগোচর হইতেই আমাদের দাদা দেবী চরণ মাঝি বলিয়া উঠিল, ফেঁজারাম তুই সর্বনাশ করিয়াছিস। তিনি যে অন্তরযামী চৈতন্য, দয়ার্দ্র ও অমর। কেন তুই উহা বলিয়াছিলি? তোর কাছে কি কাণ্ড-জ্ঞান নাই? সে তাহাকে নানারূপ অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করিল। দাদা ফেঁজারাম অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। সে উত্তর দিকে দরবার মুখী সেজদায় পড়িয়া বলিতে লাগিল, বাবা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর কোনদিন এমত কথা বলিব না। আমি আপনার ওরছে এক বাণ্ডিল মোমবাতি মানস করিতেছি। নিশ্চয় উহা আদায় করিব। আমার বেয়াদবি ক্ষমা করুন। এই বলিয়া সেজদায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অতপরঃ আমরা সকলে খালের পাড়ে আসিয়া দেখিলাম মৃত হরিণটি পরিস্কার জায়গাতে শায়িত রহিয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া উপরে উঠাইয়া আনিলাম। পরে ভাগ করিয়া পাড়া প্রতিবেশী সমস্ত বড়ুয়াকে কিছু কিছু দিয়া বাকী আমাদের প্রত্যেকের ঘরে নিলাম। হজরত বর্তমানেও আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সর্বদা সহৃদয় উদার ও মুক্তহস্ত রহিয়াছেন।

মহাসাগর গর্ভে হজরতের প্রভাবে জাহাজ ডুবিতে আরোহী উদ্ধার

চট্টগ্রাম পাঠানটুলি মোহাং ইয়াছিন সওদাগরের পূত্র মোহাং সিরাজ মিঞা সারাং ছাহেব বলিয়াছেন, তিনি গত মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪২-৪৩) ইংরেজীতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধিনে "রয়েল নেভিতে" জাহাজের সারেং হিসাবে চাকুরী করিতেন। একদা জাহাজ লইয়া মহাসমুদ্রে বিচরণ করা কালে জার্মান "টর্পেডোর" আঘাতে তাহাদের জাহাজ ধ্বংস হইয়া যায় জাহাজের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়াছিল, বন্দিভাবে তাহাদিগকে জার্মানীতে নেওয়া হয়। সেখানে প্রায় ২ বৎসর কারাজীবন যাপন করার পর তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাড়ীতে তাহার মা মাইজভাণ্ডার শরীফের হজরত ছাহেব কেবলার ভক্ত ছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তাহার মাতার নিকট শুনিতে পাইলেন যে, তিনি যেই সময় জাহাজে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন ঠিক তখন তাহার মা এক রাত্রে হজরত কেবলা কাবাকে স্বপ্নে দর্শন করেন। হজরত তাহার মাতা সাহেবানীকে অভয় দিয়া বলিতেছেন "তুমি তোমার ছেলের জন্য ব্যস্ত হইওনা। আমি তাহাকে আমার বগলের মধ্যে রাখিয়াছি"। তিনি বাড়ী আসার পরদিন তাহার মাতা তাহাকে একটি খাসী ছাগল লইয়া দরবার শরীফ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর হইতে তিনিও দরবার শরীফের একজন ভক্ত হইয়া পড়েন।

হজরতের সমাধিস্থ প্রভাবে মৃগী রোগ আরোগ্য

নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত বেগমগঞ্জ থানার আমিরাবাদ নিবাসী সাব রেজিষ্ট্রার মৌলভী মুজিব আহাম্মদ এর পুত্র জনাব মৌলভী মোহাম্মদ মখলুছুর রহমান ছাহেব বর্ণনা করেন, "প্রায় ২৫ পচিশ বৎসর পূর্বে হজরত গাউছুল আযম বিল বেরাসত বাবাজান কেবলার গদীনশীন সময়ে আমার চতুর্থ সহোদর ভ্রাতা মকছুদুর রহমান মৃগী রোগে ভুগিতেছিল। একদিন সে গোসল করিবার সময় মৃগী রোগে আক্রান্ত হইয়া পুকুর জলে পড়িয়া যায়।

সকলে খবর পাইয়া অতিকষ্টে তাহাকে পানি হইতে তুলিয়া আনে। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট লোক আমার পিতা ছাহেবকে বলিলেন, "জনাব ইতিপূর্বে আমারও এইরূপ মৃগীরোগ ছিল। যেখানে সেখানে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। চিকিৎসায় হতাশ হইয়া আমি চাঁটগার গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত ছাহেব কেবলার দরবারে জেয়ারত করিতে যাইয়া রোগমুক্তি প্রার্থনা জানাই। সেখানে দুই তিন দিন থাকিবার পর বাড়ীতে চলিয়া আসি। খোদার কৃপায়, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর অনুগ্রহে আজ কয়েক বৎসর গত হয় আর কোন দিন আমার মৃগী রোগ দেখা যায় নাই। আমার বিশ্বাস হয় আপনিও আপনার ছেলেকে নিয়া তাঁহার দরবার জেয়ারত করাইলে তাঁহার দয়ায় নিশ্চই ভাল হইয়া যাইবে।"
এই সংবাদে আমার পিতা ছাহেব তখনই নিয়ত করিয়া বলিলেন, আমি তাহাকে নিয়া নিশ্চয় দরবারে যাইব। কিছুদিন পর আমার পিতা আমার ভ্রাতাকে লইয়া দরবার শরীফ জেয়ারতে আসিলেন। হজরত গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) মেহেরবানীতে আমার ভ্রাতা সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যবান হয়। সেই অবধি আর কোনদিন তাহার মৃগী রোগ দেখা যায় নাই। সে বর্তমানে কন্ট্রাকটারী ব্যবসা করে।

হজরতের ওরছ শরীফে উট বুকিং এ আশ্চর্য্য কেরামত

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত তুলাতলি নিবাসী শেখ আবদুল গফুর সাহেব হজরতের দরবারে একটি উট মানত করিয়াছিলেন। হজরতের ৪৯ ঊনপঞ্চাশতম ওরছ শরীফে উক্ত উটটি আনাইবার জন্য তিনি দরবার শরীফ হজরতের সজ্জাদানশীন এক মাত্র নাতী হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি অনেক মিনতি করিয়া তাঁহাকে উটটি আনাইয়া নিতে রাজী করেন এবং উটের খরচা বাবত প্রায় হাজার টাকা তাঁহার হাতে অর্পণ করেন। অগত্যা তিনি তাঁহার সহকারী দরবার শরীফ ষ্টোরের ক্যাশিয়ার মাষ্টার খায়রুল বশর ছাহেবকে উটের জন্য করাচী পাঠাইয়া দেন। উক্ত ক্যাশিয়ার ছাহেব

করাচীতে উট খরিদ করিয়া ভীষণ বিপদে পড়েন। কারণ কোন জাহাজ কোম্পানী উট বুকিং করিতে রাজী হয় না। এদিকে ওরছের সময়ও আগতপ্রায়। তিনি জানিতে পারিলেন, ইউনাইটেড ওরিয়েন্টাল কোম্পানীর "আনোয়ার বক্স" নামক একটি নূতন জাহাজ সবেমাত্র প্রথম বার মাল বোঝাই করিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে রওয়ানা করিবে। ইহাতে তিনি কোম্পানীর অফিসে গেলেন। তাঁহারাও উট বহন করিতে কিছুতেই রাজী হইল না। অবশেষে অনেক অনুরোধ করার পর কোম্পানী স্বয়ং রাজী হইলেন। কিন্তু কথা রহিল, যদি জাহাজের কাপ্তান রাজী থাকেন। পরদিন সকালে তিনি জাহাজের কাপ্তানের নিকট গেলেন। সেই জাহাজের কাপ্তান একজন ইংরেজ ভদ্রলোক। তিনি তাহাকে উট সম্বন্ধীয় কথা বলিতেই তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। কারণ কাপ্তান সাহেব বলিলেন যে, তিনি গত রাত্রে যখন ঘুমাইতে ছিলেন; তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে জাহাজের উপর একটি উট বাঁধা আছে। তিনি উট সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাইলেন,–উট কি জন্য, কাহার জন্য এবং কোথায় যাইবে তাহা সবিস্তারে তাহার নিকট ব্যক্ত করা হয়। তিনি ভক্তিগদগদ চিত্তে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। পরে উট যখন জাহাজে নিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া রাখা হয়, কাপ্তান সাহেব দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঠিক এই উটটিই তিনি এই জায়গাতেই, এইভাবে বন্ধন অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। কাপ্তান ছাহেবের নির্দেশে জাহাজের সমস্ত কর্মচারী এবং তিনি নিজে প্রত্যহ উট এবং উটের সঙ্গীর তদারক করিতেন। যাহাতে থাকা, খাওয়া কিংবা অন্য কোন প্রকারের অসুবিধায় পড়িতে না হয়। তাহারা অতি যত্নের সহিত উটটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাইয়া দেয়।

হজরত কর্তৃক স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হইতে নিরাপদ রাখার আভাস ও অভয়দান

চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী জনৈক রেঙ্গুন পোষ্ট অফিসের কেরানি। বক্তপুর নিবাসী মৌঃ মূফ্‌তী ফয়েজুল্লাহ্ সাহেবের বন্ধু তাহার সম্মুখে বর্ণনা দেন যে, “১৯৪১ ইংরেজী ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে জাপানী বোমা বর্ষণের পর আমরা বার্মা কামকাউটে চলিয়া যাই। আমাদের মনে নিতান্ত ভয়, কখন কি হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষে এক সন্ধ্যায় হজরতের কাছে আরজ করিয়া শুইয়াছি, তন্দ্রাযোগে দেখিতে পাই, একটি “জানাজা” অসিতেছে। আর লোকেরা বলাবলি করিতেছে, হজরত উমরের (রাঃ) জানাজা আসিতেছে। দেখিতেছি জানাজাটি আনিয়া আমাদের ঘরের সামনেই রাখা হইয়াছে। আমি কাফন খুলিয়া দেখিলাম পীর হজরত ছৈয়দ আহাম্মদ পেশোয়ারী ছাহেবই রয়েছেন কাফন পরা জানাজায়। তাঁর মুর্দাটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘আবিহ্ যো চট্‌গাম মে বোম্বারী হোঁয়া হ্যায়, উহ রওজা শরীফ ছে কেত্না দূর হ্যায়!’ যেন তিনি ইঙ্গিত দিয়া মাইজভাণ্ডার হজরতের রওজা শরীফের কথা বলিলেন বলিয়া বুঝা গেল। আমি কত মাইল বলিলাম, এখন তাহা আমার স্মরণ হইতেছেনা।

ইহাতে আভাস পাওয়া গেল চট্টগ্রাম বোমা বর্ষণ হইলেও চট্টগ্রাম হজরতের রওজা শরীফের তোফাইলে চট্টগ্রাম সহরের কোন ক্ষতি করিতে পরিবে না।

চট্টগ্রাম কোর্টের Public Prosecutor জনাব বদরুল হক খান সাহেব বর্ণনা করেন যে ১৯৪২ ইংরেজী ২৩শে ডিসেম্বর হঠাৎ চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের ফলে সহর হইতে লোকজন প্রায় চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি করি? উপায় নাই। সরকারী কোর্টের কাজ ছাড়িয়া কোনদিকে যাইতে পারিতেছি না। সহরে থাকিতে বাধ্য। সর্বদা হজরতের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতেছি। এক সন্ধ্যায় হজরতের কাছে মিনতি করিয়া শুইয়াছি; তন্দ্রায় দেখিতে পাইলাম, হজরত কোট-প্যান্ট পরিয়া ইউরোপীয়ানের পোষাকে আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিতেছেন,

মিয়া! খওফ নেহী হ্যায়। দোষমন কো-সমন্দর কে তরফ ভাগা দিয়া, কুছ খওফ নেহী হ্যায়।”

তখন থেকে আমি আশ্বস্ত হইয়া সাহস পাইলাম যে, হজরতের সুনজরে খোদায় আমাকে বিপদমুক্ত রাখিবেন। আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম যে, এই যুদ্ধে হজরত ইউরোপীয়ানকে সাহায্য করিতেছেন। নইলে তাহাদের পোষাকে হজরতকে দেখিতাম না। নিশ্চয় ইংরেজ যুদ্ধে জয় লাভ করিবে। এই আশাতে নির্ভয়ে সহরে রহিয়া গেলাম। ইংরেজ যুদ্ধে জয়লাভ করিল। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদে রহিলাম।

হজরতের কালাম ও ক’বা মারফত প্রভাব বিস্তারে বিস্ময়কর কেরামত

হজরত আকদছ (কঃ) এর পৌত্র মৌলানা শাহ্ সুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেবের দ্বিতীয় কন্যা শাহজাদী মুনিরা খাতুন এক সময় ভীষণভাবে অতিশার জনিত টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। অনেক চিকিৎসায়ও বিফলে সকলের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। তাঁহার পিতা-মাতা জীবনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এমন সময় এক রাত্রে মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন ছাহেব কন্যার এই দুরারোগ্য অসুখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তিনি সাধারণ তন্দ্রায় দেখিতে পাইলেন, হজরত কেবলা ছাহেব তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভয় দানে বলিতেছেন, “আমার হরিরী রঙ্গের ক’বা খানা তাঁহার বদনে ঢালিয়া দাও, ভাল হইয়া যাইবে।” ইহা দর্শনে হঠাৎ তিনি জাগিয়া বসিলেন এবং রওজা শরীফে আসিয়া তাঁহার পবিত্র ক’বা খানা তালাস করিয়া নিলেন। উহা তাঁহার গায়ের উপর চাপাইয়া দিলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পর দেখিতে পাইলেন, তাঁহার শরীরের ভীষণ উত্তাপ ঘর্ম দিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। আর তাহার কন্যা ছাহেবা প্রায় শান্তভাবে কাতর অবস্থায় ঘুমাইতেছেন। ইহা দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ আসিল। তারপর দিন হইতে দেখা গেল তিনি আরোগ্যের পথে। তিনি কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

তাঁহার বড় সন্তান শাহ্ ছৈয়দ মৌলভী জিয়াউল হক ছাহেব বর্তমানে যিনি আধ্যাত্মিক প্রেরণায় বিভোর আছেন, বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় তিনি হজরত বাবাজান কেবলা কাবার আধ্যাত্মিক সুনজরে পড়েন। প্রেরণাধিক্যে ক্রমান্বয়ে তিনি আহার নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ পান। কিছু দিনের মধ্যে যেন তিনি উন্মাদের মত হইয়া গেলেন। উহা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ মনে করিয়া–অনেক প্রকার চিকিৎসা করা হইল। কোন প্রকার পরিবর্তন না দেখিয়া সকলই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তাঁহার প্রেরণা আরও বাড়িতে লাগিল। একদিন এমতঅবস্থা হইয়া গেল যে, তাঁহার মাথার উপর অনেক পানি ঢালার পরও শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিল না। ইহাতে তাঁহার পিতা ছাহেব বিশেষভাবে চিন্তাশীল হইয়া পড়িলেন। বড় সন্তানের এরূপ অবস্থা অথচ কোন ঔষধ খুঁজে পাইতেছেন না। এক রাত্রে তিনি চিন্তিত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, হজরত কেবলা ছাহেব তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বলিতেছেন, "আপনি উদগ্রীব হইয়াছেন কেন? আমার ক'বা অর্থাৎ জুব্বাটী তাঁহার গায়ে পরাইয়া দিন।" তিনি তাড়াতাড়ী আসিয়া হজরতের স্মৃতি কামড়া হইতে ক'বাটী তালাস করিয়া নিলেন এবং ক'বাটী তাঁহার গায়ে পরাইয়া দিয়া তিনি আপন হুজুরায় বিশ্রাম করিতে আসিলেন। তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমতাবস্থায় তাঁহার উক্ত সন্তান আসিয়া তাঁহার হুজরায় দরজা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি উঠিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনিও তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার এমন নিদ্রা আসিল যে, সারা রাত্র গত হইয়া পরদিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাইয়া রহিলেন। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার অবস্থা প্রায় শান্ত। তাঁহাকে স্নান ও আহারান্তে পুনঃ বিশ্রাম করিতে দিলেন। এইবারও তিনি সারারাত ও পরদিনের প্রায় ৯টা পর্যন্ত ঘুমে বিভোর হইয়া রহিলেন। সেই দিন হইতে দেখা গেল; তিনি সম্পূর্ণ ভাল ও শান্ত। কিছুদিনের পর পুনঃ তাঁহার প্রেরণাধিক্য দেখা দিল। তাঁহার পিতা ছাহেব বিশেষ চিন্তিত হইয়া গেলেন। দেখিতে পাইলেন, জনাব মৌলানা নুরুচ্ছফা নামক হজরতের এক প্রিয়তম

ছাহেবে কশ্ফ খলিফা দরবার শরীফে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! গত রাত্রে হজরত আকদছ আমাকে দেখা দিয়া নির্দেশ দিলেন, মিঞা! আপনি আমার মিঞাকে বলুন তিনি পেরেশান কেন? আমি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিতেছি। আপনি তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, জিয়াউল হক আমিই।" ইহা দর্শনে আমি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নির্দেশ পালনে আপনার খেদমতে আসিয়াছি। এই ঘটনার পর তাহারা প্রত্যেকে দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা আধ্যাত্মিক প্রেরণাধিক্য মাত্র।

দরবার শরীফে নবাগত ব্যক্তির প্রতি অপূর্ব দর্শনদানের কেরামত

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত "সোয়াদ" নামক স্থানে এক ব্যক্তি হজ্ব করিয়া নবী করিম (দঃ) জেয়ারতান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমতাবস্থায় স্বপ্নযোগে নির্দেশিত হইলেন, "তুমি 'মশরেকী মূলকে' বা পূর্বের দেশে ভ্রমন কর। ইহাতে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, তথায় আমার দর্শন পাইবে।" এই নির্দেশে তিনি পূর্বাঞ্চল ভ্রমন করিতে করিতে বাংলা দেশে আসিয়া পড়েন এবং বিভিন্ন আওলিয়াদের মাজারাদি জেয়ারত করিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। কোন মাজারে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় অবশেষে মহান আওলিয়ার সন্ধান নিয়া তিনি একদিন মাইজভাণ্ডার শরীফ আসিয়া উপস্থিত হন। তখন মাইজভাণ্ডার শরীফে ময়দানের উত্তর পার্শ্বে হজরতের নামীয় একখানা জুনিয়ার মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসার একটি কামরায় শিক্ষকগণ থাকিতেন। তিনি হজরত আকদছের জেয়ারত শরীফ সমাপনান্তে উক্ত কামরায় বসিয়া জনাব মৌলানা আবদুছ ছালাম ছাহেবের সঙ্গে হজরতের পরিচয় সম্বন্ধে আলাপ করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় মৌলানা আবদুছ ছালাম ছাহেব বলেন, "আমি বাংলা ভাষায় হজরতের একখানা পরিচয় গ্রন্থ লিখিয়াছি। তাহা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবেননা। ইহাতে আপনি হজরতের পরিচয় পাইতেন।" এই কথা শ্রবণ মাত্রই তাঁহার হৃদয়ে হতাশ ভাবাপন্ন আবেগের সঞ্চার হয়। দেখিতে দেখিতে তিনি নৃত্যমান

অবস্থায় অজদ করিতে করিতে বেখোদ ও বিভোর হইয়া পড়েন। পরে শান্তি লাভ করিলে তিনি বলিতে থাকেন "ইছকা নাম হ্যায় দেখ্না, ইছকা নাম হ্যায় ছুন্না। উপস্থিত সকল তখন বুঝিতে পারিলেন হজরত তাঁহাকে দর্শন দানে ফয়েজ এনায়ত করিয়াছেন। তিনি নিতান্তই সৌভাগ্যশালী উপযুক্ত লোক বটে। কিছুক্ষণ পর বিদায় গ্রহণান্তে তিনি চলিয়া গেলেন।

হজরত কর্তৃক পূর্ব হইতে ঠিক সময়মত সওগাত প্রেরণ ও অতিথি সেবা

একদিন হজরত আকদাছের জেয়ারত উপলক্ষে অনেক রাত্রে প্রায় চৌদ্দ জন দূরদেশী মেহমান আসিয়া পড়ে। তখন হজরত আকদছের ঘরে সমস্ত লোকজনের পানাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরে অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী সংগৃহীত নাই। খাদেম আবদুল মালেক ঘরে গিয়া দেখিলেন, কোন ব্যবস্থা হয় কিনা? রাত্রি অনেক, কোন কিছু মওজুদ না দেখিয়া তাঁহারা একপ্রকার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এতগুলি লোক উপবাসও কি করিয়া থাকিবে? তিনি তাহাদিগকে যথারীতি বসিতে দিয়া পান-তামাকের ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত খাদেম চিন্তিত অবস্থায় বসিয়াছেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন–রাঙ্গুনীয়া থানা নিবাসী দুইজন লোক এক আড়ি চিকন চাউলের ভাত ও একটি খাসির মাংস, কুমড়াসহ পাক করিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। খাদেম তাহাদিগকেও অতি যত্নে বসিতে দিলেন এবং আনীত খাদ্য সামগ্রী পরিতৃপ্তির সহিত সকলকে খাওয়াইয়া দিলেন। অবশিষ্টাংশ ভাণ্ডার খানায় সযত্নে রাখিয়া দিলেন। পরে আলাপ প্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন হজরত কে স্বপ্নযোগে চালের কদু দিয়া খাসীর মাংস ও এক আড়ি চিকন চাউলের ভাত দুইদিন পূর্বে তাহার কাছে চাহিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়া রহিল। এমতভাবে হজরত এখনও যথাসময়ে অতিথি সেবায় রত রহিয়াছেন দেখা যায়।

হজরতের প্রভাব ও গাউছিয়ত ক্ষমতার পরিচয়
স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, ছৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
আজিম নগরী ছাহেবের বর্ণনা

তিনি বলেন– তিনি যখন নবম শ্রেণীতে পড়িতেন হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে আসিল, পীরানে পীর দস্তগীর হজরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) গাউছুল আযম বলিয়া শুনিয়াছি। আবার লোকে মাইজভাণ্ডারী হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদুল্লাহ্ (কঃ) ছাহেবকেও গাউছুল আযম বলে কেন? তাঁহার মনে সদাই এই প্রশ্ন জাগিতে লাগিল। দিন দিন উহা বাড়িয়া চলিল। কিন্তু কোন প্রকারে উহার মীমাংসা খুঁজিয়া পাইতেছেননা। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান, তিনি বাবাজান কেবলার নূতন বাড়ীর উত্তর পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছেন। সেই সময় দালানের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত একটি ইটার পাঁজা ছিল। সেই বরাবরে উপস্থিত হইতে প্রায় তিন হাত লম্বা একটি প্রকাণ্ড বাঘ কোথায় হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে আক্রমন করিতে উদ্যত হইল। এহেন সঙ্কটময় অবস্থায় তিনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী! আমায় রক্ষা করুন।" ইহা বলার সাথে সাথে দেখিতে পাইলেন, হজরতের রওজা মোবারকের উত্তর পার্শ্বস্থ জানালাটি ফাঁক হইয়া গেল এবং দেখা গেল রওজা শরীফের মশারী তরতর করিয়া কাঁপিতেছে আর রওজা শরীফ হইতে আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতেছে "খবরদার!" তখন দেখিলেন ব্যাঘ্রটি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ব্যস্তভাবে জবান খুলিয়া বলিতেছে, "কার নাম শুনিলাম!" ইহা বলিয়াই ব্যাঘ্রটি তাঁহার সম্মুখে রাস্তার উপর ধরাশায়ী হইয়া পড়িল এবং তাঁহার নিকট কাতর মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা জানাইল। তদ্দর্শনে তাঁহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল তিনি বসিয়া পড়িলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সত্যই গাউছুল আজম। সেই দিন হইতেই হজরতের গাউছিয়তের উপর তাহার পূর্ণ আস্থা জন্মিল।

হজরতের প্রভাবে আয়ুবৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ

আজিমনগর নিবাসী মৌলভী মাহমুদুল হক ই পি সি এস ছাহেব বর্ণনা করেন– আমি খুলনা জেলা সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে কাজ করার সময় একদিন কালেক্টর সাহেব সহ আমার প্রোগ্রাম হয়। পূর্ব রাত্রে আমার উপর এক অদ্ভুত স্বপ্ন হয়। আমি দেখিতে পাইলাম, হজরত বাবাজান কেবলা মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) আমাকে একখানা আয়ু চার্ট দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ তোমার আয়ুকাল এই খানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তুমি নিজেই হিসাব করিয়া দেখ। "তখন আমি নিজেও হিসাব করিয়া দেখিলাম, ঠিকই উহার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে বটে। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, একখানা গাড়ী কোন দিক হইতে আসিয়া দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। এতদ্দর্শনে আমার দেহমন যেন একেবারে নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, হযরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) সেখানে উপস্থিত। তিনি হযরত বাবাজান কেবলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "কি হইয়াছে?" এই বলিয়া তিনি চার্টখানা বাবাজান কেবলা হইতে নিজ হাতে নিলেন। বাবাজান কেবলা চার্টের প্রতি নির্দেশ করিয়া হজরত ছাহেবকে বলিলেন, "তাহার আয়ুকাল এইখানেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

হজরত আকদাছ চার্ট দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ ঠিকই ত।" তখন আমি করজোড়ে চার্টে আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলাম এবং বলিলাম, "হুজুর এইরূপ হইলে কেমন হইবে।" হজরত আকদাছ আমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "হাঁ ঠিকই তো। তারপর বাবাজান কেবলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "ঠিক করিয়া দিলেইত হয়, কিন্তু বাবাজান কেবলা নীরব রহিলেন। আমি হজরতের নিকট বার বার মিনতি করিতে রহিলাম। এমন অবস্থায় আমার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সজাগ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার মৃত্যু অনিবার্য। না হইলে এই স্বপ্ন দেখিতামনা।" সকালে ট্যুরে রওয়ানা হইবার পূর্বে আমার কাছে যাহা ছিল প্রায় শ' দুইয়েক টাকা

আমার স্ত্রী ছাহেবার হাতে দিয়া বলিলাম, আমি অদ্য মাননীয় কালেক্টর ছাহেবের সঙ্গে ট্যুরে যাইতেছি।
খোদা না করুন যদি কোন দুর্ঘটনা হয় আপনি এই টাকাগুলি লইয়া আমার নিজ বাড়ীতে চলিয়া যাইবেন।" এই ব্যবহারে আমার স্ত্রী ছাহেবা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? আমি তাহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলাম, এতদশ্রবণে তিনি আমাকে ট্যুরে না যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, "অদৃষ্টের লিখা অখণ্ডনীয়। যাহা হওয়ার আছে, ঘরে বাহিরের প্রশ্ন নাই। যেইখানেই থাকি হইবেই। বিশেষ করিয়া কালেক্টর ছাহেবের কাছে ওয়াদা দিয়া নিজেই প্রোগ্রাম করিয়াছি। আমাকে যাইতেই হইবে। তদুপরি স্বপ্নেও দেখিয়াছি, আমি আর তিনি একই গাড়ীতে আছি।"
বর্তমানে এক কাজ করিব, দুইজন দুই গাড়ীতে যাইব ধারণা করিয়াছি। যাহাতে আমার দুর্ভাগ্য তাহাকে স্পর্শ না করে। আমি বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দুইজনে দুই গাড়ী লইয়া ট্যুরে যাত্রা করিলাম। ফিরিবার পথে একখানা গাড়ী বেকার হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া কালেক্টর ছাহেবের সঙ্গে একগাড়ীতেই বসিলাম। চলার পথে আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত সাহেবকে বলিলাম। আল্লাহ্‌র নাম স্মরণে পথ অতিক্রম করিতেছি। গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার কিছু পূর্বেই দেখিলাম একখানা ট্রাক দ্রুত আসিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের গাড়ীর হর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। দেখিতে না দেখিতে ট্রাকখানা বিদ্যুৎ বেগে আসিয়া আমাদের গাড়ীর এক পার্শ্বে আঘাত (একসিডেন্ট) করিয়া গেল। সৌভাগ্য এই যে আমাদের গাড়ীখানার একপার্শ্ব নষ্ট হইয়া গেলেও আমরা উভয়ে কোন প্রকারে জীবনে বাঁচিয়া গেলাম। কালেক্টর সাহেব ট্রাকখানার নম্বর টুকিতেই আমি তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলাম, "ইহা দৈব দুর্ঘটনা। আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতেই শোকর। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়া উচিত হইবেনা।" মনে মনে ভাবিলাম ইহা হজরত ছাহেব কেবলার (কঃ) তাছার্‌রোফ! তখন মন শ্রদ্ধাপ্লুত হইল এবং ভক্তির সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিলাম।

মাজার শরীফ জেয়ারতে নবী করিম (দঃ) এর রওজা মোবারকের সাদৃশ্য-মাহাত্ম্য

চট্টগ্রাম মির্জাপুর, ছাদেক নগর নিবাসী জনাব আহম্মদ উল্লাহ্ চৌধুরী ছাহেবের পুত্র জনাব হাজী ওয়াশীল মিঞা চৌধুরী ছাহেব একদিন হজরত আকদছ (কঃ) এর রওজা শরীফ জেয়ারত করার পর হজরত আকদছের খাদেম মৌলানা হাফেজ কারী হাকিম তফাজ্জল হোছাইন ছাহেবের নিকট বর্ণনা করেন যে, "হজরত আকদছের রওজা শরীফ জেয়ারত করিয়া যেই খোশব পাইলাম, উহা অবিকল নবী করিম (দঃ) এর পবিত্র রওজা মোবারকের খোশবই। আমি খোদার ফজলে দুইবার নবী করিম (দঃ) এর রওজা জেয়ারত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। তাঁহার পবিত্র রওজার শান্তিময় খোশব আর কোথাও পাই নাই। হজরতের পবিত্র রওজা শরীফ জেয়ারতে আজ তাহা পাইলাম।"

দারুল উলুম মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব মোদার্রেছ মৌলানা নজির আহমদ ছাহেবের অভিমত

সাতকানিয়া নিবাসী মৌলানা আবদুচ্ছালাম ছাহেব বর্ণনা করেন যে, "আমি দারুল উলুম মাদ্রাসার মোদার্রেছ জনাব মৌলানা নজির আহমদ ছাহেবের ছাত্র। উক্ত মাদ্রাসায় পড়া কালে একদিন মাইজভাণ্ডার শরীফের ভক্ত ও মুরিদদের আচরণ ও কার্যকলাপ দেখিয়া আমার বিশেষভাবে সন্দেহ হইল। ইহাতে আমি তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সমালোচনা করিলাম। জনাব মৌলানা নজির আহমদ ছাহেব আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার কাছে আস" আমি তাঁহার নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মাইজভাণ্ডারী তরিকা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছ? আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম "হাঁ হুজুর, বলিয়াছি।" তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, "মিঞা! কান পাকড়ো। তওবা কর! আর কখনও বলিবেনা বলিয়া শপথ কর!" আমি আদেশ পালনে তওবা করিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর

জীবনে কোনদিন মাইজভাণ্ডারের বিরুদ্ধে এইরূপ সমালোচনা করিবনা। পরে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিয়াছিলে"? আমি উত্তরে বলিলাম, "হুজুর! যাহা বলিয়াছি ঠিকই বলিয়াছি, মিথ্যা বলি নাই। তবে আর বলিব না। হুজুর আমাকে অতি আদরের সহিত একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "উহা একটি দরিয়া সদৃশ। দরিয়াতে কি না থাকে? কিন্তু দরিয়ার পানি কি কখনও অপবিত্র হয়? বরং সর্বপ্রকার অপবিত্রতা দরিয়ার নোনা জলে মিশিয়া পবিত্র হইয়া যায়। আদব করিও! আর এইরূপ কখনও কিছু বলিও না।" আমি বাড়ীতে যাওয়ার পর একদিন আমার পিতা মৌলানা ছাহেবকে হজরত মৌলানা ছৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ (কঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষঃস্থল ভিজাইয়া ফেলিলেন। অতপর মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে কয়েকটি পরিচয় আলাপ করিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, হুঁশিয়ার! তাঁহার ভক্ত অনুরক্তদের সম্বন্ধে কোনরূপ আলাপ করিও না। ইহা তুমি এখনও বুঝিতে পারিবে না। আর যদি বলিয়া থাক চিরকালের জন্য তওবা করিয়া ফেল। তখন আমি বাবাকে মাদ্রাসার ঘটনাটি বলিলাম। তখন বাবার কাছেও আবার তওবা করিলাম। বাবা বলিলেন, "মাইজভাণ্ডারী (কঃ) অতুলনীয় অলি আল্লাহ্! কোন আউলিয়ার সঙ্গে তাঁহার তুলনাও করিও না।" সেইদিন হইতে মাইজভাণ্ডারকে ভক্তি করিতাম ও কোন প্রকার সমালোচনা করিতাম না। পরে মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে আরও পরিচয় পাইয়া আসা-যাওয়া করিতেছি।

হজরতের প্রতি দেওবন্দী মৌলানা অলি আহমদ নেজামপুরী ছাহেবের অভিমত

জনাব মৌলানা অলি আহমদ নেজামপুরী একজন দেওবন্দ পাশ সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও কামেল পীরে তরিকত ছিলেন। তিনি হজরত গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর উপর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতেন। কিন্তু গান বাজনা বা সেজদায়ে তাহীয়া, সরাসরি জায়েজ রাখিতেন না।

তাঁহার এক ভক্ত শেখ মোছলেহ উদ্দিন চট্টগ্রামস্থ ৫২ নং নালা পাড়ায় বাস করেন। ১৯৫১ সালে মাঘ মাস মাইজভাণ্ডার শরীফ হজরতের ওরছ ও ওরছ

কালীন রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে মরহুম মৌলানা অলি আহাম্মদ ছাহেব বলেন– “মাটির উপর নাচ গান করিলে কি হইবে? মাটির নীচে উত্তম জিনিষই আছে। হযরত মৌলানা শাহ্ ছুফী আহম্মদ উল্লাহ্ (কঃ) চট্টগ্রামের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বুজর্গ ও আলেম ছিলেন। তিনি কঠিন শরিয়ত পন্থী (শরীয়তের মূল-রহস্য অনুসারী) ছিলেন। তাঁহার এন্তেকালের পর মাজার শরীফে কি হইতেছে উহার জন্য তিনি দায়ী নহেন।”

বর্ণনাকারী
শেখ মোছলেহ উদ্দিন
৫২ নং নালা পাড়া
চট্টগ্রাম।

শ্রেষ্ঠ কেরামত

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কাদেরী (কঃ) পার্থিব জগতে থাকাকালীন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও উরুজে-রুহানীর প্রভাবে অসংখ্য অলৌকিক কেরামতাদির দ্বারা ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

তাঁহার নশ্বর দেহ-ত্যাগের পরও দেখা যায় তাঁহার অবিনশ্বর মহাশক্তিশালী রুহানী শক্তির প্রভাবে পূর্ববৎ অন্তর্যামী ফকীর রূপে ভক্ত অনুসন্ধিৎসু জনমনের না হওয়ার এবং না পাওয়ার মত দুর্লভ কাম্য বস্তুকে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা মূলে সুলভে পাওয়ার এবং হওয়ার রূপদানে যত্নবান আছেন। পবিত্র হাদিছের বাণী মতে–

تموتـــون كما تعيشـــون وتبعثـــون كما تموتـــون

অর্থ– তোমরা যেইরূপ জীবন যাপন করিবে, তদ্রুপ তোমাদের মৃত্যু হইবে। এবং যেইরূপ মৃত্যু হইবে সেইরূপ তোমাদের হাশরও হইবে।

তিনি ওফাতের পরও সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন এবং জনমনের হাজতমখছাদ পুরা করিতেছেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বার্ষিক ওরছ শরীফের দৃশ্য

প্রতি বৎসর ১০ই মাঘ এই মহান বিশ্বঅলি মহামানব কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আজম বিল আছালত জনাব হজরত মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ (কঃ) এর এই নশ্বর পৃথিবী হইতে ওফাত হইয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নূরীজাতে শুভ-মিলন দিবসে লক্ষ লক্ষ লোকের সমবায়ে এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী বা ওরছ শরীফ। জন সমাগমে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মেলন সমূহের মধ্যে পঞ্চম।

বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্ত ও জায়েরিনগণ পবিত্র মাজার পার্শ্বে শ্রদ্ধাবনত ভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী স্বাধীন ও প্রথানুসারে প্রত্যেকের ধর্ম্ম-কর্মে রত থাকেন। কেউ কাহাকে বাধা দেয় না। বিপুল জন সমাবেশের স্থানে স্থানে ও মাজার প্রাঙ্গনে বিভিন্ন তাঁবু ও সামিয়ানার তলে নানা প্রকার ধর্মীয় গজল নাতিয়ামূলক প্রেমগীতি আল্লাহ্, রছুল ও তাঁহার শানে বাদ্যের তালে তালে গাহিয়া জিকির ও অজদ করিতে থাকে।

নামাযের সময় বিভিন্ন তাঁবু ও সামিয়ানার তলে মসজিদ ও এবাদাত গাহে উপাসনা-রত কাতার-বন্দীর এক অপূর্বময় আকর্ষণীয় দৃশ্যের অবতারণা করে।

এই প্রেম-পাগল মেলায় "ছালাতে দায়েমী" রত প্রেমিকদের করুণ কান্না গীতি, বাদ্য ধ্বনি ও জিকির এবাদাতের অভিনব অবস্থা দর্শনে হাশর ময়দানের দ্বিতীয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ব সম্মেলনে আগত জন-

সমুদ্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন বনিক সওদাগর নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া দোকান সাজাইয়া আংশিক সেবায় সানন্দে ব্যবসা করিয়া মহান অলি আল্লার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে থাকে।

হজরতের উত্তরাধিকারী ওয়ারেছ-কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় এই মহা সম্মেলনের যাবতীয় কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শত শত সেবকদল আগত ভক্ত জায়েরিনদের সেবায় রত থাকিয়া হজরত আকদাছের ফয়েজ রহমত ও সন্তুষ্টির ভরসায় নিজ দেহ-মনকে নিয়োজিত করিয়া সেবা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেন।

তবার্‌রোক বিতরণ

রাত বারোটার পর, সমস্ত বাদ্যজনিত ছেমা-জিকির বন্ধ করিয়া মিলাদে নবী ও হজরত আকদাছের তাওয়াল্লাদ শরীফ পাঠান্তে ফাতেহা খানী সমাধা করা হয়। অতঃপর সেবকদল ক্যাম্পে ক্যাম্পে শৃঙ্খলার সহিত তবার্‌রোক পৌঁছাইতে থাকেন। এবং জেয়াফত পদ্ধতিতে জায়েরিন ও পর্যটকদিগকে আহারীয় সামগ্রী বিতরণ করেন।

১৩ই মাঘ দিবাগত রাত্রে বিপুল আয়োজনে তাঁহার চাহরম শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতি বাঙলা মাসের দশ তারিখ হজরতের মাসিক ফাতেহা কার্য্য সমাধা করা হয় এবং জেলকদ চাঁদের ২৭ তারিখে কমরী ওরছ শরীফ প্রতিপালিত হয়। এই সমস্ত দিবসে অসংখ্য লোক হজরতের দরবারে হাজির হইয়া সেবা কার্য্যে শরীক হন। ইহা ছাড়া প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা হইতে দেশী-বিদেশী, দূরাগত ভক্তজন হজরতের রওজা মোবারকে আসিয়া জেয়ারত ও ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন।

হযরত আকদছের তরিকত পরিচয়

সজরায়ে আহম্মদীয়া কাদেরীয়া গাউছিয়া

“বিছমিল্লাহির রাহমানির রহীম”

আল্লাহুম্মা ছল্লেআলা ছৈয়দনা মৌলানা মোহাম্মদিন ও আলেহি ওয়াছাহাবেহি ওআলে এর্শাদেহি গাউছুল আজম মহিউদ্দিন ছৈয়দ আবদুল কাদের ওয়া গাউছুল আজম ছৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ মায়দনিজ্জোদে ওয়াল করম। ওয়ালেহি ওয়াছাহাবেহি ওয়া জমিয়ে খোলাফায়ে তরিকতেহি ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লেম।

(১) এলাহী বহুরমতে রহমতুললীল আলমীন রাহতুল আশেকীন মুরাদুল মোশতাকীন শফিউল মজনাবিন খাতেমুন্নবীঈন ছৈয়দুল আম্বিয়া ওয়া আউলিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোজতবা ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ওআলা আলেহি ওয়া আছহাবেহি ও আহলে বায়তেহি ওছল্লেমা তছলিমান কাছিরান।।

(২) এলাহী বহুরমতে আছাদিল্লাহিল গালেব আমিরুল মোমেনীন আলী ইবনে আবী তালেব (কঃ)

(৩) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুস্‌শোহাদা হযরত এমাম হোছাইন (রাঃ)

(৪) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুছ্‌ছালেকীন হযরত ছৈয়দ জয়নাল আবেদীন (রাঃ)

(৫) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল ওয়াছেলীন হযরত এমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ)

(৬) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল কামেলীন হযরত এমাম জাফর ছাদেক (রাঃ)

(৭) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল আলম হযরত এমাম মুছা কাজেম (রাঃ)

(৮) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুছ্ ছাকলাইন হযরত এমাম আলী ইবনে মুছা রেজা (রাঃ)

(৯) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল ওয়াছেলীন হযরত শেখ মারুফ কুরখী (কঃ)

(১০) এলাহী বহুরমতে ছোলতানুল মাহবুবীন হযরত ছের্রে ছক্তী (কঃ)

(১১) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল আছফীয়া হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (কঃ)

(১২) এলাহী বহুরমতে ছোলতানুল আউলিয়া হযরত আবুবকর শিবলী (কঃ)

(১৩) এলাহী বহুরমতে মাহবুবছ্ ছালেকীন হযরত শেখ আবদুল আজিজ তমিমী (কঃ)

(১৪) এলাহী বহুরমতে এমামুল কামেলীন হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তমিমী (কঃ)

(১৫) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল আউলিয়া হযরত মৌলানা আবুল ফরহা ইউছুপ তরতুছী (কঃ)

(১৬) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দু-চ্ছাকলাইন হযরত মৌলানা আবুল হাছান কোরাইশী (কঃ)

(১৭) এলাহী বহুরমতে শেখুশ্ শুয়ুখ্ হযরত আবুছায়িদ মখজুমী (কঃ)

(১৮) এলাহী বহুরমতে কুতুবুল আলম গাউছুল আজম হযরত ছৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)

(১৯) এলাহী বহুরমতে সোলতানুল আরেফীন হজরত শাহাবুদ্দিন ছরওয়ার্দি (কঃ)

(২০) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল আরেফীন হজরত নেজামুদ্দিন গজনবী (কঃ)

(২১) এলাহী বহুরমতে হযরত ছুফিউল আছফীয়া ছৈয়দ মোবারক গজনবী (কঃ)

(২২) এলাহী বহুরমতে হাদীউল আশেকীন হযরত ছুফী নজমুদ্দিন গজনবী (কঃ)

(২৩) এলাহী বহুরমতে সোলতানুল মাহবুবীন হযরত ছুফী কুতুবুদ্দিন রওশন জমির (কঃ)

(২৪) এলাহী বহুরমতে হাদী এলাল্লাহ হযরত ছুফী ফজলুল্লাহ (কঃ)

(২৫) এলাহী বহুরমতে জোবদাতুল কামেলীন হযরত ছৈয়দ মাহমুদ (কঃ)

(২৬) এলাহী বহুরমতে সোলতানুল মোকাররেবিন হযরত নছিরুদ্দিন (কঃ)

(২৭) এলাহী বহুরমতে এমামুল মোশায়েখ হযরত ছুফী তফিউদ্দিন (কঃ)
(২৮) এলাহী বহুরমতে মকছুদুত্তালেবীন হযরত ছুফী নেজামুদ্দিন (কঃ)
(২৯) এলাহী বহুরমতে ছৈয়দুল আরেফীন হযরত ছৈয়দ আহালুল্লাহ (কঃ)
(৩০) কোদওয়াতুচ্ছালেকীন হযরত ছৈয়দ জাফর হোছাইনী (কঃ)
(৩১) এলাহী বহুরমতে মতলুবুত্তালেবীন হযরত ছুফি খলিলুদ্দিন (কঃ)
(৩২) এলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব হযরত মৌলানা মোহাম্মদ মোনায়েম (কঃ)
(৩৩) এলাহী বহুরমতে এমাম হাইউল কায়েম হযরত ছুফী মোহাম্মদ দায়েম (কঃ)
(৩৪) এলাহি বহুরমতে মোতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ হযরত ছুফী আহম্মদ উল্লাহ্ (কঃ)
(৩৫) এলাহী বহুরমতে হাদী এলাল্লাহ হযরত হাজী ছুফী লকিয়ত উল্লাহ্ (কঃ)
(৩৬) এলাহী বহুরমতে হাজীউল হারমাইন গাউছে জমান হযরত ছুফী ছৈয়দ মোহাম্মদ ছালেহ লাহোরী (কঃ)
(৩৭) এলাহী বহুরমতে কুতবুল আফখম গাউছুল আযম সোলতানুল আরেফীন রুহুল আশেকীন মুরাদুল মোশতাকীন খাতেমুল আউলিয়া হযরত মৌলানা ছৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ (কঃ) খোদাওন্দা বহককে হাজেহিল আছমা, পুরাকর মেরে দিলকী আরমা।

পরিশিষ্টাংশ

প্রকাশকের বিবৃতি

আজ আমার সংগৃহীত নোটমূলে জনাব মৌলানা ফয়েজ উল্লাহ্ ভূইয়া নিজামপুরী গোল্ডমেডালিষ্ট ছাহেব কর্তৃক লিখিত "গাউছে আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর "জীবনী ও কেরামত" নামক গ্রন্থখানী দর্শনে সন্তুষ্ট হলাম। যাহার সত্যতা ও সততা সম্বন্ধে আমার আস্থা আছে।

মৌলানা ছৈয়দ আবদুচ্ছালাম ইছাপুরী ছাহেব রচিত "হজরত সাহা মাইজ ভাণ্ডারী" নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অসম্পন্ন অবস্থাতে ছাপানো হইয়াছিল। তাহাও আবার "আয়নায়ে বারীর" অনুকরণে মছায়েলা মছায়েল বহুল বলিয়া জীবনী সারল্য হারা ছিল। বর্তমান হজরত কেবলার জীবনীটি সেই দিক দিয়াও পছন্দসই।

উক্ত মৌলানা ইছাপুরী ছাহেব লিখিত "হজরত গাউছল আজম মওলানা আল ছৈয়দ গোলাম রহমান আল হাছানী আল মাইজ ভাণ্ডারী বাবাজান কেবলা কাবার (কঃ) জীবন চরিত" নামক গ্রন্থখানী পাঠে, দেখিতে পাইলাম; হজরত কেবলা সাহছুফী ছৈয়দ গাউছুল আজম আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর নাম উল্লেখে তিন চারিটী রেওয়ায়েত মারাত্মক ভুল পরিকল্পিত এবং অপবাদ মূলকভাবে সন্নিবেশিত আছে।

যেমন–উক্ত জীবন চরিতের ২২ পৃষ্ঠায় ৭ লাইনে লেখা আছে, "আমার সমস্ত বাগান খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও একটি গোলাপ ফুল খুঁজিয়া পাইলাম না।" অথচ সেই সময় হজরতের ফয়েজ বরকত ও কামালিয়ত প্রাপ্ত বহু লোক বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারা এই দেশে সুপরিচিত। তাঁহাদের চালচলন ও খোদা-আশক্তি দর্শনে এই মাইজভাণ্ডার শরীফের দিকে সাধারণ লোকেরাও ঝুঁকিয়া পড়ে।

এই ইছাপুরী ছাহেব “হজরত সাহা মাইজ ভাণ্ডারী” নামক গ্রন্থে নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার চাচা ছৈয়দ মরহুম সাবরেজিষ্টার জনাব ফোরক আহমদ ছাহেবকে হজরত গাউছুল আজম মাইজ ভাণ্ডারী সাহছুপী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) বলিয়াছিলেন, “তোম হামারা বাগকে গোলে গোলাব হো।” মৌলানা ছাহেবের এই ‘স্ববিরোধী’ কথার কোন মিল দেখা যায় না। পক্ষান্তরে তাহার এই “বানাওটী” কথার দ্বারা হজরত কেবলার বেলায়েতের উপর বিরাট ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন হজরতের বেলায়েত যুগটি অনর্থক ও অকেজো। কোন প্রস্ফুটিত মানুষ সেই যুগে গড়িয়া উঠে নাই। এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক।

হজরতের বেলায়েতের দ্বারা এই পুরবের দেশবাসীরা যে উপকৃত এবং ছাহেবেহাল ও জজবার অধিকারী, তাহা এই দেশবাসীরা একবাক্যে স্বীকার করে এবং বুঝে। (বেলায়েতে মোতলাকা বা মুক্ত ছুফীবাদ এবং আয়নায়ে বারী দ্রষ্টব্য) এই জীবনী দ্বারাও মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কোন ধরনের অলি উল্লাহ্। ইহা ছাড়া বহু পুস্তক-পুস্তিকা আছে যাহাতে তাঁহার শানের গান-গজল লিপিবদ্ধ এবং তাঁহার শান বর্ণিত আছে। (রত্ন ভাণ্ডার গং দ্রষ্টব্য)।

মৌলানা ইছাপুরী ছাহেব লিখিত ঐ জীবন চরিতের ৪৭ পৃষ্ঠা ১২ লাইনে লেখা আছে, সাহ আবদুল মজিদ আজিম নগরী (রঃ) হজরতের খেদমতে হাজির হইয়া, হজরত বাবাজান কেবলার (কঃ) শানে বাক্যালাপ করিলে হজরত আকদাছ (কঃ) তাঁহাকে বলেন, “মিঞা উহ্ সানে জালাল হ্যায়। মূলকে এমনকা রাহনে ওয়ালা হ্যায়। উনকে আদব করো। তোম লোগোঁকে এবতেদা আওর এনতেহা উনহিকে হাতমে হ্যায়”। ইছাপুরী ছাহেব লিখিত উপরের বাক্যগুলি সেইরূপ এক বিকৃত বর্ণনা, তদরূপ উদ্দেশ্যমূলক এবং অস্বাভাবিক উক্তি।

(ক) আবদুল মজিদ মিঞা হজরত কেবলার আত্মীয় হইলেও হজরত কেবলা তাঁহার পীরে তরিকত ছিলেন। কাহারো শেকায়েতমূলক গল্প গুজব

বে-আদবী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতেন। তিনি সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বরং হজরতের ফয়েজ প্রাপ্ত ছাহেবে তাছার্রোফ লোক ছিলেন। এমন কি তিনি যাহাকে হালকা জজবার সময় স্পর্শ করিতেন তাহারও হাল জজবা গালেব হইত। যাহারা তাহাকে জানে, তাহারা নিশ্চয় ইহা স্বীকার করিবে। এই ফয়েজ দানে হজরত কেবলা তাহাকে খেলাফত দিয়াছিলেন। যাহা সকলে স্বীকার করিত। এই ফটিকছড়ি হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মন্দাকিনী, ধলই, ফরহাদাবাদ, শুয়াবিল, দৌলতপুর, বাবু নগর, আজিম নগর, মাইজভাণ্ডার ও নানুপুর মৌজার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহার তাছার্‌রোফ সম্বন্ধে নিশ্চয় ওয়াকেফহাল আছেন। এহেন অবস্থাতে উক্ত সাহ ছাহেবের এবতেদা অর্থাৎ শুরু, এনতেহা অর্থাৎ শেষ, বাবাজান কেবলার হাতে কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝার উপায় নাই। ইহা এমন এক উক্তি যাহার কোন যুক্তি নাই।

(খ) প্রকৃত ঘটনা এইরূপঃ

আঁ-হজরত কেবলা কাবার দায়রা শরীফের সোজা দক্ষিণ দিকে মধ্যখানে একটি "দর" বা বাহির উঠানে আসার পথ বাদ, ছৈয়দ মৌং আবদুল করিম ছাহেবের যেই কাচারী ঘর ছিল, তাহাতে ছোট মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আমিনুল হক কুতুবে এরসাদ ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী ছাহেব মুরিদান এবং পীরভাইগণ সহ হালকা জজবা করিতেন ও করাইতেন। আমরাও সেই ঘরে হাজির হইতাম ও তাঁহার তালিম নিতাম। তিনি উপস্থিত হইতে না পারিলে উক্ত আবদুল মজিদ মিঞাকে তালিম দিবার হুকুম দিতেন। একদা বাদ মগরিব নামাযান্তে নিয়মিত হালকা জজবার মজলিশ বসিলে, ছোট মৌলানা ছাহেবের অনুপস্থিতিতে, আবদুল মজিদ মিঞা উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পাশে বসিয়াছিলাম। এই কাচারী ঘরখানাকে হজরত কেবলা দপ্তরখানা বলিতেন। হজরত আকদাছ লোক বিশেষকে কোন কোন সময় বলিতেন, দপ্তরখানায় আমার আমিন মিঞার কাছে গিয়া বস।

এইদিকে গান বাজনা সহ হালকা জজবার মজলিশ চলিতেছিল। এমন সময় ঘরের উত্তর পাশের দরজা দিয়া জনাব বাবাজান কেবলা কাবা জালালিয়ত

অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতঃ "তাক" অর্থাৎ বাতি রাখার গাছ বিশেষ দিয়া আবদুল মজিদ মিঞার মাথায় আঘাত করিয়া পূর্ব দরজা দিয়া বাহির হইয়া যান। ঘরটি বাতির অভাবে অন্ধকার হইয়া যায় এবং মজলিসও ভঙ্গ হয়।

আবদুল মজিদ মিঞা হাউ হাউ রব করিতে করিতে হজরতের আন্দর হুজরা শরীফের দিকে হুজুর সকাশে অগ্রসর হইলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। সামনে যাইতেই না যাইতেই হজরত কেবলা বলিতে লাগিলেন, "সোর করে কে?" লাতু নামে এক বৃদ্ধা খাদেমা বলিল, "হুজুর আবদুল মজিদ মিঞা সোর করিতেছেন।" এই অবসরে আবদুল মজিদ মিঞা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হুজুর! খুইল্যার ছেলে আমাকে খুন করিয়াছে। হজরত কেবলা তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং মাথায় তৈলপট্টি দিবার জন্য খাদেমকে হুকুম দিলেন। হজরত কেবলা আবদুল মজিদ মিঞাকে বলিলেন, ভাই! উহ্ সাহেবে জালাল হ্যায়। মুলক এমন মে রাহাতা হ্যায়, আলমে আরওয়াহ্ মে ছায়ের করতা হ্যায়। আপতো হামারা ছাত রহিয়েগা; উনকে পাচ কেঁউ গেয়া? জনাব বাবাজান কেবলা এইরূপ "জালাল" অবস্থায় যাহাকে সামনে পাইতেন তাহাকেই প্রহার করিতেন। এমন কি একদিন তাঁহার পিতা মৌং ছৈয়দ আবদুল করিম ছাহেবকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়াছিলেন। কোনরূপ বাহ্যিক লোকাচারী লেহাজ করিতেন না। বরং হাল জজবা ছোকর গালেব অত্যধিক প্রকাশ পাইত। উক্ত জীবন-চরিতের ৪৮ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে লিখা আছে; বোয়ালখালী থানার চরনদ্বীপ নিবাসী মৌলানা অছিয়র রহমান (রঃ) বহুবৎসর যাবত হজরত আকদাছ (কঃ)এর খেদমতে ছিলেন। অবশেষে হজরত আকদছ (রঃ) তাঁহাকে বলেন, "তোমহারে নেয়ামত পীরানে পীরছাহেবকে হাত মে হ্যায়। তোম উনকে পাচ যাও।" এই উর্দু বাক্যটি যেমন উদ্ভট তেমন অস্বাভাবিক। যেহেতু উক্ত মৌলানা অছিয়র রহমান ছাহেব হজরতের প্রথম খলিফা এবং ফয়েজপ্রাপ্ত কামেল অলিউল্লাহ্। জনাব বাবাজান কেবলা ফয়েজ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং বাড়ীতে গিয়া গদীনশীন হওয়ার হুকুম প্রাপ্ত হন। দাদী আম্মা বলিতেন, নানুপুরের খুইল্যা মিঞা ফকীর; রাউজানের ওয়ালী মস্তান; সাতকানিয়ার

জাফর আলী সাহ, চরনদ্বীপের মৌলানা অছিয়র রহমান সাহা হজরত কেবলার প্রথম অবস্থার মুরিদ এবং ফয়েজ প্রাপ্ত। এই মৌং অছিয়র রহমান ছাহেবই গদীর হুকুম প্রাপ্ত হজরতের প্রথম খলিফা। বাড়ীতে গিয়া গদীতে বসার পর মাত্র একবারই তিনি দরবার শরীফ আসিয়াছিলেন। তাহাও হজরত কেবলার ওফাতের ১৬/১৭ দিন পূর্বে। সেই সময় শীতের মৌসুম ছিল। আমি সেই সময় একদিন প্রাতঃ কালীন পড়া শেষ করিয়া গোছলের পূর্বে উত্তরের উঠানে খেলিতে আসিয়া হঠাৎ দক্ষিণ দিকে নজর করিতেই মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। যেন হজরত কেবলা দক্ষিণ মুখি উঠানে শীতকালীন রৌদ্র উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে কিছু সুস্থ বলিয়া মনে হইল। তাড়াতাড়ি দক্ষিণ দিকে সম্মুখে আসিলেই আমার ভুল ভাঙ্গে। কারণ যিনি উপবিষ্ট আছেন তিনি চরনদ্বীপের মৌলানা অছিয়র রহমান ছাহেব। তিনি এত্তেহাদী ফয়েজের বদৌলতে দেহে পর্যন্ত হজরতের অবয়বতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খোদাতা'লার মহিমায় বয়সের ফলে চুল দাড়ি মোবারকও একই রূপ সাদা হইয়া গিয়াছিল। যাহার ফলে আমার মত নিত্য সাহচর্য্য প্রাপ্ত লোকও বিভ্রান্তিতে পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার নিশ্চিত স্মরণ আছে, তিনি দরবার শরীফ হইতে বাড়ী চলিয়া যান। জনাব বাবাজান কেবলা তখন ফটিকছড়ি বিবির হাটের নিকট সুন্দর পুর গ্রামেই ছিলেন। এমন কি হজরত কেবলার ওফাতের সময়েও বাড়ী আসেন নাই। কাজেই বুঝিতে কষ্ট হইবেনা যে, এই রেওয়ায়েত নেহায়েত উদ্ভট ও উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্য কি; তাহা বুঝিতে বেশী দূর যাইতে হইবেনা। উক্ত জীবন চরিতের ৪৯ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে লিখা আছে, "এইরূপে হজরত (রাঃ) শেষ বয়সে তাঁহার বহু খাস মুরিদগণকে বাবাজান কেবলার (কঃ) খেদমতে যাইতে বলেন এবং তাহারা বাবাজান কেবলা (কঃ) হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত হন। এই উদ্দেশ্যটি ছাবেত করার জন্য বোধ হয় এমন উদ্ভট রেওয়াতের দরকার ছিল।

ছুফী তরিকা বা দস্তুর মতে পীরে তরিকাত বা বায়েতি একজনই থাকেন। পীরে তাফাইউজ অর্থাৎ ফয়েজ বরকত বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে

নেওয়ার নিষেধ নাই। যাহারা এই পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল বা অবগত আছেন, তাহারা জানেন, যেমন, হযরত আকদছ, শাহ্ ছুফী হাজিউল হেরমাইন আবু শাহামা ছৈয়দ মুহাম্মদ ছালেহ লাহুরী কাদেরী পীরে তরিকত হইতে গাউছিয়তের ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া খেলাফত হাছেলে কামালিয়ত প্রাপ্ত হন এবং তিনি পীরের হুকুম মত সাহছুফী হাজিউল হেরমাইন ছৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ (চিরকুমার) লাহুরী কাদেরী মোহাজেরে মদনী হইতে কুতবিয়তের ফয়েজ ও খেলাফত প্রাপ্ত হন। এইরূপে মৌলানা আবদুল আজিজ দেহলবি, সাহ এমদাদুল্লা (রঃ) হযরত সাহ ওয়ারেছ আলী (রঃ) প্রমুখ চিরকুমার ছাহেবানেরা এবং মোল্লা ছাদি (রঃ) এইভাবে ফয়েজ বরকত হাছিল করিয়াছেন দেখা যায়, আর রেওয়াজও আছে।

আমি নিজেও হজরত মৌলানা কুতুবে এরসাদ ছৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী ছাহেবের নিকট বায়াতে ছুন্নাত ও শিক্ষা গ্রহণ করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে বায়াত হন। তাঁহার ওফাতের পর আমার দাদা হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদুল্লাহ্ (কঃ) কেবলা কাবার হাতে বায়াত এবং তরিকা কবুল করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে তরিকত। জনাব বাবাজান কেবলা কাবার নিকট হইতে আমি রূহানী ফয়েজ হাছিল করি এবং ঐ এলম-জ্ঞান অর্জন করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে তাফাইউজ।

হজরত আকদছ (কঃ) একদিন আমার সামনে বলিয়াছিলেন, "আমার দেলা ময়না আমার 'বাচা' ময়নার চেহারার উপর থাকিবে"। হজরত কেবলা জনাব বাবাজান কেবলাকে 'বাচা ময়না' বলিতেন। ইহা তাঁহার রূপমূলক এসতেলাহী কালাম বা কথাভঙ্গি। যথাঃ– আমার পিতা হজরতের একমাত্র পুত্র, শাহ ছুফী ছৈয়দ মৌঃ ফয়জুল হক ছাহেবের ওফাত হওয়ার কয়েকদিন পর একদা খাদেমকে একখানা শাল কাপড় ও নিজের পাগড়ী মোবারক দিয়া বলিলেন, "এই শাল কাপড়খানা আমার ফয়জুল হক মিঞার কবরের উপর পরাইয়া দাও এবং এই পাগড়ীটি তাহার ছিরানে রাখিয়া

দাও। দস্তার বাঁধিবার জন্য তাহার আরজু ছিল। আমি তাহাকে জনাব মৌলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রঃ) এর চেহারার উপর রাখিয়াছি"।

একদিন "দায়েরা" শরীফে তাঁহার বাহির বাড়ীর গদি শরীফে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলাম। হজরত কেবলা কোরান শরীফ হাতে নিয়া ১৭ "ওরক্" বা পৃষ্ঠা লিখিত অংশ বাহির করিয়া লইলেন এবং আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "দাদা ময়না" এইখানে কি হরফ আছে? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সব হরফ উড়িয়া গিয়াছে। কমবক্তেরা কালামুল্লা বেচিয়া কেলামোলা খাইয়াছে, তবুও বলে কালামুল্লা।" একজন খাদেমকে বলিলেন, এইগুলি আমার ফয়জুল হক মিঞার কবরের উপর রাখো। পুনরায় ১০ ওরক্ বাহির করিলেন। এবং আমাকে পূর্ববত দেখাইলেন এবং পূর্ববত সম্বোধন করিয়া উত্তরের সময় না দিয়া আগের মত বলিতে লাগিলেন, "সব হরফ উড়িয়া গিয়াছে। কমবক্তেরা কালামুল্লা বেচিয়া কেলামোলা খাইয়াছে, তবুও বলে কালামুল্লা।" একজন খাদেমকে হুকুম করিলেন "এইগুলি সামনের পুকুরে ঢালিয়া দাও। এইরূপ বহু "তাছার্রোফ" মূলক আধ্যাত্মিক কাজকর্ম ও কথাবার্তা এবং "এস্তেলা" কথা ভঙ্গি আছে যাহার রহস্য "ছাহেবে এলমেলদুন" সোজা স্রষ্টা-জ্ঞান অর্জিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোক বুঝিতে অক্ষম। আবার–এমন কতেক কাজ বা কথা ভঙ্গি বা "এস্তেলা" ছিল, যাহা নিত্য সাহচর্য্য প্রাপ্ত লোকেরাই বুঝিতে পারিত। অন্যের পক্ষে বুঝা কঠিন ছিল।

যেমন কোন বিমারী লোকের দোয়া প্রার্থীকে কলা দিলে বা সরবত খাইতে বা খাওয়াইতে বলিলে কিংবা চাদর বা রজাই গায়ে দিয়া শোয়াইতে বলিলে বুঝা যাইত সেই বিমারী ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। যদি কাহাকে বলেন, দোয়া করিতেছি বা তাহার হাদিয়া গ্রহণ করেন তাহা হইলে বুঝা যাইত দোয়া প্রার্থী সফলকাম হইবে। কাহাকে কোন ঔষধ তাবার্রোক দিলে যথা আদ্রক; রসুন, সাজনা পাতা ও পাট পাতার ঝোল বা মধু মিছরী খাইতে বা মছল্লা ব্যবহার করার হুকুম দিলে বুঝা যাইত সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে। কাহাকে–গালি গালাজ করিলে বা হস্তস্থিত যষ্টির প্রহার করিলে সেই ব্যক্তি

রোগ মুক্ত বা মামলা হইতে খালাস পাইত। এইরূপ বহু কাজ কারবার দ্বারা তাছার্রোফ প্রভাব বিস্তার–করিতে দেখিয়াছি। অবার এমন কতেক কাজকারবার ও কথাবার্তা আমার জানা আছে, যাহা সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে অথচ এইগুলিও তাছার্রোফ মূলক রহস্য ও কথাবার্তা ছিল; যাহা সময়মত বিকাশ হইতে দেখা যায়। এই অবোধ্য তাছার্রোফাত মূলক কথাবার্তা বিরাট প্রভাবশালী সুদূর প্রসারী কালাম।

যেহেতু কামেলের বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির "হিম্মতে এরাদী" পূর্ণ ইচ্ছাশক্তিকে কার্য্যকলাপ বা বাক্যালাপ জনিত যোগাযোগ মাধ্যমেই সৃষ্ট জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি খোদাই শক্তির প্রভাব বিস্তার করিতে হয়, যাহা এই জগতের স্বভাব সুলভ। যাহার জন্য দর্শন প্রবণ বা কাশ্‌ফ অন্তরদৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা মতে অবগতি একান্ত দরকার। তৎমতে কল্যাণী মনোভাব "ফায়ালী" কার্য্যকরী আচরণও দরকার। যাহা না হইলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিবে না। যাহাকে 'ছুলক' বলিয়া ছুফী পরিভাষায় বলা হয়। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক আকর্ষণ বা "জজবার"ও একান্ত আবশ্যক আছে, যাহাকে "জজ্‌ব" বলে। এই কল্যাণী জজ্‌ব ও ছুলুকের অধিকারী ব্যক্তিই এই তাছার্রোফ মূলক বেলায়েতের অধিকারী বা মালেক। এই তাছার্রোফি মূলক কাজ বা বাণী লোকের লোকাচারী রীতিনীতির অনুরূপ নাও হইতে পারে। যাহা সাধারণ লোকের বুঝে আসে না।

এই কামেল হিম্মতকে পার্থিবতার সঙ্গে ফেরেস্তা বা মলয়েছিফলীর কার্য্যকরী শক্তির দিকে প্রভাব বিস্তারকে ছুফী পরিভাষা মতে তাছার্রোফ বলে। আর মালায়ে আলা বা উর্দ্ধজগতের ফেরেস্তা বা কার্য্যকরী শক্তির দিকে কামেলের হিম্মতকে উত্থিত করার নাম ছুফী পরিভাষা মতে দোয়া বা বদদোয়া যাহা সমাজে পরিচিত। এই জজ্‌ব ও ছুলুকের সংমিশ্রন ছাড়া ইচ্ছা ও শক্তি একত্রিত হইতে পারে না। এই দুই এর একত্র মিশ্রন ছাড়া তাছার্রোফ বিকাশ হয় না। যদিও অর্জিত বা অর্পিত বেলায়েত ক্ষমতার অধিকারী বা অধিকার থাকে।

এই লায়েক লেখক মহোদয়ের উদ্দেশ্য আরো পরীস্কারভাবে ধরা পড়ে যখন ঐ জীবন চরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৪ পৃষ্ঠা তক সংক্ষিপ্ত লেখা (কঃ) এবং (রাঃ) এর হেরফেরের প্রতি নজর দেওয়া যায়, যাহাতে (কঃ) কাদ্দাছাছিররাহুল আজিজ এবং (রাঃ) ইঙ্গিত মতে রাজি আল্লাহু আনহু বুঝায়। অর্থ (কঃ) পবিত্র হউক তিনির রহস্য, (রাঃ) তিনির প্রতি খোদা সন্তুষ্ট হউক, অর্থবোধক দোয়া বটে। এই (কঃ) আর (রাঃ) লেখার ভিতর তিনি বুজর্গানের ভিতর সম্মান ও সবার বেশ কম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যথাঃ– জনাব বাবাজান কেবলার নামের পর লিখিয়াছেন (কঃ), আর হজরত কেবলার নামের পরে লিখিয়াছেন (রাঃ) এইভাবে অন্যান্য বুজর্গানের নামের পরেও ঐ ভাবে (রাঃ) লিখিয়া এই সব বুজর্গানের প্রতি এক ধরনের, এবং বাবাজান কেবলার প্রতি অন্য ধরনের সম্মান বোধক সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহারে যেই হীন ও হেয় মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নেহায়েত হাস্যকর ও উপভোগ যোগ্য।

বিজ্ঞ লেখক অবশ্য জানেন হাল জজ্‌বা বিভোরতা বৃদ্ধি পাইলে পারিপার্শিকতার প্রতি নজর দিবার অবসর লোকের থাকে না। ঘটনার অবস্থাও তদরূপ। কাজেই সাহ জালাল অর্থে, জালালিয়াত হাল জজবাই বুঝা উচিত ছিল। সাহ জালাল ও শ্রীহট্টকে টানিয়া আনা খাপ ছাড়া দেখা যায়। সেইরূপ আরবী "এমন" শব্দের অর্থ বেপরোয়াই নিকটতম দেখা গেলেও আরবের এমন মুলুক ও জনাব ওয়াইসকুরুনীকে (রঃ) নিয়া টানাহেচরার চেষ্টা দেখিলে, অলক্ষ্যে আসল উদ্দেশ্য উঁকি মারিয়া দেখা দেয়। পক্ষান্তরে হজরতের অবিকৃত কালামের প্রতি নজর দিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, "উহ্ সাহা জালাল হ্যায়"–অর্থ সেই সময়ে তাহার হাল জজবা গালেব ছিল, তাই বেপরোয়া আলমে আরওয়ায়ে ছায়ের করা পার্থিবতা হইতে দূরে অতি উর্দ্ধের মকামে বা স্তরে বিচরণ করিতে ছিলেন অর্থই বোধ হয় যথাযথ হইবে।

একই গরজে লেখক মহোদয়ের শ্বশুর ছাহেব জনাব মৌলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ হাসেম সাহেবকে তরজুমান– ব্যাখ্যাকারী দাড় করাইয়া চৌগার এক ঘটনাকে দলিল হিসাবে আনিয়াছেন। আমি সেই ঘটনার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। কারণ এই ঘটনা কাহারো মুখে শুনি নাই। এমন কি স্বয়ং এই মোহাম্মদ হাসেম সাহেবের মুখেও শুনি নাই। বরং আমার দাদী আম্মার মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, একদা হজরত কেবলা জনাব বাবাজান কেবলাকে প্রহারে রক্তাক্ত করিলে হজরত ছাহেবানী বলিয়াছিলেন, আপনি কি করিলেন। এমন সুন্দর ভ্রাতুস্পুত্রকে মারিয়া রক্তাক্ত করিলেন! তাহার পিতা মাতা আসিলে কি উত্তর দিব। প্রতি উত্তরে হজরত কেবলা বলিয়া ছিলেন, "দেখ ভাই! তাহাকে আমি একটি চক্ষু দিয়াছি, সে আমার দুইটি চক্ষুই চাহে। দুইটি চক্ষু তাহাকে দিলে আমি চলিব কি করিয়া! বিষয়টি হজরত ছাহেবানীর বুঝিতে দেরী হইল না।

তিনি জনাব বাবাজান কেবলাকে মধুরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনি যখন তাহাকে দেখিলেই থাকিতে বা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না, কয়েক দিনের জন্য বাহিরে গিয়া ছায়ের করুন। অলি উল্লাহ্ এবং নবী উল্লাহ্রা তাহাদের উপর অর্পিত কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই হায়াতে নাছুতির হায়াতি যুগ কাটাইতে হয়। এখন তক্ তাঁহার কাজ বাকী আছে। যাওয়ার সময় আপনার হিচ্ছা–কিছু থাকিলে তাহা সময় মতে আপনাকে দিয়া যাইবেন। ইহা জবরদস্তিমূলক বস্তু নহে ইহার পর হজরত বাবাজান কেবলা ছায়েরে বাহির হইয়া যান। এই ঘটনাতেও হজরত কেবলার জবানী স্বীকার উক্তি পাওয়া যায়। জনাব বাবাজান কেবলাকে হজরত কেবলা একটি ধারামতে ফয়েজ রহমত দান করিয়াছেন। যেই পথে যেই ব্যক্তির সফলতা নিশ্চিত, সেইভাবে হজরত কেবলা বিভিন্ন ব্যক্তিকে যোগ্যতামতে গাউছিয়াত ও কুতবিয়তের বিভিন্ন "মসরব" আস্বাদ গ্রহণ প্রণালীমতে ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ দান করিতেন। এইভাবে তাঁহার অসংখ্য "ফয়েজাপ্তা" অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে দেখা যায়, কেহ 'মজজুবে মাহাজ" কেহ "ছালেক" কেহ "ছলেকে মজজুব" আবার কেহ "মজজুবে

ছালেক”। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের পথে সফলতা অর্জন করিতে দেখা যায়। যাহা সমস্ত তরিকা বা কামেল বুজর্গ, সিদ্ধ মহাপুরুষদের স্বীকৃত পন্থা যাহা তিনির বেলায়েতে ওজমা বেলায়েতে মুহিত বা বেষ্টনকারী বেলায়েতের প্রমাণ।

জনাব বিজ্ঞ গ্রন্থকার সত্য প্রচারের দিক হইতে পেশাগতভাবে দিগ্বিদিগ জ্ঞান হারা হইয়া ওকালতি এবং ব্যবসা প্রচারের দিকে যেইভাবে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে তাহার নীতি বিভিন্ন যায়গাতে বেফাঁস প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চরম প্রকাশ হিসাবে বলিতে হয়, ঐ জীবনীর ৪১ পৃষ্ঠাতে পবিত্র “সজরা” শরীফে হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)কে গাউছুল আজম স্বীকার করেন নাই। অথচ একই গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় ১১ লাইনে লিখিয়াছেন হজরত আকদাছ হজরত রছুল করিম (দঃ) এর কদমের উপর গাউছুল আজম ছিলেন। গ্রন্থকার ছাহেবের কুহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস হইতে মুদ্রিত সাবেক রচনা ছৈয়দ গোলাম রহমান সাহছুফী মাইজভাণ্ডারী বাবাজান কেবলা কাবার ‘জীবন চরিত” নামক গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় আছমানী রং এর রেশমী চৌগা বলিয়া উল্লেখ আছে। অথচ হজরত কেবলা রেশমী কাপড় পরিধান করিতেন না। চট্টগ্রাম মোহছনিয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেনডেন্ট জনাব মৌলানা আবদুল মোনায়েম ছাহেবকে এই রেশমী কাপড় পরার দরুন তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে আলমিরার উল্লেখও আছে। অথচ তাঁহার হুজরা শরীফে কোন আলমিরাই ছিল না। যদিও জীবন চরিত ২য় সংস্করণে এই অংশ এবং আরো কতিপয় অংশ উদ্দেশ্য মূলকভাবে উল্লেখ করেন নাই; যেমন বর্তমান জীবন চরিতে উপরে লিখিত চৌগার ঘটনাকে প্রমান হিসাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও এই চৌগার রেওয়ায়েতটী এক সামঞ্জস্যবিহীন উক্তি। গ্রন্থকার মহোদয়ের কথা মতে হজরত কেবলা কাবার কার্য্যকলাপ ও কালাম খিজরী। অর্থাৎ হজরত খাজা খিজির (আঃ) এর মত রহস্যপূর্ণ এলমে লদুন্নীর প্রভাবযুক্ত।

গ্রন্থকারের একই উদ্দেশ্যে লিখা "আল" শব্দের বাহুল্যতার দ্বারা ধূম্রজাল সৃষ্টির সহায়তায় "লাফদিয়া" জায়গা দখলের প্রচেষ্টাটি নেহায়েত বাড়াবাড়ি মূলক এবং অনর্থক প্রচেষ্টা মনে করা যায়। সত্য অনুসন্ধিৎসু সুধীমণ্ডলীর ভ্রান্তিদূর মানসে এবং কতকগুলি নেহায়েত উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্ত নীতির অনিচ্ছাকৃত এই ক্ষুদ্র সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

- শেষ -